দূরের মানুষ

শক্তিপদ রাজগুরু

বাক্-সাহিত্য
৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা—৯

প্রথম প্রকাশ :
১লা বৈশাখ, ১৩৭১

প্রকাশক :
শ্রীস্বপনকুমার মুখোপাধ্যায়
বাক্-সাহিত্য
৩৩, কলেজ রো
কলিকাতা-৯

মুদ্রক :
শ্রীসুকুমার ভাণ্ডারী
রামকৃষ্ণ প্রেস
৬, শিবু বিশ্বাস লেন,
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ :
শ্রীকানাই পাল

দূরের মানুষ

বিরাট বাড়িটায় তখনও উৎসবের পরিবেশ মিলোয় নি। মনোতোষবাবুর সময় নেই। বড় বাড়ির এলাকাটা বেশ কিছুটা সীমানা জুড়ে ছড়ানো।

বাইরে বৈঠকখানা বাড়ি, একদিকে কাছারি। কর্মচারী নায়েব সরসীবাবু তখন ক্ষেত্র সরকারকে নিয়ে ব্যস্ত। বিয়ের জের তখনও মেটেনি। বাড়িতে সমানে যজ্ঞ চলেছে। অবশ্য এই বড় বাড়ির যজ্ঞ রোজই চলে। নায়েব, গোমস্তা কর্মচারীর দল ছাড়াও এবাড়ির পরিবার পরিজন কম নয়। মা লক্ষ্মীও যেন উজাড় করে দিয়েছেন মনোতোষবাবুকে।

মহানন্দার ধার ঘেঁসে বিরাট কয়েকপ্রস্থ বাড়ি, বৈঠকখানা কাছারি বাড়ির পরই তিনমহল বসতবাড়ি। ওদিকে অতিথি অভ্যাগতদের থাকার জন্য আলাদা মহল। ওদের চলতি নাম সাবানবাড়ি, পাচীলঘেরা, মাঝে বিরাট উঠান। বাড়ির বাইরে কিছুটা জমিতে বাগান, ফুল ফলের গাছও রয়েছে। দুতিনটে ফটক রয়েছে বাইরে যাবার, তার একটা ফটকই খোলা থাকে।

শহরে ওদের বেশ কিছু বড় বড় বাড়ি ভাড়ায় আছে। নিজেদের ব্যবসা গুদামও আছে। বিস্তীর্ণ অঞ্চলের পাট, কলাই, সরষে সবই আছে গুদামগুলোয়। সর্বমিলিয়ে অবস্থা এদের খুবই চলতি। শহরের বাইরে দূরের গ্রাম-গ্রামান্তরে ছড়ানো আছে মহাল তৌজি, দু'চারটে মহালে নিজেদের কাছারিও আছে। আদায় পত্রও ভালোই হয়।

নায়েব সরসীবাবুর এসব হিসাব নখদর্পণে, আর তিনি হুঁশিয়ার লোকও। তাই এ বাড়ির কর্তা মনোতোষ বাবুও এসবের ভার তার উপর দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে নিজের বিরাট ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত থাকেন।

মনোতোষবাবু এমনিতে গম্ভীর রাশভারি মানুষ। নিজের জীবনে তিনি সৎভাবে পরিশ্রম করে এই জমিজায়গা-ব্যবসাপত্র করেছেন। আর পৈত্রিক ব্যবসাকে বাড়িয়ে আজ এই অঞ্চলের একজন নামজাদা ব্যবসায়ী বলে গণ্য হয়েছেন। এতবড় পরিবার এই সংসারকে সুষ্ঠুভাবে চালিয়ে নিয়ে চলেছেন।

প্রথম পক্ষের স্ত্রী একটিমাত্র ছেলেকে রেখে গত হবার পরও বিয়ে করেননি, অনেকদিন। স্ত্রী মারা যাবার পর সংসারের বেসামাল নৌকার মত হালভাঙ্গা পালছেড়া অবস্থাটাকে কোনমতে সামাল দেয় নিরুবালা, তার বিধবা বোন।

এই বোনকেই পরম স্নেহে মানুষ করেছিলেন, নিরুবালাও বৌদি মারা যাবার পর অসিতকে বুকে তুলে নিয়ে তার মায়ের অভাব পূরণ করেছিল।

তবু নিরুবালা দেখেছে দাদার নিঃসঙ্গ অবস্থাটাকে। সারাদিন জমিদারীর

নানা হ্যাপা, ব্যবসার কাজ সামলে মনোতোষবাবু কোনমতে সবদিক বজায় রেখে চলেছেন।

নিরুবালাই বলে, কি এমন তোমার বয়স দাদা, বিয়ে থা করো। এতবড় বাড়িটা যেন শূন্য হয়ে গেছে। আর তোমারও দেখাশোনা করার কেউ তো চাই।

মনোতোষ বাবু বোনের ইঙ্গিতটা বোঝেন, নিজেও ক্লান্ত। তবু এ বোঝা টেনে চলেছেন, আর মনে হয় অসিতের কথা।

বলেন তিনি ছেলেটাকে পর করে দিতে বলিস?

নিরুবালা অবাক হয়—ওমা! তাই বলছি নাকি? ও বেচারা ত মা পাবে। আর তেমন সৎ বংশের মেয়েকেই আনব। ঘরে লক্ষ্মী আসুক দাদা।

নিরুবালার চাপেই মনোতোষবাবু দ্বিতীয় সংসার করেছিলেন। মহামায়াকে এই সংসারে নোতুন বউ করে এনে মনোতোষবাবু ভুল করেননি।

মহামায়া নিজে এ সংসারের সব ভার তুলে নিয়েছিল, তাঁর প্রথম পক্ষের সন্তান অসিতকেও অফুরন্ত স্নেহ দিয়ে আপন করে নিয়েছিল, নিরুবালা আড়ালে দেখেছে সেটা। মনোতোষবাবুও দেখেছেন, ছোট্ট অসিত রাতের বেলায় মাকে নাহলে ঘুমুতে পারে না।

মহামায়ার সব কাজের সময়টুকু যেন অসিতই দখল করে নিয়েছে।

নিরুবালা বলে—দাদা! বলিনি তখন।

মনোতোষবাবুও খুশী। বাড়ির সমস্যাটা মিটে গেছে। তাই তিনিও নোতুন উৎসাহে ব্যবসা শুরু করেন। আর ত পাট রাখিমালের ব্যবসাতে যেন নোতুন দিক খুলে গেছে। ধুলোমুঠো ধরেন, সোনামুঠো হয়ে ওঠে। সেবার নদীর ধারে নোতুন গুদামও করলেন। জুট প্রেস ও বসিয়েছেন।

মহামায়াই বাড়িতে মা মনসার পুজো প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতি বৃহস্পতিবারে তার লক্ষ্মীপুজোর আয়োজন—মনোতোষবাবু বলেন!

এসব কি শুরু করলে নোতুন বউ?

মহামায়া বলেন—মা মনসা, মা লক্ষ্মীর দয়াতেই সব হয় গো। তুমি বাপু বাধা দিওনা এসবে।

মনোতোষবাবু কোনদিনই এসব কাজে বাধা দেননি। বরং বলেন—না না। সংসারে মানুষের একটা অবলম্বন চাই, পবিত্র পরিবেশের দরকার। তুমি তা করেছো নোতুন বউ।

সে সব অনেকদিন আগেকার কথা।

আজও এই কলরব কোলাহল উৎসব মুখর পরিবেশের মাঝেও মহামায়া অতীতের সেই দিনগুলোর কথা স্মরণ করতে পারেন। তারপর কত বছর পার

হয়ে গেছে।

মহানন্দার রূপালী বালুচর ছেয়ে কতবার গেরুয়া ঢল নেমেছে, কতবার শরতের কাশ ফুল ফোটা শ্বেত উত্তরী বিছানো দিগন্তে শীতের ধূসরতা নেমেছে মনে নেই।

কত ক্লান্ত বসন্তে বাতাস আমের বোলে বিষণ্ন হয়ে উঠেছে, মৌমাছির গুঞ্জন হাওয়ায় হারিয়ে গেছে।

আজ মহামায়ার সংসারে অনেক সুখ-দুঃখ এসেছে, সব কিছুকে মেনে নিয়েছে সে, তার সংসারে এসেছে নিজের ছেলে, মেয়েরা। বড় মেয়ে লক্ষ্মীর এখন সাজানো সংসার।

দূরে বিয়ে হয়েছে কুচবিহার শহরে। জামাই এর সেখানে ভালো অবস্থা, কতদিন পর আজ এসেছে এ বাড়িতে বিয়ের উৎসবে।

মেজ মেয়ের ও বিয়ে দিয়েছিল শহরের অন্য এক অঞ্চলে বেশ ভালো ঘরে। কিন্তু মহামায়া চরম দুঃখ পেয়েছিল, জামাই হঠাৎ মারা যায়।

মনোতোষবাবু গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ।

তাঁর চোখে কেউ জল দেখেনি কোনদিন, সেদিন একান্ত নির্জনে তিনিও ভেঙে পড়েন মহামায়ার কাছে।

—একি সর্বনাশ হ'ল আমাদের ?

মহামায়া নিজে গভীর দুঃখ পেলেও এমনি হিমালয়ের মত মানুষটিকে ভেঙে পড়তে দেখে বলে,

—সব সুখকেই মেনে নেবে, দুঃখকেও তো মানতে হবে। মা মনসাই সব ঠিক করে দেবেন। বিজুকে ক'দিন এখানে আনি।

মনোতোষবাবু স্ত্রীর দিকে চাইলেন।

তিনিও জানেন তার মেয়ের শ্বশুর বাড়ির ব্যাপারটাকে। ওদের ব্যবহারেও তিনি খুশী হননি। কিন্তু কারোও মুখের উপর প্রতিবাদ করাটাকে মনোতোষ-বাবু ঠিক পছন্দ করেন না। তাঁর প্রতিবাদের ধারাটাই ভিন্ন ধরনের। আজ স্ত্রীর কথায় তিনি সেই ধরনের প্রতিবাদেরই সমর্থন পেয়ে, চাইলেন, মেয়েটাকে তিনি কাছেই রাখতে চান।

তাই বলেন—তাই করো নোতুন বউ। এসময় আমাদের কাছেই ওকে আনো।

মেজ মেয়ে বিজলিকেও আর শ্বশুরবাড়ি পাঠাননি মনোতোষবাবু, পরম সমাদরেই রেখেছেন তাকে। বিজলিও এ সংসারে ছোট ভাই-বোন অন্যদের মাঝে সহজ ভাবেই রয়ে গেছে। এদের ভার নিয়ে সে তার শূন্য জীবন শান্তিতে ভরে তুলেছে।

মহামায়ার সংসারে আজ পূর্ণতার দিন। অসিত এর বিয়ে হয়েছে ক'দিন আগে এই উপলক্ষেই সারা বাড়ি আনন্দে মেতে উঠেছে, আপনজনরা এসেছে

দূর দূরান্তর থেকে।

তবু কোথায় তার মনের অতলে একটা ভয় রয়ে গেছে। মনোতোষবাবুও সেটা জানেন। এটা স্বামী স্ত্রীর মধ্যে একটা যেন সমস্যাই হয়ে রয়েছে।

মনোতোষবাবু নিজে ছেলেবেলা থেকেই ব্যবসাতে নেমেছিলেন, জমিজায়গার নানা ঝামেলাও ছিল। বাবা মারা যাবার পর সব ঝক্কিই তুলে নিয়েছিলেন নিজের উপর।

ফলে নিজের পড়াশোনার অবকাশ তেমন হয় নি।

কিন্তু সারামনে সেই জন্যই একটা আক্ষেপ তার ছিল। সেটা অহরহই তাকে কোথায় যেন পীড়া দিত।

তাই অবস্থা বদলাতে তিনি চেয়েছিলেন তাঁর ছেলেরা যেন লেখাপড়া শেখে। কলেজের ডিগ্রি না থাকলেও মনোতোষবাবু জীবন থেকে, সমাজ থেকে কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের তিনি একজন। নানা জনহিতকর কাজে তিনি সাহায্য করেছেন। তার বৈঠকখানায় শহরের জ্ঞানী গুণীরাও আসতেন। আর ছেলেদের জন্য বাড়িতেও একজন শিক্ষক রেখেছিলেন। শ্যামসুন্দরবাবুর উপর ছিল ছেলেদের পড়ানোর ভার, আর মেয়েদের পড়াশোনার জন্য এখানের এক শিক্ষিকাও আসতেন।

অসিতকেও তিনি পড়াবার চেষ্টা করেছিলেন।

বাড়ির প্রথম সন্তান। কিন্তু অসিতের মনে কোথায় একটা নীরব ঝড় দানা বেঁধেছিল।

ছেলেবেলাতেই মাকে হারিয়েছিল, কোথায় তাই যেন এই দুনিয়ার উপর তার একটা বিতৃষ্ণা ছিল। ছেলেবেলাতেই মাঝে মাঝে সে হঠাৎ অকারণেই রেগে উঠতো, নানা বায়নাও সুরু করতো।

সেদিন পিসীমাও তার অনেক ইচ্ছা পূরণ করে করে অসিতের শিশু মনে একটা জেদকেই নিবিড়তর করে তুলেছিল নিজের অজান্তে। মহামায়া আসার পর অসিত কিছুটা বদলে ছিল। হয়তো শান্তও হয়েছিল।

কিন্তু মহামায়ার নিজের ছেলেমেয়ে হবার পর আর সংসারের ক্রমবর্ধমান নানা কাজে মহামায়াও ব্যস্ত হয়ে পড়তে থাকে। অসিতের কিশোর মনে এই দূরে সরে যাওয়াটা হয়তো আবার তাকে কঠিন, জেদী করে তুলেছিল।

তাই হয়তো পড়াশোনার দিকেও মন তার ছিল না।

সে থাকতো তার নিজের জেদ নিয়ে, বিরাট বাড়ির একটা দিকে ছেলেদের পড়াশোনা, দিনমানে থাকার ব্যবস্থা ছিল। অন্দরমহলে তারা আসতো সন্ধ্যার খাওয়ার পর। অসিতের জেদি কঠিন মন এসব কিছুকে সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি, পড়াশোনাও এগোয় নি।

ক্লাশ নাইনে দু'একবার ফেল করে। মনোতোষবাবুও তার জন্য ভাবনায়

পড়েন। শেষ অবধি অসিতই বলে।

—পড়াশোনা ভালো লাগে না।

মনোতোষবাবু তাকে বাইরের মহল, জমিজায়গা দেখার ভার দিলেন। কাজটা অসিতের ভালোই লাগে। তার জেদি কঠিন সত্বা বাইরে বাইরে দাপট দেখিয়ে বেড়াতে চায়।

সরসী নায়েব ও সায় দেয়, বলে সে।

—তাই ভালো কত্তাবাবু, যা দিনকাল পড়েছে, বিষয়-আশয় নিজেদের না দেখলে রাখা যাবে না। বড় খোকা যদি এসব দেখে ভালোই হবে।

মনোতোষবাবু অসিতকে এই করেই জড়িত করে ওকে তবু একটা দিক থেকে জড়াবার ব্যবস্থাই করলেন।

শহরের বাইরে দূরে দূরে গ্রামাঞ্চলে ছড়ানো কয়েকটা মহল। পত্তনি।

সেগুলোকে ভবানীপুর কাছারি থেকেই দেখাশোনা করে অসিত।

মনোতোষবাবুর সাবধানী, সন্ধানী দৃষ্টি চারিদিকে। তার স্বভাবের মধ্যেই এটা নিহিত রয়ে গেছে। তাই কোথাও কোন মেঘের ছায়া সহজেই তাঁর নজরে আসে। এতবড় ব্যবসা, এই সংসার, জমিদারীর সব খবরই তার আছে এসে পেঁছায়।

অসিতও বেশ দাপটের সঙ্গে জমিদারী চালাচ্ছে। তেজী কালো একটা ঘোড়া কেনা হয়েছে বিভিন্ন মহলে যাতায়ত করার জন্য, মাঝে মাঝে সেই ঘোড়ায় চড়ে এখানেও আসে।

বিজয় চেয়ে থাকে তেজী ঘোড়াটার দিকে। অসিতের ছোট ভাই। বিজয় যেন বাড়ির ছেলেদের থেকে একটু ভিন্ন প্রকৃতির, সাহসী। আর সব ভাইরা কেউ সাহসী হয় না। বিজয় বলে আমাকে চাপতে দেবে বড়দা?

অসিত অবাক হয়—পারবি? দারুণ তেজী ঘোড়া, আর যা মেজাজ ওর! বিজয় বলে—ঠিক পারবো?

অসিত বলে শিখিয়ে দেবো পরে।

অসিত আসা যাওয়া করে, কিন্তু ক্রমশ তার এবাড়িতে আসাটা কমে যায়। মনোতোষবাবু-মহমায়ারও কেমন বিচিত্র বোধ হয়। সরসী নায়েব এই পরিবারের শুধু কর্মচারীই নয়। সে এদের পরিবারেরই একজন হয়ে উঠেছে।

আর ক্ষেত্র সরকার আরও পুরোনো লোক।

ক্ষেত্র সরকারই খবরটা আনে। অসিত মহলের কোন গ্রামে একটি মেয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েছে।

খবরটা শুনে মনেতোষবাবু চমকে ওঠেন, তবু তখুনিই কিছু না বলে জানান —এ খবর বাইরে যেন কেউ না জানে।

ক্ষেত্র চুপ করে যায়।

মনোতোষবাবু মহামায়াকেই শুধু জানান ব্যাপারটা। বলেন—অসিত এমনি একটা বেয়াড়া ভাবের তা জানতাম, কিন্তু একটা বাজে মেয়ের সঙ্গে জড়িয়ে পড়বে তা ভাবতেই পারিনি। মহামায়াও ভাবনার পড়েন। মনোতোষবাবু বলেন।

—ওর বিয়ে-থাই দেব ভাবছি।

মহামায়া চাইলেন স্বামীর দিকে। স্বামীর কথাই তাঁর কাছে সব। তাই বলেন—তাই করো। দ্যাখো যদি ওসব বদভ্যাস ছাড়ে।

মনোতোষবাবু বলেন—ওসব ছাড়তেই হবে তাকে নোতুন বউ। এ বাড়ির পবিত্র পরিবেশে কোন কলুষকে আমি মেনে নেব না। মহামায়া বলেন—একটি ভালো মেয়ে দ্যাখো, বিয়ে-থা দাও। দেখো মা মনসা সব ঠিক করে দেবেন।

মনোতোষবাবুর অর্থের কোন দাবী নেই। তিনি চান সুন্দরী, মোটামুটি শিক্ষিতা একটি ভালো মেয়ে। আর ঘর হিসেবে তার ঘরের সুনাম দূরে বিস্তৃত।

তাই অনেক খোঁজাখুঁজির পর পদ্মাপারে নদীয়া জেলার কুষ্টিয়ার কাছে কোন গ্রামের স্কুলমাষ্টার নরেন বাবুর মেয়ে কমলাকেই তিনি পছন্দ করেন।

নরেনবাবু ছিলেন আদর্শবাদী শিক্ষক, নিজে কোনদিন কোন কিছুর সঙ্গে আপোষ করেন নি। ইংরেজের বিরুদ্ধে যারা ষড়যন্ত্র করেছিল—তাদেরই সমর্থন করতেন। দেশপ্রেমী—তেজস্বী মানুষটি তাঁর মেয়েকেও মানুষ করেছিলেন সেই ভাবে।

কমলাও বুদ্ধিমতী, পড়াশোনাতে খুবই ভালো। স্কলারশিপ পেয়েছিল প্রাইমারীতে, স্কুলফাইন্যাল পাশ করে স্টার পেয়ে।

মনোতোষবাবু অনেক মেয়েকেই দেখেছেন, সেদিন সরসী নায়েবের সঙ্গে এখানে এসে কমলাকে দেখে তাঁর ভালো লাগে। বলেন তিনি—ওকে আমার পুত্রবধূ করতে চাই মাষ্টারমশায়।

মনোতোষবাবু দেখেছেন কমলার মধ্যে বুদ্ধির দীপ্তি, তার ব্যক্তিত্ব সহজেই চোখে পড়ে। মনে হয় তাঁর কমলার মত মেয়েই পারবে অসিতের মত জেদী ছেলেকে ধাতে আনতে।

নরেনবাবু ওই প্রস্তাব শুনে বলেন—কিন্তু আমি তো গরীব, আপনার মত লোকের বাড়িতে মেয়ের বিয়ে দেবার মত সামর্থ তো নেই।

মনোতোষবাবু বলেন।

—ওর জন্য ভাববেন না। একটি হরিতকি আর লালপাড় শাড়ি দেবেন মাকে, বাকী সব ভার আমার।

তবু নরেনবাবু মেয়ের বিয়েতে কম আয়োজন করেন নি। শুভকাজ হতে

কোন বাধাই হয় নি।

মহামায়ার মনের কোনে কোথায় একটা নীরব ভয় রয়ে গেছে। অসিত অবশ্য বাবার কথার অবাধ্য হয় নি। বিয়ে ও করেছে।

তবু মহামায়া বলেন মনোতোষবাবুকে।

—বৌমাকে মেনে নিতে পারবেতো অসিত? পরের মেয়েকে এনে শেষে কোন—

হাসেন মনোতোষবাবু।

—অকারণেই ভয় করছো নোতুন বউ। বৌমা সব দিক সামলে নেবে দেখো। তোমাদের বৌ পছন্দ হয়েছে তো?

মহামায়াও খুশি হয়েছেন কমলাকে দেখে।

বলেন—খাসা বৌমা হয়েছে। কেন খুশী হবো না? বাড়িতে হৈ-চৈ চলেছে।

মহামায়ার সময় নেই। বলেন তিনি।

—নীচের মহলে যাচ্ছি। ওদের খাবার আয়োজন কি হলো দেখি গে!

এবাড়ির বড় মেয়ে লক্ষ্মীর শ্বশুর বাড়ি দূরে—কুচবিহার শহরে। ক'দিনের জন্য এ বাড়িতে এসে সেও আনন্দে মেতেছে। নোতুন বউ কমলাকে কেন্দ্র করে দোতলার ঘরে আসর বসেছে মেয়েদের। কমলাও নোতুন পরিবেশে এসেছে। তার চোখে পড়ে এ বাড়ির প্রাচুর্য আর বৈভব।

দেখেছে ননদ-পিসীমা-শাশুড়ীকে। শান্ত কর্মব্যস্ত মানুষ ওরা। ছোট ছেলেমেয়েদেরও দেখেছে দূর থেকে। মেজ বোন, দেওর আরও ছেলে-মেয়েদের।

কিন্তু তাদের এসময় আসার উপায় নেই।

মেজদি ওই ছেলের দলকে ধমকে ওঠে।

—এখানে কি করছিস? সাবান বাড়িতে গিয়ে খেলগে—

দলে মেজদা, সেজদা-ভাগ্নে বিলুদের সঙ্গে বিজয়ও ছিল। ছোট ছেলেটা ডাগর চোখ মেলে দূর থেকে দেখছিল তার নোতুন বৌদিকে। যেন সাজানো একটি প্রতিমা। ডাগর চোখ, সুন্দর ফর্সা রং, পানপাতার মত মুখের আদল ঘোমটার সূক্ষ্ম কাপড়ের আড়াল থেকে কি স্নিগ্ধ জ্যোতি নিয়ে যেন বসে আছে। মেজদির ধমক খেয়ে ওরা বাইরের বাড়িতে নেমে এ'ল।

বড়দি—মেজদি পিসতুতো—বোন গোলাপদি, পাড়ার শরৎ চাটুয্যে বাড়ির মেয়ে ছোটবৌ আরও অনেকেই তখন নোতুন বউ এর ঘরে গ্রামোফানে কি নোতুন গান শুনছে।

সেজদা স্কুলে পড়ে। মেজদা স্কুল ছেড়ে কলেজে ভর্তি হয়েছে। ওরা বলে—চল নীচে ক্যারম খেলবো। সেজদা একটু নীতিবাগীশ গোছের।

ক্লাশ নাইনে উঠেই সে যেন অনেক কিছু জেনে ফেলেছে। বলে সে।

—মেয়েদের সঙ্গে গল্প কি করবি? এ্যাঁ—

ওরা নেমে আসে। বিজয়ও সঙ্গে রয়েছে।

তবু কেন জানেনা বিজয়, বার বার তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেই স্নিগ্ধ সুন্দর মুখখানা। সুর উঠছে ওই ঘর থেকে। ওই আনন্দ মুখর সুরের জগতে একটি সুন্দর স্বপ্ন হয়ে যেন কে রয়ে গেছে ওখানে।

বার বারই মনে পড়ে সেই মুখখানা। দোতলার ঘর থেকে ভেসে আসছে হাসি গানের শুর।

আনমনা হয়ে ওঠে বিজয়।

সাবান বাড়ির উঠানে তখন সেজদা বুলু, নানুরা লাট্টু খেলা শুরু করেছে। বিজয়ের কাছে লাট্টু খেলা খুবই প্রিয়। জিততাল খেলায় বিজয় লেত্তির টানে এমন একটা নিজস্ব ভঙ্গীতে লাট্টু ঘোরায় যে ঘরের মধ্যের জমা লাট্টু তার লাট্টুর সাথে চোট খেয়ে বাইরে এসে পড়ে, তার ঘুরন্ত লাট্টুও ঘরের মধ্যে একপাক ঘুরে নাচ দিয়ে দাগের বাইরে ঠিকরে এসে ঘুরতে থাকে।

ফলে জিততাল খেলায় বিজয়কে ওরা পারে না।

কিন্তু আজ বিজয়ের লাট্টুর সেই দম আর নেই। বার বার চোখের সামনে কি যেন ফুটে ওঠে। আর তার লাট্টুগুলো ঘরের লাট্টুকে বের করতেও পারেনা। উলটে তার নিজের লাট্টুই ঘরের মধ্যে আটকে পড়ে।

গোটা তিনেক লাট্টু হারাবার পর বিজয় বলে।

—নাহ! ভালো লাগছে না রে।

সে খেলতে চায় না। সেজদা, বুলুরা অবাক হয়।

—সে কিরে? কি হ'ল?

বিজয় জবাব দেয় না। সরে এল ওদিকে।

সুমু এ বাড়ির পুরোনো চাকর। ছেলেদের দেখা শোনার ভার তার উপরই। সুমু তাড়া দেয়।

—দুপুর অবধি লাট্টুবাজি চলবে? এ্যা—চান টান করতে হবে না? চলো—

আজ বিজয়ও বিনা প্রতিবাদে এই শাসন মেনে নেয়। তার মনের সেই চাঞ্চল্য, কাঠিন্য সব যেন মুছে গেছে হঠাৎ।

শ্যামসুন্দর বাবু বয়স্ক লোক। এখানের কোন স্কুলের শিক্ষক। নিরীহ প্রকৃতির মানুষ। মনোতোষ বাবুর বাড়ির কাছারি ঘরের ওদিকে থাকেন।

আর সকাল সন্ধ্যায় ছেলেদের পড়াতে বসেন।

সেজ ছেলেকে একা পড়ান সন্ধ্যার সময়। শ্যামসুন্দর বাবুর দীর্ঘদিনের

অভ্যাস সকালে স্নান সেরে কাছারি বাড়ির ছাদে উঠে সূর্যপ্রণাম করা। তার ওই পুণ্যকর্মটি না করে শ্যামসুন্দর বাবু জল গ্রহণও করবেন না।

সুমুদা এ বাড়ির পুরানো কাজের লোক। সকালের জল খাবার ও তৈরী হয়ে যায়। সুমুদার অনেক কাজ। ফলে সুমুদা শ্যামসুন্দর বাবুর জলখাবার এক বাটি হালুয়া আর একবাটি দুধ নিয়ে ছাদেই দিয়ে আসে।

ওটা রাখা থাকে ছাদের একদিকে, শ্যামসুন্দর বাবু তখন সূর্য প্রণামে ব্যস্ত।

বিস্তীর্ণ ছাদ, ওদিকে মহানন্দার রূপালী বালুচরের বুকে জলধারা বয়ে চলেছে। আমবাগান - ছোলা মটরের ক্ষেত। ওই জগতের দিকে, আকাশের দিকে (মেঘলা থাকলে তো সূর্য খুঁজতে তার বেশ সময়ই লাগে) চেয়ে উদাত্ত কণ্ঠে চোখবুজে স্তোত্র পাঠ করেন।

—ওঁ জবা কুসুম শঙ্কাশং কাস্যপেয়ং মহাদ্যুতিং
ধান্তারিং সর্ব্বপাপোঘ্নং প্রণ্যেহোস্মি দিবাকরম্"

ভক্তিভরে প্রণাম করে এবার হালুয়া সহযোগে দুধপান করে বলশালী হয়ে নীচে এসে সেজদা এবং অন্য ছেলেদের উদ্দেশ্যে হুঙ্কার ছাড়েন।

—কইরে! পাঠাভ্যাস করতে হবে না শাখামৃগের দল। বেলা যে মধ্যাহ্ন হয়ে গেল?

একে একে নিদারুণ অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিজয় এবং অন্য ছেলেরা পড়তে বসে শ্যামসুন্দর বাবুর থেকে নিরাপদ দূরত্বে। তবু আক্রমণ ঘটেই! এহেন পরাক্রান্ত শ্যামসুন্দর বাবু ক'দিন ধরেই খুব বিমর্ষ। কারণ সকালে সূর্য প্রণাম করার সময় সুমু দুধ হালুয়া রেখে আসে।

কিন্তু ওদিকে মুখ করে প্রণামাদি সেরে যথন দুধ হালুয়ার সন্ধান করেন তিনি, দেখা যায় হালুয়াটাই রয়েছে, কিন্তু দুধের বাটি কোন মন্ত্র বলে শূন্য হয়ে গেছে।

প্রথমে হতচকিত হয়ে যান এই বিচিত্র ব্যাপারে।

ব্যাপারটা অদ্ভুদ রহস্যময়ই ঠেকে।

পরের দিন ও সেই একই কাণ্ড। দুধ নেই! কিন্তু কোন ভোজবাজীর বলে দুধের বাটি শূন্য হয়ে যাচ্ছে এটা বোঝা যায় না। আর ব্যাপারটা কাউকে বলতেও পারেন না।

সুমু দুধও ঠিকই দেয়।

হঠাৎ সে দিন ব্যাপারটা শ্যামসুন্দরবাবুর চোখে পড়ে যেতেই তিনিও অবাক হন। কদিন ধরে এই কাণ্ড চলেছে। আজ দুধচোরকে তিনি হাতে-নাতে ধরেছেন। অবশ্য ধরেছেন বলা যায় না, চিনেছেন।

শ্যামসুন্দরবাবুর কোন নেশা ভাং নেই। কিন্তু এই চোরকে ধরতে গেলে

কিঞ্চিৎ ওই জাতীয় বস্তুর দরকার। কি ভাবতে ভাবতে শ্যামসুন্দরবাবু নীচে নেমে গেলেন।

ও বাড়ির নীচের মহলে রান্নার ব্যবস্থা। বিরাট চত্বর, চারিদিকে বারান্দা, সেখানে তরিতরকারী, মাছ কোটা হয়। দুজন উড়িষ্যাবাসী রসুইকর এতবড় বাড়ির লোকজনদের রান্না সামলাতে হিমসিম খায়, আর বিয়ে বাড়ির আত্মীয় কুটুমের জের তখনও মেটেনি।

পদ্মনাভ ঠাকুর চেঁচামেচি করছে

—কব হইব তুমার তরকারি কুটা? উনুনের আঁচ বহি যিব অ মানদা।

মানদা ঝি একরাশ তরকারি নিয়ে বসেছে। বলে সে।

—আমার কি চারটা হাত? দেখছতো কাটছি।

ওদিকে গোদাবরী ঠাকুর মাছ কষছে বড় কড়াই এ। অবশ্য গোদাবরী ওর আসল নাম নয়, পায়ে গোদ থাকার জন্য একটা পা বেশ মোটা, আর ওই নামটাই চালু হয়ে গেছে।

শ্যামসুন্দর বাবুকে দেখে পদ্মনাভ চাইল।

—আপুনি? মাষ্টরমশায়? দুধ হালুয়া যায় নাই ওপরু?

শ্যামসুন্দরবাবু ওকে বারান্দার ওদিকে ডেকে বলেন—একটু ভাং দিতে হবে ঠাকুর?

পদ্মনাভ অবাক হয়। এ বাড়িতে নেশা ভাং একেবারে অচল। ধরা পড়লে কিংবা কত্তাবাবুর কানে উঠলে বিপদ হবে। তাই ওরা এই দ্রব্যটা খেলেও এখানে কদাপিও খায় না।

দিনের কাজ সেরে নদীর ওপারে কত্তাবাবুর চাষ বাড়িতে চলে যায়। নদীর ধারে বিরাট এলাকা নিয়ে নানা ফসলের-শাক শব্জীর চাষ হয়। কলমের উৎকৃষ্ট আম লিচুর বাগান ও আছে। পুকুরে মাছ হয় প্রচুর, দুধের জন্য অনেক গরু-মোষ রাখা আছে। চাষ-বাড়িতে ওসব দেখা শোনা করার জন্য অনেক লোকজন আছে। তারাই রোজ সকালে চাষ-বাড়ি থেকে শাক শব্জী, মাছ দুধ ফলমূল আনে। সেখানে উড়িষ্যাবাসী কিছু লোকজনও আছে।

পদ্মনাভ, গোদাবরী ঠাকুর দুপুরে ওখানে গিয়ে ওই দ্রব্য পান করে। এখানে আসা নিষেধ। পদ্মনাভ অবশ্য প্রথমেই জানায়-মু উসব খাইনা।

গোদাবরী ঠাকুরও সেই উত্তরই দেয়। কিন্তু শ্যামসুন্দরবাবু বলেন, —তাহলে রোজ দুপুরে কোথায় যাস্ বাপু? আর যখন ফিরিস তখন কত্তাবাবুকে ডেকে দেব!

ঘাবড়ে যায় ওরা, অবশেষে পদ্মনাভ বলে।

—কেউ যেন জানিবার না পারে মাষ্টারবাবু, আজ সন্ধ্যায় টিকে দিমু!

শ্যামসুন্দরবাবু বলেন—একটু কড়া ডোজ দিবি বাবা। দরকার আছে।

তারপরই শ্যামসুন্দরবাবুর খেয়াল হয় তার ছাত্রদের কথা।

ওদিকে সাবান বাড়িতে তাদের আস্তানা। শ্যামসুন্দরবাবু এবার সিমুকে হাঁক পাড়েন—কই রে সুমু, শাখামৃগদের পাঠিয়ে দে। বিয়ের পরব নে থাকলে চলবে?

রহিম রুটিওয়ালা সহরের পথে পথে সকাল থেকেই তার পশরা নিয়ে বের হয়। একটু বড় গোলাকার ঝুড়িতে স্থানীয় বেকারির রকমারি পাউরুটি, হাতেগড়া মিষ্টি, নোনতা বিস্কুট, নান্ খাটাই, কেক এসব নিয়ে সকালে বের হয়।

বিভিন্ন বাড়ির ছেলে-মেয়েরা তার খদ্দের।

এ বাড়ির সমৃদ্ধির কথা সকলেই জানে। আর এরাও রহিমের বনেদী খরিদ্দার। এখানে তার বিক্রী বাটাও বেশ ভালো হয়।

বড় রাস্তার উপর বাড়িটার সীমা প্রাচীর, পাশাপাশি তিনটে মহল। আর তাই গেটও তিনটে।

সকালে রহিমের ডাক শোনা যায়—পাউরুটি, বিস্কুট—

সেজ ছেলে, বুলু-নানু-বিজয় সকলেই বের হয়ে আসে।

রহিমকে নিয়ে এসেছে সাবান বাড়ির চত্বরে। ঝুড়িটা নামিয়েছে রহিম।

বুলু বলে কই কি আনছ দেহি?

নানু বলে—নান খাটাই দাও গিয়া, অ রহিম চাচা।

বিজয় চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল, রহিম বলে-দিমু। ফাস কেলাশ নান খাটাই কেক আনছি দিমু।

ঝুড়ির ঢাকনাটা খুলতে গিয়া হঠাৎ তাদের ভিড় ঠেলে বিজয়কে আসতে দেখে রহিম ঝপ্ করে আবার ঝুড়ির ঢাকনা বন্ধ করে দিয়েছে।

সেজদা বলে কি হ'ল? দাও

রহিম বিজয় নামে ঐ ছোট্ট ছেলেটাকে চেনে ভালো করে। এবাড়ির ছেলেদের মধ্যে দেখতেও সুন্দর। শ্যামবর্ণ রং—মাথার চুলগুলো কপাল ছেয়ে থাকে। আর দুটো চোখে ওর দুষ্টুমি মাখানো। ও সকলকে হাতাহাতি করে রুটি বিস্কুট কেক তুলে দেয়। আর সেই ফাঁকে রহিমের হিসাব আর মেলেনা। এমন ঘটনা দু'একবার কেন প্রায়ই ঘটায় বিজয়।

রহিম ওর বুদ্ধিকে পারে নি।

তাই সাবধান হতে চায় সে। বলে—না। বিজয় থাকলে ঝুড়ির ঢাকা খুলবো না। মাসের হিসাব গড়বড় হই যায়।

বিজয় ও বলে-বা রে? তোমার পয়সা দিই না আমরা? তুমিই হিসাব ভুল করো। দাও বিস্কুট।

রহিম গোঁ ধরে। শেষ অবধি রফা হয়। বলে সে।

—বিজয় বাবু, তুমি মালে হাত দিবে না, একটা কথা ও কইব না।

হয় ঢোকা খুলুম! তফাৎ দাঁড়াই মাল লও! কাছে আসবা না।

বিজয় অবশ্য কিছু যে এমন কাজ করে না তা নয়। মজা পায় এতে।

বুলু, নানু—সেজদারাও লাভবান হয় কিঞ্চিৎ। বিজয় বলে।

– আমি ওসব করি? পয়সা দিই না?

নানু ও বলে—কি বলতে চাও তুমি? নেব না বিস্কুট—

বুড়ো রহিমের এবার রাগ পড়ে। বলে সে।

—তা কইছিনা। হিসাবটা ঠিক করবা ছোট খোকা? লও—বিজয়কেই সে তার হিসাব রক্ষক করতে চায়।

কমলা এবাড়িতে নোতুন বউ হয়ে এসেছে ক'দিন'। গরীবের ঘরের মেয়ে এই প্রাচুর্যের মধ্যে পড়েও সে বিভ্রান্ত হয় নি। স্বামী অসিতকে দেখেছে। ক'দিনেই বুঝেছে কেমন জেদি, কঠিন একটি মানুষ।

অসিত দেখেছে নোতুন বউকে। কমলার রূপে যেন একটা স্নিগ্ধতা আছে, যেটার স্পর্শ অন্যকেও কিছুটা বদলে দেয়।

অসিত ওর সামনে নিজেকেই যেন ছোট মনে করে। নিজে ম্যাট্রিকও পাশ করতে পারে নি। কমলা কুষ্টিয়া কলেজে পড়ছিল।

অসিতের মনে নিজের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে কিছুটা ধারণাও আছে। জমিদারীর মহলে সকলেই তাকে সমীহ করে। আমলা গোমস্তাদের অসিত ধমকে কথা বলে।

কমলা সেটা জানে না। বলে সে।

– এবার কাজের ফাঁকে পড়াটা আবার সুরু করো?

অসিত চাইল স্ত্রীর দিকে। মনে হয় কমলা যেন তাকে একটু নীচু নজরেই দেখছে। অসিত ওর কথায় হেসে ওঠে।

কমলা চাইল। অসিত বলে।

—পড়াশোনা যা শিখেছি তাতে জমিদারী চালাচ্ছি চুটিয়ে। ওসব ম্যাণ্টার-ফ্যাণ্টার তো ক'টাই রেখেছি। দাও পান দাও—

কমলা চুপ করে গেল।

অসিত পানটা হাতে নিয়ে বলে—পানের আগে খাবার জল দিতে হয় তাও জানো না। এসব শিক্ষাও হয়নি, শুধু দুপাতা বইই পড়েছো মাণ্টার-বাবার কাছে।

কমলা চুপ করে যায়।

মধ্যরাত্রি। জানালার বাইরে দূরে মহানন্দার চরে চাঁদের আলোর বান ডেকেছে। একটা রাত জাগা পাখী বার বার ডেকে কোথায় হারিয়ে গেল।

অসিত বলে—কদিন বিয়ের হাঙ্গামায় মহলে যেতে পারিনি। ভাবছি পরশু

থেকেই ভবানীপুরের কাছারিতে চলে যাবো।

কমলা শুনছে ওর কথাগুলো। তার কুমারী মনের অতলে সকল মেয়ের মতই কিছু স্বপ্ন ছিল। একজনের নিঃশেষ প্রীতির বাঁধনে সে বাঁধা পড়তে চেয়েছিল, তাকে কেন্দ্র করেই তার জীবনের কিছু রঙীন স্বপ্নও দেখেছিল সে। কিন্তু কোথায় সব স্বপ্ন কি নিষ্ঠুর আঘাতে চুরমার হয়ে গেছে তার।

অসিত বলে—ঘুম আসছে না?

মাথা নাড়ে কমলা, যেন তার মনের অতলের চাপা ব্যর্থতার জ্বালা ফুটে উঠতে চায়। প্রাণপণে সেটাকে চেপে রেখেছে সে। তার মনের সেই ঝড়কে বোঝবার ক্ষমতা বা মানসিকতা অসিতের নেই।

তার পরিবর্তনশীল মন কোন কিছুকেই গভীরভাবে নিতে পারে নি। প্রথমে বিয়ের ব্যাপারে একটা স্বপ্ন সেও দেখেছিল, কিন্তু অসিতের অনেক পাওয়ার স্বপ্ন দেখা লোভীমন ও শিক্ষিত রুচিবতী মার্জিতা দৃষ্টির মেয়েটিকে ঠিক মেনে নিতে পারে নি। এই ধরনের মেয়েদের সঙ্গে মিশতে অভ্যস্ত নয়। তাই ক'দিনেই দুজনের মধ্যে একটা নীরব ব্যবধানই গড়ে উঠেছে। যেটা কমলাও অনুভব করেছে। কিন্তু কারণটা জানে না সে।

অসিতের চোখে ভবানীপুরের সেই পরিবেশ সবুজ গ্রামসীমায় একটি উদ্দাম যৌবনা মেয়ের ছবিটাই বার বার ফুটে ওঠে। কমলার মধ্যে সেই উদ্দামতার লেশমাত্র নেই। কমলা সুন্দরী, কিন্তু সংযত, স্থির। তার মনের রহস্যকে বোঝবার মত মানসিকতা অসিতের নেই। অসিত বলে।

—আলোটা নিভিয়ে দিয়ে শোভা-টোভা দ্যাখো। আমার ঘুম আসছে।

কমলা আলোটা নিভিয়ে দিয়েছে।

তার ব্যর্থ নারীমন কি বেদনায় গুমরে ওঠে, দুচোখে জল নামে। কিন্তু অসিত সেই ব্যর্থতার কোন খবরই রাখে না। সে তখন গভীর ঘুমে মগ্ন। স্বপ্ন দেখছে ভবানীপুরের সেই উদ্দাম যৌবনা মেয়েটির। কামিনী তার মনে সেই নেশার উত্তেজনা এনেছে-যা কমলার মত মেয়ে কোনদিনই পারবে না।

কমলা তবু তার মনের এই দুঃখটাকে কোথাও প্রকাশ করে নি। তার সহ্য শক্তিও অনেক। সকালে এ বাড়িতে তখনও হৈ চৈ চলছে।

আত্মীয় কুটুমরা আজ-কালের মধ্যেই যে যার যার ঘরে ফিরে যাবে। কমলা সকালে হাতমুখ ধুয়ে জানলার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। বড় বাড়ির থেকে বাইরের সুন্দর জগৎটা খুবই কাছে। দেখছে সে। হঠাৎ কমলার নজরে পড়ে সাবান বাড়ির উঠানে ছেলেদের। এ বাড়ির ছেলেরা পাউরুটিওয়ালাকে ঘিরে ভিড় করেছে। সেই ছোট ছেলেটিও আছে।

ওর কালো চোখে দুষ্টুমি আর বুদ্ধির ঝকমকানি। ওই ছেলেদের মধ্যে সহজেই ওকে চোখে পড়ে। রুটিওয়ালার ভয় আর শেষ অবধি ওই ছেলেটিকেই

বিশ্বাস করার অসহায় ভঙ্গী দেখে হেসে ফেলে কমলা। বড়দি লক্ষ্মী শুধোয়।
—এত হাসছো কেন?

কমলা বলে—দেখুন না, কাণ্ড? কি ছেলে?

লক্ষ্মীও দেখেছে ব্যাপারটা। সে বলে।

—বিজয়। তোমার ছোট দেওর—ও অমনিই ভয়ানক দুরন্ত--

কমলা বলে—দুরন্ত নয়-সবচেয়ে বেশী বুদ্ধিমান।

হঠাৎ এমনি সময় সারা বাড়িতে একটা হৈ চৈ পড়ে যায়। ও বাড়ির ছাদের উপর কি যেন একটা সাংঘাতিক কাণ্ড ঘটে গেছে।

সুমুর চীৎকার শোনা যায়। শ্যামসুন্দরবাবু হাঁক পাড়েন।

—লাঠি আন। দড়ি—দড়ি—আন।

সেজদা—অসিতদা সকলেই দৌড়চ্ছে। হৈ চৈ পড়ে গেছে বাড়িতে।

মহীতোষবাবুও নিজের ঘরে কি সব কাগজপত্র দেখছিলেন তিনি ও বারান্দায় বের হন। দেখা যায় গোদাবরী ঠাকুর হাতির মত একটা গোদা পা নিয়ে, ইয়া এক খুন্তি হাতে দৌড়চ্ছে ছাদের দিকে।

বাড়ির মেয়েরাও ছাদে গিয়ে উঠেছে।

মহীতোষবাবু শুধোন—কি ব্যাপার?

মহামায়া দেবীও ভাড়ার থেকে বের হয়ে এসেছেন। বলেন।

—চোর ধরা পড়েছে।

—চোর। সাত সকালে চোর ঢুকবে এ বাড়িতে? সে কি?

ছাদে তখন তুমুলকাণ্ড চলেছে।

শ্যামসুন্দরবাবু আজ সুমুকে দুধটা দিয়ে যাবার পরই কালকের পদ্মনাভ ঠাকুরের দেওয়া কড়া ভোজের ভাং সবটাই দুধের বাটিতে মিশিয়ে রেখে ওদিকে সূর্য প্রণামে মন দেবার চেষ্টা করেন।

আর চোর একটি বিশাল হনুমান।

হনুমানের উৎপাত এখানে খুব বেশী। দলবেঁধে তারা সারা মহল্লার ছাদে গাছের উপর ঘুরে বেড়ায়। গৃহস্থের কলা—পেপেঁ যা পায় খায়, নষ্ট করে। কাপড় শুকুতে মেলে দিলে অনেক সময় সেটাকেও নষ্ট করে দেয়। তছনছ করে।

একটি বীর হনুমান ক'দিন ধরেই শ্যামসুন্দরবাবুর সকালে দুধের খবরটা পেয়ে গেছল। সে রোজ এসে ওই প্রণামের অবসরে দুধের বাটি শেষ করে যেতো। বেশ ক'দিন নজর রাখার পর শ্যামসুন্দরবাবু আসল চোর এর সন্ধান পেয়ে ওই ব্যবস্থাই করেছেন।

হনুমান আজও দুধের বাটি শেষ করেছে, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সুরু হয়েছে নেশার ঘোর।

শ্যামসুন্দরবাবুও সময়টা দিয়ে এবার বীর পুরুষকে ঝিমোতে দেখে

সোরগোল তুলেছে। সুমু এবং আরও অনেকে ছুটে এসেছে। হনুমান ব্যাপার বেগতিক দেখে পাশেই শরৎ চাটুয্যে-মহাশয়ের বাড়ির ছাদ টপকে পালাবার মতলবে লাফ দিতে গিয়ে বুঝতে পারে সাংঘাতিক কিছু ঘটে গেছে। লাফ দেওয়া আর হয় না।

নেশার ঘোরে টলে পড়েছে এই ছাদেই। তারপর সাটপাট হয়ে গভীর নিদ্রায় মগ্ন হয়ে যায়।

ছাদে লোকজন জুটে গেছে। শ্যামসুন্দরবাবুর ওই বিচিত্র চোর ধরা দেখে হাসছে সকলেই। চোর তখন বেঘোরে ঘুমুচ্ছে'। অসিত, মেজ ছেলে জামাইরাও এসেছে। সুমু একটা দড়ি দিয়ে বাঁধার চেষ্টা করছে।

মহীতোষবাবুকে আসতে দেখে সকলেই থেমে যায়।

মহীতোষবাবু বলেন—দুধই একটু খাচ্ছিল সুমু, তাই বলে এই অবস্থা করবে? ওকে বাঁধিস না। যেমন আছে থাক, নেশা কাটলেই চলে যাবে। বরং নজর রাখ ছাদে যেন কেউ ওর কাছে না যায়।

নেশা ছুটে গেলেই ও কাউকে কাছে পেলে কামড়ে দিতে পারে। নীচে যাও তোমরা।

এমন জমকালো মজাটা জমতেই দিলেন না উনি। নীচে নেমে এসেছে অনেকেই। হনুমান রইল ওখানে।

ছেলেদের মধ্যেও খবরটা রটে গেছে। মেজদা—সেজদা—বুলু, নানুরা দুঃখ করে ছাদে যাওয়া নিষেধ। উঃ হনুমানটাকে দেখে নিতাম একবার।

বুলু বলে—সুমুদা নাকি চিলে ছাদের কাছে পাহারা দিচ্ছে যাতে ছাদে কেউ না যায়।

মেজ ছেলে কলেজে পড়ে। সে বলে বিজ্ঞের মত।

—ঠিকই করেছে বাবা। হনুমানে কামড়ালে মানুষ বাঁচে না—

জলাতঙ্ক—হাইড্রোফোবিয়া জানিস?

বিজয় চুপকরে শুনছে কথাটা। ওসব ইংরাজীর অর্থ বোঝে না সে। তার অদম্য ইচ্ছা হনুমানকে দেখতেই হবে একবার। আর নেড়োচড়ে গায়ে হাত দিয়েই দেখতে হবে।

কিছু কাজকর্মের ব্যাপারে বিজয় তার নিজের পথেই চলে। সকলকে জানায় না, কারণ অন্যরা জানলে অনেক কাজ ঠিকমত করা যায় না।

দল থেকে বের হয়ে বিজয় সুযোগ খুঁজতে থাকে কখন সে ছাদে উঠবে। এর মধ্যে গোপনে দু'একবার দোতলাতেও উঠে গেছে। চিলে ছাদের দরজার কাছে ও গেছে। দূর থেকে দেখা যায় হনুমান তখনও ঘুমুচ্ছে, কিন্তু সুমুদা জেগে আছে।

বিজয়কে দেখে ধমকায়—এখানে কি করছিস? যা—

বিজয় নেমে এসেছে। কিন্তু তারও জেদ চেপে গেছে। একবার ওই হনুমানের গায়ে সে হাত দেবেই, ল্যাজটাও টেনে দেখতে হবে তাকে।

আর সে সুযোগও মিলে যায়।

মহীতোষবাবুর গড়গড়া খাওয়ার অভ্যাস। কাজের ফাঁকে ফাঁকে অম্বুরী তামাকের কলকেটা জ্বলে ওঠে। মিঠে সৌরভ ওঠে। কিন্তু ঠিকমত তামাক সাজা সকলের দ্বারা হয় না। এ কাজে সমু বেশ পারদর্শী। তাই ওর ডাক পড়ে।

আর সমুদাও জানে কত্তাবাবুর তামাকের দরকার। তাই সমুদাও ছাদের দরজাটা বন্ধ করে এক ফাঁকে নেমে এসেছে। তামাক দিয়েই আবার ফিরে যাবে হনুমান প্রহরায়।

সন্ধানী বিজয়ও নজর রেখেছিল, সমুদাকে নেমে যেতে দেখে এবার পায়ে পায়ে এগিয়ে আসে। বারান্দায় কেউ নেই।

বিজয় সাবধানে চিলে ছাদের সিড়িতে উঠে দরজা খুলে ছাদে বের হয়ে এল, ফাঁকা ছাদ।

এখানে আর কেউ নেই। ওদিকে হনুমানটা তখনও বেঘোরে পড়ে আছে। বিজয় এগিয়ে গিয়ে দেখছে জীবটাকে। এতকাছে থেকে এতবড় হনুমানকে কখনও দেখেনি।

বলিষ্ঠ পেশীবহুল দেহ, মুখটা কালো। গায়ের রং সাদা। লেজটা পড়ে আছে। বিজয় সাবধানে ওটার গায়ে হাত দিল। নরম রোমশ দেহ। মুখ—নাক-চোখ-কান সবই আছে। ল্যাজটা ধরে টানতেই বিপদ ঘটে যায়।

প্রায় ঘণ্টা তিনচার হ'ল ভাং সমেত দুধ খেয়ে নেতিয়ে পড়েছিল হনুমানটা। কয়েকটা ঘণ্টা শান্তিতে ঘুমোবার পর নেশাটা কমে এসেছে। সেই সময় ল্যাজে টান পড়তেই জেগে উঠে।

আর সামনে একটা ছোট্ট বেয়াড়া ছেলেকে দলের প্রধান হনুমানের ল্যাজে টেনে এতবড় অপমান করতে দেখে বীর পুরুষের আত্মসম্মান জ্ঞানটা চড়া দিয়ে ওঠে।

লাফ দিয়ে ল্যাজটা বিজয়ের হাত থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে এবার আকর্ণ সাদা ঝকঝকে দাঁত বিস্তার করে দুঃসাহসী বালককেই চড় বসাবার জন্য হাত তুলেছে।

বিজয় এমন ঘটনার জন্য তৈরী ছিল না। ভেবেছিল যেমন ঘুমুচ্ছে ও তেমনিই ঘুমুবে। ওর ল্যাজ টেনে বিজয় নীচে গিয়ে সেজদা বুলু নানুদের সামনে তার সাহসিকতার ঘটনটা শোনাবে।

কিন্তু তার উল্‌টোটাই ঘটে গেছে। হনুমানটা তাড়া করে আসছে। বিজয় ও চীৎকার করে উঠে চিলে ছাদের সিঁড়ি দিয়ে দুম দাম করে নামার চেষ্টা করেছে প্রাণপণে।

আর সেই সময়ে পা ফস্‌কে সিঁড়িতে গড়িয়ে পড়েছে। প্রচণ্ড আঘাতেই

লাগে মাথায়, সামনে ওই হনুমান—গড়িয়ে পড়েছে বিজয়।

ওর চীৎকারে অনেকেই ছুটে আসে।

সুমু কলকে ফেলে এসেছে, বের হয়ে আসেন মনোতোষবাবুও। হনুমান ততক্ষণে একটা গর্জন করে লাফ দিয়ে পাশের বাড়ির ছাদ হয়ে তেতুলগাছের মগডালে।

সেদিকে দেখার সময় কারোও নেই, সিঁড়িতে গড়িয়ে পড়েছে বিজয়, তার জ্ঞান নেই।

মহামায়াও এসে পড়ে। বলে সে।

—দুরন্ত ছেলেটাকে নিয়ে আর পারলাম না ; দ্যাখো আবার কি বিপদ বাধালো।

মনোতোষবাবু বলেন তাই দেখছি। আর কোন ছেলে এলনা, এল ওই-ই।

বিজয়ের চোখের সামনে তখনও জমাট অন্ধকার।

জ্ঞান ফেরেনি। ডাক্তারবাবু এসে ওষুধপত্র দিয়ে গেছেন্। তাঁর ভয় বেকাদায় পড়ে মাথায় চোট লেগেছে বোধহয়। তাই যদি হয় তাহলে ভয়ের কারণ। সকলেই ভাবনাতে পড়েছে।

বিজয় তখন যেন কি স্বপ্ন দেখছে।

তার অন্ধকার নামা চোখের সামনে কি একটা আতঙ্কের ছবি ছুটোছুটি করছে। বিরাট হনুমানটা দাঁত বের করে এগিয়ে আসছে।

দৌড়চ্ছে সে।

কিন্তু ভয় তার বোধ হয় না।

একটি উজ্জ্বল হাসি ভরা মুখ, দুচোখের চাহনি বিজয়ের শিশুমনে কি যেন নির্ভর আনে। ওই মুখ, ওই চাউনি সে চকিতের জন্য দেখেছিল, আর সেটা তার শিশুমনে তখনই কি পরম নির্ভর এনেছিল।

বিজয় চমকে ওঠে হনুমানটা লাফ দিয়ে তেড়ে আসছে, ধরে ফেলবে তাকে। আঁচড়ে কামড়ে দেবে। আর মেজদার কথাটা মনে পড়ে, হনুমানে কামড়ালে কি যেন ইংরাজী কঠিন রোগ হয়, মানুষ বাঁচে না।

চীৎকার করে ওঠে সে।

হঠাৎ চোখ মেলে চাইল বিজয়।

ওর দুচোখে ভীত চকিত চাহনি, হাত দিয়ে কি যেন আঁকড়ে ধরেছে বিজয়। হঠাৎ বিজয়ের চোখে পড়ে উজ্জ্বল সেই মুখ, ফর্সা পান পাতার নিটোল চাহনি, দুচোখে মিষ্টি নির্ভর আনা চাউনি। তাকে ঘিরে সুন্দর মিষ্টি নাম না জানা ফুলের সুগন্ধ।

বিজয় চাইল ওর দিকে।

ওর মুখে চোখের সেই আতঙ্ক মুছে গেছে, লজ্জায় বিজয় ওর শাড়ির

মুঠটা ছেড়ে দেয়।

চারিদিকে আতঙ্কিত মুখ। বাবার মত গম্ভীর মানুষটিও রয়েছেন, মায়ের মুখে এবার নিশ্চিন্তে হাসির আভা ফুটে ওঠে।

বিজয় বলে আমি কোথায়? মা—

কমলাই সেদিন বারান্দা থেকে তুলে এনেছিল বিজয়ের জ্ঞানহীন দেহটাকে। কয়েকঘণ্টা সেবা করেছে সেইই। এবার বিজয়কে সুস্থ হয়ে চোখমেলে কথা বলতে দেখে কমলা বলে।

—না মা, মনে হয় মাথায় তেমন চোট কিছু লাগেনি।

মহামায়াও নোতুন বউমার এই সেবাযত্নে মুগ্ধ হয়েছে, মনোতোষবাবুও। কমলা বলে বিজয়কে—আমার ঘরে রয়েছো তুমি। এখন উঠোনা, চুপচাপ একটু গরম দুধ খেয়ে শুয়ে থাকো।

বিজয় জ্ঞান হারাতে কিছুক্ষণ এবাড়ির মানুষগুলো বিব্রত হয়ে পড়েছিল এই অকারণ বিপদে। ছেলেটি নানা ঝামেলাতেই থাকে। এখন সুস্থ হতে তারাও নিশ্চিন্ত হয়।

মহামায়ার উপর এতবড় সংসারের ভার।

এবাড়ির ছেলেদের উপর ঠিকমত নজর দেবার সময় ত তাঁর নেই। ছেলেরা সাবানবাড়িতে সুমুর হেপাজতে থাকে। নিজেরাই খেয়ে নেয় সময়মত, ওদের সঙ্গে মায়ের কিছুক্ষণ দেখা হয় রাতে।

মহামায়া বলে—উঃ যা ভাবনাতে ফেলেছিলি বিজু, বারবার বলি একটু শান্ত হয়ে থাক। বৌমা ওটাকে এখানেই রাখো এখন, নইলে আবার নেমে গিয়ে কি বাধাবে কে জানে?

কমলাও কিছুটা চিনেছে বিজয়কে, দুরন্ত-সুন্দর-মিষ্ট ছেলেটাকে তারও ভালো লাগে। বলে সে।

—আপনি কিছু ভাববেন না মা। ও এখানেই থাকুক।

মাহামায়া নিশ্চিন্ত হয়েছে, এবার আবার এতক্ষণের পরিত্যক্ত সংসারের যোয়ালটা কাঁধে তুলে নিতে হয়। খেয়াল হয় তার বহু জরুরী কাজ বাকী, লক্ষ্মী এবাড়ির বড় মেয়ে, আজ সন্ধ্যার ট্রেনে কুচবিহার ফিরে যাবে তার বাড়িতে। তার যাবার আয়োজন আছে। অন্য কাজও বাকী, আবার এই সংসারের কিছুক্ষণের জন্য থেমে যাওয়া চাকাটা সচল হয়ে ওঠে।

বিছানায় উঠে বসেছে বিজয়।

তার মনে নীরব পরাজয়ের ছায়া। সেজদা-বুলু-নানু-নিতু ওরাও এসেছিল এ ঘরে। ওদের কাছে যেন হেরে গেছে বিজয়। হনুমানকে হারাতে গিয়ে সে নিজেই হেরে গেছে নিদারুণভাবে।

এ যেন তারই চরম লজ্জার কথা। বৌদির ডাকে চাইল বিজয়। ওর

চোখের তারায় বিচিত্র ঝিলিক।

—হনুমান দেখার সাধ হল কেন হঠাৎ?

বিজয় চাইল। বলে সে—দেখছিলাম ওদের হাত না ল্যাজ কোনটা বড়। কাছ থেকে তো দেখিনি।

—খুবতো সাহস তোমার? বৌদি বলে।

বিজয় ভরসা পেয়ে বলে—মহানন্দা নদী সাঁতরে পার হতে পারি, ওই গাছের মগডালে উঠতে পারি, অনেক পাখীর বাচ্চা আছে ওখানে, ওপারে চাষ বাড়িতে একাই চলে যেতে পারি। কাচা মিঠে বারোমাসের আম হয় ওখানে।

কমলা দেখছে দুরন্ত ছেলেটিকে।

ওর মাথার চুলগুলোকে সরাতে সরাতে বলে—

—অনেক কিছুই জানো দেখছি। তা পড়াশোনা করা হয়, না ওইসব কীর্তি করো?

বিজয় জানাই, পাঠমঞ্জরী পড়ছি। অংক ও সরল সমীকরণ শিখেছি। ঐকিক নিয়ম –

তার পরে বিজয় নিজের কৃতিত্ব জাহির করার জন্য জানায়।

—সামনের বছর হাইস্কুলে ভর্তি হবো। বাড়ির মাষ্টারমশায় ওই শ্যামবাবু বলেছেন—

কমলা দেখছে ওকে। বলে সে বিজয়কে।

—কাল থেকে আমার এখানে বই খাতাপত্র নিয়ে এসে পড়বে,

বিজয় চাইল ওর দিকে। ওদের বাড়িতে মা, বড়দি, মেজদিকে দেখেছে তেমন লেখাপড়া জানে না। কিরণদি এখানে গার্লস স্কুলে পড়ান। এবাড়ির মেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষার ভার তাঁর উপর। সে বিদ্যে নিয়ে বিজয়কে পড়াতে পারে না ওরা। তাই বৌদির কথায় একটু অবাক হয় বিজয়।

শুধোয়—তুমি পড়াবে?

কমলা হাসে। বলে সে—কাল থেকে সুরু করো। দেখা যাক কেমন বিদ্যে বুদ্ধি তোমার। অন্য সবদিকে তো দেখি খুবই এলেমদার তুমি। আর ওই গাছের মগডালে উঠবে না, যখন তখন নদীতে সাঁতার কাটতেও যাবে না। কথাটা মনে থাকবে?

বিজয় দেখছে বৌদিকে। ওর সুন্দর মুখ; ওই চোখের নীরব শাসনটুকু মেনেও কি গভীর তৃপ্তি বোধ করে সে।

বিজয়-এর সেই আলোভরা জগৎ, ঘর পালানো মন যেন গাছের ছায়াঘন জগৎ, মহানন্দার বালুচরের সান্নিধ্যের চেয়েও কি উষ্ণ মধুর সান্নিধ্যের স্পর্শ অনুভব করে বৌদির চাহনির মধ্যে, তার ছোট্ট শিশুমনের আকাশে যেন রাত্রির ম্লান অন্ধকার ভেদ করে একটি নোতুন উজ্জ্বল তারার আবির্ভাব ঘটেছে। তার স্নিগ্ধ

জ্যোতি বিজয়ের মনের অনেক অন্ধকারকে মুছে দিয়েছে। কমলা দেখছে ওকে। শুধোয় সে—

—কি হ'ল ? জবাব দিচ্ছ না যে ? আমার কথা শুনবে না তাহলে ? বিজয় বলে—ঠিক আছে। তাই হবে বৌদি।

বিজয়ও নিজেকে ওর কথামত চালাতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। বৌদির চোখের তারায় তাই খুশির ঝলক দেখে সেও খুশি হয়েছে।

বৌদি বলে—কথা দিলে কিন্তু।

হাসল বিজয়, বৌদি ওকে কাছে টেনে নেয়। ছোট ছেলেটা ওই মধুর আকাশে কোন এক বিচিত্র জগতের গভীরে হারিয়ে যায়। বিজয়ের নোতুন জগৎটা অনেক বর্ণ গন্ধময়, প্রাণ উচ্ছল।

বৌদি বলে—ওই বুড়ো রুটিওয়ালাকে জ্বালাতন করো কেন ? চমকে ওঠে বিজয় এইকথা শুনে। শুধোয় সে—

—কে বলেছে ? বুলু বোধ হয় ?

বুলুই একটু বেপরোয়া। বিজয়ের লাট্টু হাতিয়ে নেয়—ওর মার্বেলও সরায়। আর শ্যামসুন্দর বাবুর কাছে বিজয়ের কীর্তিকাহিনীর কথা দু'একটা বলে দেয়। ফলে শ্যামসুন্দরবাবুর মিঠেকড়া গাট্টাও বিজয়ের ভাগ্যে জোটে।

অবশ্য বিজয় পরে সেটা উশুল করে নেয়। কিন্তু বৌদির কাছে এসব গুহ্যতত্ত্ব প্রকাশ হতে দেখে লজ্জা—রাগ দুইই হয় বিজয়ের। বৌদি বলে না, না। ও বলবে কেন ? আমি নিজে দেখেছি।

অবশ্য বিজয় রহিমের পাউরুটি, বিস্কুট, কেক-এর হিসাব গোলমাল করে দেয়! কিন্তু সেটা যে অতীব গর্হিত কার্য তা ভাবেনি। আজ মনে হয় সেটা। বৌদি বলে।

—মানুষকে কোনদিন ঠকাবে না। বরং তাকে সাহায্য করবে বিজয়, এতে তুমিও সুখী হবে।

বিজয় কথাগুলোর মানে ঠিকমত বোঝে না। সুখী হবে কেন তাও ঠিক মনে করতে পারে না। তবু মনে হয় রহিম কেন অন্য কাউকে ঠকানোও অন্যায়। বলে সে—আর ওসব করবো না বৌদি।

কমলা বলে পড়াশোনা তো করতেই হবে, ওইটাই সব নয়। ভালো ভাবেও চলতে হবে।

বিজয় কথাগুলো ভাবে।

তবু সবকিছু গোলমাল করে দেয় তার সেজদা, বুলু-নানুর দল। বিয়ের উৎসব শেষ হয়ে গেছে। দিদি জামাইবাবুরা কুচবিহার ফিরে গেছেন, অন্য আত্মীয়রাও চলে গেছে যে যার বাড়িতে। অসিতদা এখন ভবানীপুর কাছারিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন মহলে ঘুরছে, মাঝে মাঝে বাড়িতে আসে, দু'একদিন থেকেই

আবার সেই কালো ঘোড়ায় চেপে ফিরে যায় কাছারিতে।

বিজয় সে ক'দিন দেখে বৌদিকে। অকারণে যেন গম্ভীর হয়ে উঠেছে, তার কাছে অবশ্য বৌদি অন্য মানুষ।

কমলা ক্রমশঃ এবাড়িতে এসে এবাড়ির পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে চেষ্টা করেছে। এবাড়ির কর্তা তার শ্বশুর মনোতোষবাবুকে দেখেছে। একটি নীরব কর্মী। এতবড় সংসারের সবদিকে তাঁর নজর, বাইরের ব্যবসাপত্র, জমিদারীর কাজে ব্যস্ত। সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত, তবু কমলার দিকেও নজর আছে তার।

কমলা সকালে তার চা জলখাবার নিজে নিয়ে যায়। মনোতোষবাবু শুধোন—কোন অসুবিধে হচ্ছে না তো মা?

কমলার কোন অভিযোগই নেই। মনোতোষবাবু শুধোন।

—তোমার ছাত্র কেমন পড়ছে?

কমলা বলে—ভালোই। ওকে ক্লাশ ফাইভে এবার হাইস্কুলে ভর্তি করে দিন।

অবাক হন মনোতোষবাবু!

—বলছো কি মা? হাইস্কুলে দেব এবারে? পারবে তো?

মাথা নাড়ে কমলা—হ্যাঁ। হ্যাঁ। কেন পারবে না?

মাও খুশি হয়। মহামায়া বলে।

—বৌমা যখন বলছে তখন ঠিক পারবে বিজয়। এখন তো দেখি মন দিয়ে পড়াশোনা করে।

বিজয় কিছুটা বদলেছেও।

রহিম রুটিওয়ালা অবশ্য এখন সকালে এসে বিজয়েরই খোঁজ করে।

—ছোট খোকাবাবু কোথায়?

বুলু বলে—খুব যে ভাব দেখছি রহিম চাচা।

বিজয়ই ওর রুটি বিস্কুট-এর হিসাব করে দেয়। বিজয়ের মনে পড়ে বৌদির কথা। বুলু আড়ালে বলে—দুটো কেক গড়বড় করে দে।

বিজয় জানায়—না। ওর পয়সা ঠিকমতো দিয়ে দাও।

বুলুরা খুব খুশী হতো না, কিন্তু বাধ্য হয়ে মেনে নিত।

বিজয় এখন বৌদির কাছেই পড়ছে বেশ কিছুদিন থেকে।

শ্যামসুন্দরবাবুর ওখানে পড়ার একটা আতঙ্ক ছিল। বেপটকা মানসঙ্ক নাহয় ব্যাকরণ ধরতো। আর বলতে না পারলেই চুলের মুঠি ধরে টানতো। তদুপরি মাথায় পড়তো মিঠে কড়া গাঁট্টা, মাথা ঝিমঝিম করতো। তার উপর বাইরের দুরন্তপণার খবরও পেঁাছোতো, ফলটা খুব সুখপ্রদ হতো না। পড়ার চেয়ে ওই তর্জন গর্জনই বেশী হতো।

কিছুদিন থেকে বিজয় সেই নিগ্রহ থেকে মুক্তি পেয়েছে, বেশ শান্তিতেই আছে। সকালেই জলখাবার খেয়ে বই-পত্র নিয়ে আসে বৌদির ঘরে। বৌদি ইজিচেয়ারে বসে কি সব মোটা মোটা বই পড়ে। সেই ফাঁকে বিজয়ের পড়াও হয়। অঙ্ক, ঐকিক নিয়ম, সরল ভগ্নাংশের অঙ্কও শিখে গেছে। বাংলা রচনা-ব্যাকরণও পড়ছে, ভালো লাগে ভূগোল ইতিহাস পড়তে।

বৌদি এর মধ্যে একটা গ্লোবও আনিয়েছে।

কমলা শিক্ষকের মেয়ে, নিজেও পড়াশোনায় ভালো। বাবার শিক্ষার নীতিটাকেও দেখেছে। আর নিজে এখনও পড়াশোনার চর্চা রেখেছে।

প্রাইভেটে বি-এ টা দেবার কথা ভাবছে।

এ বাড়িতে মেয়েদের শিক্ষার সীমা ওই প্রাইমারী অবধি।

তাই নোতুন বউকে এখনও পড়াশোনা করতে দেখে পিসীমা খুব খুশি হননি। মহামায়া অবশ্য এ বিষয়ে কোন কথাই বলেন নি। কিন্তু পিসীমা আড়ালে মনোতোষবাবুকে বলে—

—ঘরের বৌ সংসারের কাজ কর্ম দেখবে তা নয় বই পত্তর নিয়েই আছে দাদা।

মনোতোষবাবুও কমলার কথাটা ভেবেছেন, তার নজর সব দিকেই। ইদানীং সরসী নায়েবকেও বিভিন্ন মহলে পাঠাতে হচ্ছে। কাগজপত্রে তিনি কিছুটা সন্দেহ করছেন, আদায় পত্র ঠিকমত হচ্ছেনা। অসিত ভবানীপুর কাছারি বাড়িতেই বেশী সময় থাকছে, এবাড়িতে এলেও তাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সেই স্বাভাবিক আকর্ষণটাকেও তেমন দেখেন নি। কারণটা তিনিও জেনেছেন। অসিত ভবানীপুর গ্রামে একটা বাজে মেয়ের ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছে বেশী করে।

ব্যাপারটা এত লজ্জার যে তিনি মুখফুটে কিছু প্রকাশ করতে পারেননি। নিজেই যেন কমলার কাছে অপরাধী হয়ে পড়েছেন। আজ বোনের ওই কথাই বলেন মনোতোষবাবু—

—বৌমার কাজটা কি আছে নিরু? তোরা আছিস। ও অবসর সময়ে পড়াশোনা করছে করুক।

নিরুবালা দাদার কথাতে খুব খুশী হননি। তাই চুপ করেই রইলেন। মহামায়ার নিজস্ব কোন মতবাদই নেই। স্বামীর মতবাদকে মেনে নিয়েই তিনি নিশ্চিন্তে থাকতে চান। ফলে কমলার লেখাপড়াতে কোন বাধা হয়নি।

কমলাও সব ব্যাপারটা শুনে এবাড়ির ওই নীরব ব্যক্তিত্বকে আরও সম্ভ্রম করতে শুরু করেছে। আর পড়াশোনাতেও মন দিয়ে নিজের জীবনের একটা শূন্যতাকে ভোলার চেষ্টা করেছে। নিঃসঙ্গতাকে ভুলেছে ওই বিজয়ের সান্নিধ্যে এসে।

গ্লোবটা বিজয়ের কাছে একটা বিচিত্র বস্তু। গোলাকার বড় বস্তুটার গায়ে নীল-লাল-হলুদ ম্যাপগুলোর দিকে চেয়ে থাকে। বিরাট পৃথিবীটা যেন তার

সামনে ফুটে উঠেছে। ভারতবর্ষ, এশিয়ার কত দেশ, আরবসাগর, ভূমধ্যসাগর-ইউরোপ, জার্মানী, ইংরেজদের দেশ ইংল্যান্ড, গ্লোবের বিপরীত দিকেও রয়েছে আরও অনেক দেশ। আমেরিকা, দক্ষিণ-আমেরিকা—

কমলা বলে, আমাদের এখানে যখন দিন তখন ওখানের মানুষ ঘুমোয়, রাত্রি বেলা। ওখানে যখন দিন ওরা কাজ করে, আমাদের তখন রাত্রি।

অবাক হয় বিজয়, সেকি!

হাসে কমলা—হ্যাঁ। ভূগোল পড়লে সব বুঝবে।

অবশ্য এর মধ্যে বিজয় ভূগোলও পড়তে সুরু করেছে, বিচিত্র কত দেশের নামও শুনেছে। তার শিশুমনের কল্পনায় সেইসব দেশের বিচিত্র ছবি ফুটে ওঠে, বিজয় বলে।

—একদিন ওইসব দেশে যাবো বৌদি। হাডসন নদী, টেমস্-রাইন, জার্মানী, ইটালী-লন্ডন-আমেরিকা দেখবো।

কমলা দেখছে ওকে, বলে সে।

—তার জন্য মনদিয়ে লেখাপড়া করতে হবে বিজু। ইংরাজী শিখতে হবে খুব ভাল করে।

বিজয় বলে—কোথায় শিখবো?

হাসে কমলা। ওর দুচোখে কৌতুকের হাসি। বললে সে।

—ছাই শিখবে? এখনও তো এ-বি-সি-ডিই ভালো করে শিখলে না। গাঁইয়া নিরক্ষরই হয়ে রইলে।

নিরক্ষর কথাটার মানে জানে বিজয়। ওটা শুনে তাই চটে উঠে সে। বলে বিজয়, খবরদার ওসব কথা বলবে না। ইংরাজী শিখবোই—দেখে নিও তুমি।

কমলা দেখেছে রুখে ওঠা ছেলেটাকে, ওর মনের অতলের সুপ্ত সত্বাকেই যেন জাগিয়ে দিতে চায় সে, তাই ওকে ওই কথা বলতে দেখে কমলা বলে ওঠে পরিহাস তরল সুরে—তাই নাকি? তাহলে সেদিন আর নিরক্ষর নিশ্চয়ই বলবো না।

ক্ষেত্র সরকার এবাড়ির একরকম ম্যানেজ্যারই।

সরসীবাবু বাইরের জমিদারীর কাজ, আদলত, মামলাপত্র নিয়ে থাকে। ক্ষেত্র সরকার থাকে এই সংসারের ব্যাপারে। রোজকার সংসার খর্চা—বাজার হাট, এ বাড়ির কার কি দরকার, জামা-কাপড় অন্য কিছু এসবের ভার তার উপর। নীচের কাছারি বাড়ির একটা ঘরে তার সেরেস্তা। ছোট তক্তপোষ, একটা হাতবাক্স নিয়ে বসে চোখে নিকেলের ফ্রেমের চশমটা এঁটে হিসাব দেখছে। হঠাৎ বিজয়কে ঢুকতে দেখে চাইল সে।

—কি ব্যাপার ছোট খোকা?

বিজয় এর মধ্যে খবর নিয়েছে সেজদার কাছে। স্টেশনের কাছে কয়েকটা বই

এর দোকান আছে। ওরা কলকাতা থেকে বইপত্র এনে বিক্রী করে, বিজয় বলে—ইংরাজী বই কিনতে হবে, আটআনা পয়সা চাই।

ক্ষেত্র সরকার দেখছে ওকে চশমার ফাঁক দিয়ে।

আটআনা পয়সা ওর হাতে দেবে কিনা ভাবছে, কারণ, বিজয়কে সেও সমীহ করে। শেষ অবধি ক্ষেত্র সরকার বলে।

—ঠিক আছে। বাজারে যাচ্ছি, চলো। কি বই কিনতে হয় কিনবে। ইংরাজীর ব্যাপারে ক্ষেত্র সরকারের জ্ঞানও অতীব সীমিত, তাই এই ভাবেই ব্যাপারটাকে সামাল দেয় সে।

বিজয় রং চং এ বইটিকে দেখেছে, বড় বড় অক্ষরে এ-বি-সি-ডি লেখা আছে। ছবি টবিও রয়েছে। এতদিন বাংলা-অংক এইসবই পড়েছে, বিচিত্র এই ভাষা একটা অন্য জাতের পৃথিবী ছড়ানো ভাষাকে সে ঠিকমত চেনেনি। গ্লোবের দেখা বিরাট পৃথিবীর কত দেশের কথা মনে পড়ে, বইখানা হাতে পেয়ে বিজয় আজ খুবই খুশি হয়েছে।

বাড়ি ফিরে নীচের ঘরে শ্লেট পেন্সিল নিয়ে বসে গেছে, বৌদির কাছে আজ সে তার নিজের বুদ্ধির পরিচয় দিতে চায়। বারবার লিখছে অক্ষরগুলো। এর মধ্যে বার বার পড়ে মুখস্থ করার চেষ্টাও করছে, বুলু-নানু এসে ওকে দেখে অবাক হয়।

—কি করছিস রে? খেলতে যাবি না?

বাইরে ওদের মাঠেই পাড়ার ছেলেরা খেলতে আসে। বিজয়ের আজ সময় নেই। বলে সে—তোরা যা, আমি আসছি।

বুলু অবাক হয়। মুখে কিছু না বললেও ওরা যে খুশি হয়নি সেটা বোঝা যায়। বিজয়ের ওসব দেখার, ভাবার সময় নেই। ও এখন ইংরাজী নিয়ে পড়েছে। যে ভাবে হোক আজই বেশ কিছুটা এগোতে হবে ওকে, বৌদির কাছে সে একটা চমকই আনবে।

কমলার কাছে এখানের জীবন তেমন কোন আকর্ষণ আনতে পারে নি। এত প্রাচুর্য এ সংসারে। শ্বশুরকেও দেখেছে, শান্ত স্থিতধী একটি হৃদয়বান মানুষ, শাশুড়ী নামক বস্তুটি বৌদের পক্ষে অনেক সময় আতঙ্কের বস্তু হয়ে ওঠে। কিন্তু কমলার শাশুড়ী তার সম্পূর্ণ বিপরীতই।

কিন্তু শ্বাশুড়ির সম্পর্ক যে স্বামীকে নিয়ে সেই স্বামী দেবতাকেই ঠিক বুঝতে পারেনি কমলা। তার জীবনে অসিতের তেমন কোন ঠাঁই নেই। অসিতই তাকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। আর কমলা নিজেকে তাই এখানে অবাঞ্ছিত, অপমানিতই বোধ করে।

বরং দু'একটা কথাও কানে এসেছে। এসব খবর গোপন থাকেনা, হাওয়ায় ভর করে উড়ে যায়। ভবানীপুরের কাছারি বাড়িতে নাকি একটি মেয়ের সঙ্গেই

অসিত জড়িত।

কমলা এমনিতেই চাপা স্বভাবের মেয়ে, তবু এই অবহেলা অপমানকে সে চুপ করে মেনে নেবে না। যদি এমনিই কোন ব্যাপার থাকে তবে তাকে কেন বিয়ে করে এনেছিল এর জবাব সে অসিতের কাছেই চাইবে। কমলার জীবনের সব স্বপ্নকে ব্যর্থ করে দেবার কোন অধিকার অসিতের নেই।

কমলা মনে মনে এই ব্যবহারের যোগ্য প্রতিবাদ করার জন্যও তৈরী হচ্ছে। তাই পড়া শোনা সুরু করেছে। বি-এ পরীক্ষাটা দিয়ে সে প্রয়োজন হলে স্বামীর দয়া ভিক্ষা না করেই স্বাধীন ভাবে বাঁচবে।

…এটা কমলার মনের অতলের কথা!

বাইরে তার স্বভাবজাত সহজ ভাবটুকুকে বজায় রেখেছে সে। সকালে মনোতোষবাবুর ঘরে চা পেঁছে দেয়, সকলের সঙ্গে নীচের খাবার ঘরে চা জল-খাবার খেয়ে দুচারটা কথা বলে নিজের ঘরে এসে ঢোকে, বই পত্র নিয়ে বসে।

কমলা আজ ঘরে ঢুকেই বিজয়কে দেখে চাইল।

বিজয় এ সময় পড়তে আসে। তাকে স্কুলে ভর্ত্তির কথা চলছে, তাই বিজয় এখন পড়াশোনাও করছে।

কমলা আসতে বিজয় শ্লেটটা দেখিয়ে বলে।

—এই দ্যাখো এ-বি-সি ডি একেবারে জেড অবধি লিখেছি। আর কোনটা কোন অক্ষর শুধোও, বলে দেব।

নিজেই দুচারটে অক্ষর দেখিয়ে বলে যেতে থাকে।

কমলা ছেলেটির জেদ দেখে অবাক হয়। খুশিও হয়েছে সে।

এ বাড়ির এই একটি ছেলেই তার জীবনের অনেক শূন্যতাকে ভুলিয়েছে!

কমলা বলে—বাঃ। তাহলে তো আর 'নিরক্ষর' বলা যাবে না তোমাকে। একদিনেই শিখলে এসব?

বিজয় নোতুন বইটা বের করে বলে।

—কাল কিনে এনে নিজেই লেগে গেলাম। এখনও সব ঠিক হয় নি। দু চারদিনে সব ঠিক হয়ে যাবে দেখুন।

কমলা ওকে কাছে টেনে নিয়ে বলে।

—জীবনে এই জেদটাকে বজায় রেখো বিজু; ভালো কিছু করার, জেতার জেদ। দেখবে ঠিক তুমি বড় হবে। হয়তো সেদিন আমি কাছে থাকবো না। তবু যেখানেই থাকি খবর পাবো, খুশী হবো।

বিজয়ের মনে হাসিখুশি বৌদির এই বেদনার সুর মেশানো কথা-গুলো কি বিচিত্র সাড়া আনে। বিজয় কোন দিনই ভাবতে পারে না যে বৌদি চলে যাবে কোন দিন তার জীবন থেকে, এ বাড়ি থেকে। বৌদির উপর সব দাবীটুকু এখানে তারই। তাই বিজয় ওকে হারাতে চায় না।

দ্‌টো হাত দিয়ে বিজয় বৌদিকে জড়িয়ে ধরে বলে—না। তোমাকে কোথাও যেতে দেব না বৌদি-না-না। তুমি যাবেনা!

বৌদি ওকে কাছে টেনে নিয়ে ওর চুলগুলোয় বিলি কাটতে কাটতে বলে। পাগল ছেলে কোথাকার। নাও, পড়তে বসো।

বিজয় পড়তে বসে, তবু তার ভয় যেন যায় না। চুপিচুপি শুধোয়।

—তুমি কোনদিনই কোথাও চলে যাবে না তো?

বিজয়ের ডাগর চোখ দুটো কি দুঃসহ বেদনায় কল্পনায় টলটলে হয়ে ওঠে। কমলা বলে।

—স্কুলের পরীক্ষা দিতে হবে। পড়াশোনা করো তো!

সহরের সবচেয়ে ভালো স্কুলের নাম হরি মোহন ইনষ্টিটিউশন, হাই স্কুল। এতদিন বিজয় বাড়িতেই পড়াশোনা করেছে। তাই হাইস্কুলে যাবার আগে নোতুন গড়ে ওঠা মাইনর স্কুলেই ভর্ত্তির ব্যবস্থা হয়ে গেল। এখানে দু' একবছর পড়ে হাইস্কুলে যেতে হবে।

নোতুন স্কুলে যাবার জন্য পোষাক পত্রের দরকার।

বিজয়দের বিরাট পরিবার। এ বাড়ির রেওয়াজ ছিল পুজোর আগে সকলের জন্য নোতুন জামা কাপড় আসবে, আবার আসবে কিছু শীতের মুখে। আর আসবে বৈশাখ মাসের আগেই। এই সময় ক্ষেত্র সরকারের কাজও বেড়ে যেতো। দোকান থেকে কাপড় চোপড় আনানো, বিশেষ করে ছেলেদের ব্যাপারে অনেক সমস্যাই দেখা দিতো। তার জন্য ক্ষেত্র সরকার হঠাৎ পরিদর্শন সুরু করতো।

—সবাই জামা প্যান্ট জুতো পরে এসো। চটপট!

বুলু-মেজদা-নানু-নিতু-আপুদের দেরী হতোনা তৈরী হতে। কিন্তু গোল বাধতো বিজয়ের বেলাতেই। প্যান্ট জামা পরেছে, কিন্তু জুতো পরার উপায় নেই। ওটা ছিড়ে গেছে।

ছেলেদের পোষাক জুতো ইনস্‌পেকশন করে ক্ষেত্র সরকার বলতো—জুতো তোদের তো ঠিকই আছে। বিজয়েরটা ছিড়ে গেছে। ওর জুতোর দরকার।

বিজয়ই নোতুন জুতো পেতো সেবার। বাকীসকলের পায়ে সেই বাটা কোম্পানীর অজয় অমর গোবদা-নটি বয় জুতোই থেকে যেতো। ও জুতো ছেঁড়ে না ক'বছরে, কিন্তু বিজয়েরটা বছর বছরই ছিঁড়ে যেতো।

ক্ষেত্র সরকারও কি যেন সন্দেহ করে। কিন্তু করার কিছুই নেই।

এতদিন বাড়িতেই থাকতো, এবার বাইরে স্কুলে যেতে হবে। তাই বিজয়ের পোষাকের দরকার। বিজয়ও জেনেছে সেটা। তার জুতো চাই মচমচে, প্রতি পদক্ষেপে মশ্‌ মশ্‌ শব্দ করে জানান দেবে তার অস্তিত্বের কথা। কিন্তু এবারের জুতোটা তা নয়।

তাই নোতুন জুতোর দরকার। ব্যবস্থাও করে ফেলেছে বিজয়।

সে বলে—ক্ষেত্রদা, জুতোও কিনতে হবে।

অবাক হয় ক্ষেত্র সরকার—সেকি রে? পুজোর সময় কেনা হ'ল! বিজয় জুতো দুটো এনে দেখায়—ছিঁড়ে গেছে।

ক্ষেত্র সরকারের কাছে এবার রহস্যটা পরিষ্কার হয়। জুতোর গোড়ালির কাছে ব্লেড দিয়ে কাটা, একেবারে দুফালা করা হয়েছে। ক্ষেত্র সরকার বলে। —কেটেছিস' বল! দেখাচ্ছি এবার। এই করা হয়েছে এতদিন?

বিজয় হাতে নাতে ধরা পড়ে গিয়েছে।

ক্ষেত্র সরকার বিবেচক লোক। বলে—আর এসব করবিনা। চল—

...বাজারের আশপাশে চারিদিকে অধিকাংশ বাড়িই মনোতোষবাবুর। বিভিন্ন দোকানদারগণ এদের ভাড়াটে। তাদের ভাড়াটে ইসমাইল-এর দোকানে নোতুন জুতোও কেনা হ'ল।

গোল বাধে আবার ক্ষুদু দর্জ্জির দোকানে। ক্ষেত্র সরকার বিজয়কে ওখানে জামার মাপ দিয়ে যেতে বলে নিজের কাজে চলে যায়। খুদ্দু মিঞা এই বাড়ির বাঁধা দর্জি। সব কাজই সে করে ওদের বাড়ির।

ছেলেদের জামা প্যান্ট-এর ধরণ কি হবে তা জানে সে। মনোতোষবাবুর কড়া নির্দেশ ছিল ছেলেদের জামার সাইড পকেট হবেনা। ওসব বিলাসিতার লক্ষণ।

কিন্তু বিজয়ের সাইড পকেট চাইই। লাট্টু-মার্বেল রাখার, কিছু পয়সাপত্র রাখারও অসুবিধা হয় না হলে। তাই বলে সে।

—সাইডপকেটও চাই খুদু ভাই!

চমকে ওঠে খুদু—সেকি! কর্ত্তাবাবুর হুকুম, ওসব হবেনা।

বিজয়ও জেদ ধরে—ওসব জানি না, আমার পকেট করে দিতে হবে।

খুদু চেনে কর্তাবাবুকে। এদিকে বিজয়কেও চেনে। বলে সে।

—কর্ত্তাবাবু জানতে পারলে তোমাকেও মারবেন, আমার ও সব কাজ চলে যাবে, দোকান পত্র তুলে দেবেন।

বিজয়-এর জেদ চেপে যায়। বলে সে।

—না দিলে তোমার দাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেব।

—এ্যাঁ! চমকে ওঠে খুদু দর্জি। তার দাড়িটা দেখার মত। বহু যত্নে ওটাকে সে শ্বেত শুভ্র সুন্দর করে রেখেছে। এ হেন সম্পদ হারাবার কল্পনা করে চমকে ওঠে সে। ও ছেলেকে বিশ্বাস নেই। মাঝে মাঝে খুদু অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ে ক্লান্ত দুপুরে দোকানের মাদুরেই। সেই সময় কাঁচি দিয়ে যদি ওটা কেটে কুটেও দেয় বিপদ হয়ে যাবে। অগত্যা খুদু বলে—ঠিক আছে! পকেট করে দেব। কিন্তু বাড়িতে যেন জানতে না পারে। খুব হুশিয়ার!

বিজয় খুশী হয় পকেট-এর অধিকারী হয়।

হঠাৎ এবাড়ির ঝি মানদাকে কিছু কাপড় নিয়ে আসতে দেখে সরে গেল বিজয়। বাড়ির মেয়েদের জামার অর্ডার ও এনেছে বোধ হয়। ওকে এসব খবর জানানো মোটেই নিরাপদ নয়।

নোতুন স্কুলে যাবার স্বপ্ন দেখছে বিজয়।

বৌদির ডাকে চাইল। হাসিখুশি বৌদি বদলে গেছে।

ও শুধায় – সে ক্ষুদু মিঞাকে কি বলেছো?

এই কণ্ঠস্বর বিজয়ের কাছে নোতুন বোধ হয়। বিজয় আমতা আমতা করে। মনে হয় খুদু মিঞা ঠিক বিশ্বাসঘাতকতাই করেছে। বৌদির কানে কথা তুলেছে মানদাকে দিয়ে। কমলা বলে—

—বয়স্ক প্রবীন লোক, ওর দাড়ি নিয়ে খবরদার আর কোন কথা বলবে না। সম্মান দিয়ে চলবে। মনে থাকবে?

বিজয়-এর প্রতিবাদ করার সাধ্য নেই। বেশ বুঝেছে তার বিচিত্র দুষ্টুমির সব খবরই বৌদির কানে উঠবে। বিজয় মাথা নাড়ে।

তবে কথাটা আর এগোয় নি।

অবশ্য খুদু মিঞা সব জামার পাশ পকেট বানায় নি। একখানা জামার পাশ পকেট তৈরী করে তার কথা রেখেছিল।

নোতুন স্কুলে এসেছে বিজয়।

অনেক সমবয়সী ছেলেও রয়েছে। তাদের পাড়ার ওদিকে থাকে মলয়, বাজার পাড়ার আশীষ, ওর মেজদির দেওর নীপু আরও অনেক ছেলেকেই দেখে এখানে।

মাষ্টার মশাইদের ভারিগলা-গম্ভীর মুখ দেখে একটু চুপ করে যায়। পড়া সুরু হয়। ঘণ্টা বাজে প্রতি পিরিয়ডে। শেষ পিরিয়ডের ঘণ্টার সুরটা খুব মিষ্টি লাগে বিজয়ের। মুক্তির আভাষ আনে। তখন শীতের রোদ সোনালী রং নিয়ে গাছ গাছালির বুকে ছড়িয়ে পড়েছে।

বিজয় নোতুন মন নিয়ে স্কুল থেকে ফিরছে।

কমলার ওর শূন্য জীবনে ওই ছেলেটাই সব ঠাঁইটুকু দখল করে রেখেছে। নিজের পড়াশোনার পরও অনেক সময় থাকে, অসিতও ক'দিন আগেই এসেছিল। সেও ফিরে গেছে কাছারি বাড়িতে। সেখানে নাকি জরুরী কাজ আছে।

কমলা বলে—না গেলেই নয়? সব সময়ই তো বাইরে বাইরে থাকো।

কমলাও যেন ওকে কি বলতে চায়।

কারণ কমলা ও অসিতের বাইরে থাকা নিয়ে পিসীমা-মেজ ননদের মধ্যে আলোচনার দু' একটা কথা শুনেছে। দুপুরে মহামায়ার ঘরে ওদের এমন বৈঠক বসে। কমলাকে সেখানে গীতা-মহাভারত—রামায়ণ পড়ার জন্য যেতে

হয় মাঝে মাঝে।

সেদিন ওদের ঘরে ঢুকতে গিয়ে কমলা বাইরে থমকে দাঁড়ালো। পিসীমাই অনুযোগ করে মহামায়াকে।

—তুমিও কিছু বল বৌ নোতুন বউমাকে। দিনরাত পড়াশোনা নিয়ে থাকলেই হবে? দাদাকে বলেছিলাম, সেতো কান দেয়নি। বলে বউমা পড়তে চায় পড়ুক।

এদিকে অসিতও ওইসব দেখে বোধ হয় বাইরে বাইরেই রইল। স্বামী-স্ত্রী বলে কথা। বৌমার কি দায়িত্ব নেই ছেলেটাকে ঘর মুখো করার?

মহামায়াও দেখেছে ব্যাপারটা। সে ভেবেছিল বিয়ের পর অসিত বদলাবে। তার দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হবে। কিন্তু তা হয় নি।

ভবানীপুরের ব্যাপারটাও কানে আসে। কি এক আকর্ষণে অসিত ঘরের লক্ষীকেও অবহেলা করে চলেছে।

পিসীমার কথায় মহামায়া বলে।

— আমি কি বলবো ভাই? ওদের নিজেদের ব্যাপার—

পিসীমা অবাক হয়—নাও কথা! বউ এর কোন কর্তব্য নাই? ব্যাটা-ছেলেকে ঘরবাসী করার দায়িত্ব তো তারই। সে ভাববে না কথাটা? আমার বাবু ঐই লেখাপড়া শেখা বিবিয়ানা ভালো ঠেকছে না। তুমি বলো ওকে!

কমলা বাইরে থেকে কথাগুলো শুনে চমকে উঠেছে।

তাকে কেন্দ্র করে এই বড় বাড়ির অতলে যে একটা নীরব বিক্ষোভ দানা বাঁধছে এটা সে অনুভব করেছে আজ।

কমলা ভিতরে যেতে পারে না। সরে এসেছে নিজের ঘরে।

কি নীরব বেদনায়, ব্যর্থতার জ্বালায় তার সারা মন গুমরে ওঠে। মনে হয় এ বাড়ির বিষয় বৈভব তাকে কোন শান্তি দিতে পারে নি। এখানে সে এদের দয়ায় রয়েছে। যে সংসারে স্বামীকে সে পায়নি, সে সংসার তার কাছে অর্থহীন, শূন্য বলেই বোধ হয়।

তবু চেষ্টার ত্রুটি সে করে নি।

তাই অসিতকেও বলার চেষ্টা করেছে কমলা।

—তুমি বাইরে বাইরে থাক আমার উপর অভিমান করেই। জানিনা কি দোষ করেছি আমি।

অসিত ওসব আবেদন নিবেদনের, আকুতি মিনতির কোন ধার ধারে না। তার কাছে তাৎক্ষণিক পাওয়াই বড়। বলে সে।

—কেন? দোষ আবার কি করলে?

কমলা বলে-তবে কেন বাড়িতে থাকো না? যদি ভবানীপুরেই থাকবে তাহলে আমাকেও সেখানে নিয়ে চলো। এখানে একা একা থাকতে আমার ভালো

লাগে না।

অবাক হয় অসিত। কিছু বিপন্নও বোধ করে। ওর মনে হয় তার ভবানীপুর কাছারির অন্ধকার জীবনের ব্যাপারটা বোধ হয় জেনে ফেলেছে কমলা।

সেটাকে এড়াবার জন্য অসিত বলে।

—ওসব সম্ভব নয়। এ বাড়ির বৌ যাবে ওই কাছারি বাড়িতে?

কমলা চাইল ওর দিকে।

অসিত বলে—ঠিক আছে। জরুরী আদায় উশুলের কাজ সেরে এবার আসবো।

কমলা চুপ করে যায়। সে খুশি হতে পারেনি অসিতের কথায়। ওকে বোঝাতে পারে না কমলা যে তার এই খেয়ালের জন্য কমলাকেও দোষী সাব্যস্ত করেছে এবাড়ির কিছু মানুষ। জেদী মেয়েটি পরাজিত হয়ে চুপ করেই রইল।

বিজয়ও দেখেছে বৌদিকে।

মাঝে মাঝে মনে হয় বৌদি কি গভীর চিন্তায় ডুবে যায়। ওর হাসি মুছে গেছে। ও যেন ভাবনার কোন দূর আকাশে হারিয়ে গেছে।

—বৌদি!

স্কুল থেকে ফিরেছে বিজয়। আজ তার অনেক কথাই রয়েছে জানাবার মত। কিন্তু বৌদিকে উদাস বিষণ্ণ দেখে অবাক হয়েছে সে।

দেখেছিল ও বেলায় দাদাকে। দাদা কদিন পর বাড়ি এলে বৌদি খুশী হয়ে ওঠে।

আজও দেখেছিল সেই হাসি খুশি ভাবটা।

কিন্তু দাদা চলে গেছে। ঘোড়াটাও নেই। বিজয়ও ভেবেছে কথাটা।

বড়দা বাড়িতে থাকলেই পারে। তা নয় আসবে আর চলে যাবে। কমলা চাইল ওর দিকে।

বিজয়কে দেখে মনের বেদনাটাকে চেপে রেখে চাইল। বিজয় বলে।

—এত কি ভাবছিলে বৌদি?

কমলার সব দৈন্য যেন ওই ছেলেটার সামনে ফুটে উঠেছে।

এ সে চায় না। কমলা ব্যাপারটাকে সহজ করার জন্য বলে:

—কই! কি আবার ভাববো?

বিজয়-এর চোখে পড়েছে বৌদির বেদনার অশ্রুর আভাষ। বিজয়ের সারামন কি বেদনায় গুমরে ওঠে। সেও শুনেছে দু'একটা কথা।

বলে সে—বড়দা চলে যায় শুধু শুধু—এবার আসুক বড়দা। ওর কালো ঘোড়াটার ঠ্যাং খোঁড়া করে দেব। যাতে আর যেতে না পারে!

চমকে ওঠে কমলা ওর কথায়।

বলে সে, না—খবরদার ওসব করবে না! কেন করবে?

বিজয়-এর মুখচোখ কঠিন হয়ে উঠে। সে বলে

—তোমাকে দুঃখ-কষ্ট কেউ দিলে আমি তাকে ছাড়বো না বৌদি।

কমলা ছোট ছেলেটাকে কাছে টেনে নেয়। কি নীরব তৃপ্তিতে ওর মন ভরে ওঠে। কোথায় ওই ছোট্ট ছেলেটার প্রতিবাদে যেন আজ কমলাও কি আশ্বাস পায়। সে বলে

—আমাকে কষ্ট কে দেবে বিজু? তুই কতো ভালোবাসিস। আমার কোন দুঃখ কষ্ট নেই রে! খবরদার ওসব করবি না। তাহলেই কষ্ট পাবো।

বিজয় দেখছে ওকে।

দুটি মন আজ নিজেদের মধ্যে যেন নীরব একটি তৃপ্তির জগৎ গড়ে নিয়েছে।

ওই প্রসঙ্গ এড়াবার জন্য কমলা বলে—স্কুলে কি হল বলো। হোম টাস্ক কি কি দিয়েছে?

বিজয় এবার নিজের জগতে ফিরে আসে। খাতাপত্র বের করে বলে—এই যে! অংক ইংরাজী ওয়ার্ড বুক-এর টাস্ক বাংলা রচনা সব দিয়েছে।

কমলা বলে—ওসব করে নেবে, তারপর খেলতে যাবে। তোমার দুধ খাবার আনছি। খেয়ে দেয়ে ওসব শেষ করতে হবে।

বৈকালের মিষ্টি আলো নামছে আমবাগান-এর সীমায়, মহানন্দার বালুচরে, ছেলেদের খেলা সুরু হয়েছে। নদীর বুকে পাল তুলে নৌকা বয়ে যায়।

বিজয়-এর মন বাসনা, তবু বৌদির সামনে এলে সে ওই বাইরের জগতের সব আকর্ষণ ভুলে যায়। মনদিয়ে পড়ছে' টাস্ক শেষ করে এবার দৌড়লো মাঠের দিকে।

তখন সেজদা, বুলু, নিতু-নানু পাড়ার অনেক ছেলেরাও জুটেছে।

বুলু বলে এতক্ষণ কি করছিলিরে বিজু?

নানু বলে—ও গুডবয় কিনা তাই পড়াশোনা করছিল। মলয়ও এসেছে খেলার মাঠে। তার কথাবার্তা একটু বিচিত্র। বলে সে—ও ব্যাটা সাহেব হবে তাই ইংরাজী পড়ছিল। বি এ টি-ব্যাট, সি-এ টি-ক্যাট—

হাসছে ওরা। বিজয় চুপ করে যায়।

সেজদা এবার ক্লাস নাইনে পড়ছে, সামনের বছর ম্যাট্রিক দেবে! সে বলে বেশী পড়লে মাথা খারাপ হয়ে যায় রে।

মলয় বলে—তাই তো বেশী পড়িনা, নে সুরু কর খেলা।

খেলা সুরু হয়, বিজয়ও মনের জ্বালা চেপে ওদের সঙ্গে খেলায় মেতে ওঠে। তবু বুলু-নানুর কথাগুলো তার ভালো লাগেনা!

সন্ধ্যা বেলায় শ্যামসুন্দরবাবু সেজদাকে নিয়ে বসেন ও ঘরে। এ পাশের ঘরে বাকী ছেলেরা বসে বই খাতা নিয়ে। তখন সারাদিনের ক্লান্তির পর ওদের চোখে ঘুম নামে। মাঝে মাঝে শ্যামসুন্দরবাবুর গাঁট্টাও পড়ে, ঘুম ছুটে গিয়ে আবার পড়া শুরু করে। টাস্কও সব হয় না। কিন্তু বিজয়ের টাস্ক তখন সব হয়ে গেছে।

...কটা মাস কোন দিকে কেটে যায়।

শীতশেষে আমের বোলের মিষ্টি সুবাস বাতাস মো মো করে। মালদহ অঞ্চলের আম বিখ্যাত। সারা মুলুক জুড়ে আমের বাগান।

রুপালী বালুচরে গ্রীষ্মের দাবদাহ নামে, কাচধার মহানন্দার জলে তখন ছেলেদের সাঁতারের পালা জমে ওঠে। বৈকালে আকাশ কালো করে আসে কালবৈশাখীর মেঘ। সারা আকাশ বাতাসে ওঠে ঝড়ের গর্জন।

বিজয়-এর দিনগুলো নানা বৈচিত্র্যের মধ্যেই কেটে যায়। আসে বর্ষার সমারোহ, আকাশ ছেয়ে ধূসর পাংশু মেঘের আনাগোনা। বৃষ্টি নামে।

মহানন্দার বুকে নামে হিমালয়ের গেরুয়াঢল। সেই জলসীমা ওপারে নদীর বালুচর ছাপিয়ে চলে যায় দূর দিগন্ত অবধি। পাটক্ষেত, গ্রামসীমা গুলোকে মনে হয় ভাসমান এক একটি দ্বীপ।

এ সময় অসিতদার কাজও বেশী পড়ে।

নিজেদের জমি জায়গা দূর দূরান্তে নানা দিকে ছড়ানো। তার চাষ আবাদ-এর ব্যবস্থা করতে হয়। আর বহু পাটও হয়। সেসব তোলা—গুদামজাত করাতে হয়।

তাই বাড়ি এলেও থাকার সময় তার নেই।

বিজয় চুপ করে দেখে ব্যাপারটা। মনে মনে সে ঘোড়াটাকে আক্রমণ করার ব্যবস্থাই করেছিল, কিন্তু ঘোড়াটাকে এখন আনা হয় না। দাদা নৌকাতেই যাতায়াত করে।

বর্ষার মেঘভার কেটে গিয়ে শরৎ এসেছে।

বালুচরের জলও নেমে গেছে, এখন সেখানে এসেছে কাশফুলের শ্বেত শুভ্রতা। পুজোর আভাষ জাগে শেষ রাতের বাতাস শিউলির মিষ্টি গন্ধে অস্থির হয়ে ওঠে।

বাড়ির বাগানে সবুজ ঘাসের উপর শিশির ভিজে শিউলি ছড়িয়ে পড়ে। বৌদিও ওঠে ভোরে, বিজয় আর সে তখন শিউলি কুড়াতে ব্যস্ত।

...ফাইন্যাল পরীক্ষা এসে গেছে। দিনগুলো যেন হাওয়ায় ভেসে যায়, সাদা পুঞ্জ মেঘের মত। বৌদিও বিজয়কে নিয়ে পড়েছে। ইংরাজী-অঙ্ক বাংলা-ইতিহাস ভুগোল সবই পড়ায়।

মনোতোষবাবুও দেখছেন বিজয়কে।

এবার পরীক্ষায় সকলকে সচকিত করেছে বিজয়।

স্কুলের রেজাল্ট বের হয়। মার্কসিট নিয়ে এসেছে ওরা। বুলু এবার ফেল্ করেছে, নানু কোন মতে পাশ করেছে। নিতুও একটা সাবজেক্টে ফেল করেছে, সেজদা এবার ক্লাশ টেনে উঠেছে।

পিসীমা তার ছেলে বুলুকে ফেল করতে দেখে মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়েছে। তার নিজের ছেলের উপর কিছুটা আশা ভরসা ছিল, কিন্তু বুলু তার কিছুটাও পূরণ করতে পারে না।

কমলা পথচেয়ে ছিল বিজয়ের। স্কুল থেকে ফিরে এসে বিজয় সোজা বৌদির কাছে এসে প্রণাম করে।

—কি ব্যাপার? কমলাও অবাক হয়।

বিজয় মার্কসিটটা হাতে দিয়ে বলে ফার্স্ট হয়েছি বউদি।

কমলার সব দুঃখ যেন মুছে যায়, মন থেকে। বিজয়কে কাছে টেনে নিয়ে ওর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলে—

—এইটুকুতে খুশী হলে চলবে না বিজু। তোমাকে আরও অনেক বড় হতে হবে। সারা দেশের লোক তোমাকে জানবে, চিনবে, তবেই আমি খুশি হবো।

বিজয়ের চোখে জল নামে। আনন্দের অশ্রু, বৌদিকে সে খুশী করবেই।

বলে বিজয়—তোমাকে খুশী করার জন্য আমি সব করবো বৌদি।

কমলা হাসে—পাগল ছেলে, যাও বাবার ঘরে গিয়ে প্রণাম করোগে ওঁকে।

মনোতোষ বাবুর ঘরে তখন সারবন্দী অপরাধীর মত দাঁড়িয়ে আছে বুলু নানু-নিতু-সেজদা অবধি। মনোতোষ বাবু ওদের মার্কসিটগুলো দেখছেন গম্ভীর মুখে। পিসীমাও রয়েছেন। বিজয় ঘরে ঢুকে প্রণাম করে মার্কসিটটা হাতে দেয় ওঁর। পিসীমার মেজাজ বেড়েই ছিল, সে বলে-তুই আবার ফেল করে এলি নাকি? মাথায় কি পোকা আছে তোদের? গোবর?

মনোতোষবাবুর গম্ভীর মুখে নীরব খুশির আভাষ জাগে। বলেন তিনি বিজয়কে—গুড। বরাবর এমনি রেজাল্ট করতে হবে। জানান ওদের—বিজু, ফাস্ট হয়েছে নিরু।

পিসীমার মুখটা বোদা হয়ে যায়। নিজের ছেলের জন্য এবার সত্যিই ভাবনাটা বাড়ে। পিসীমা ওই আনন্দের খবরে নীরস কণ্ঠে বলেন—অ' তাই নাকি। তা ভালো। আমারই পোড়া বরাত।

পিসীমা ক্ষুন্ন হয়েই বের হয়ে গেলেন।

মনোতোষবাবু দেখছেন বিজয়কে। বুদ্ধিদীপ্ত চাহনি—ছেলেটা আজ তার মনের আশাকে হয়তো পূর্ণ করতে পারবে।

নিজে নানা কারণে পড়াশোনা করতে পারেননি, অর্থ উপার্জনের কাযেই নামতে হয়েছিল। আজ অর্থ—সম্পদ সবই পেয়েছেন। কিন্তু বিদ্যার গৌরবটা পাননি।

তাই ছেলেদের পড়াতে চেয়েছিলেন। কিন্তু অসিত পড়াশোনা করলো না। আজ একটা কঠিন সমস্যার সৃষ্টি করেছে সে। মেজছেলে কলকাতায় পড়ছে, মোটামুটি ধরনের ছাত্রই। সেজছেলেরও বিশেষ ভলোছাত্র নয়। তবু তাকে পড়াবেন।

কিন্তু বিজয়ের এই ফার্স্ট হওয়ায় আজ মনোতোষবাবু নোতুন একটি স্বপ্ন দেখেন। ও স্কলারশিপ্ পাবে, বিজয়কে তিনি ডাক্তারী পড়াবেন। অর্থের অভাব তার নেই। ওকে বিদেশ পাঠাবেন আর ও উচ্চতর শিক্ষার জন্য। বংশের একটা ছেলেকে তিনি আদর্শ করে গড়ে তুলবেন।

কিন্তু মনোতোষবাবু গম্ভীর প্রকৃতির লোক। তা'র স্নেহের ধারা ফল্গুর মত অন্তঃসলিলা, বাইরে তার কোন প্রকাশ থাকে না। ওটা তিনি নিজের মনেই রেখে দেন সঙ্গোপনে। মুখে বলেন।

—এবার আরও মন দিয়ে পড়াশোনা করো বিজু।

বিজুও ঘাড় নাড়ে।

বুলু, নিতু-নানুরা ক্ষুব্ধ হয়েই ছিল। বিজয় হঠাৎ ফার্স্ট হয়ে তাদের নিদারুণ ভাবে অপমান করেছে, মা-মামীমা মামাবাবুর কাছেও তারা আজ অপমানিত হয়েছে, শ্যামসুন্দর বাবুও বলেন।

—শাখামৃগ, গণ্ডমূর্খের দল। পড়াশোনা করতে কি হয়? বিজুকে দ্যাখ—

দু-চারটে গাঁট্টা-চড় ইত্যাদিও জুটেছিল। সেই অপমানটা তারা ভোলেনি। তাই বিজয়কে খেলার সময় আসতে দেখে বুলু বলে।

—তুই গুডবয় আমাদের সঙ্গে মিশিস না। ফার্স্ট বয়—

বিজয় চটে ওঠে, বলে—কেন খেলবি না?

নাদু বলে—ফার্স্ট বয় না ছাই। বৌদির ল্যাজ ধরে ফার্স্ট হয়েছে। সব লিখে দেয় বৌদি, ও নিয়ে গিয়ে টুকলিফাই করে।

বিজয়ের সারা মন জ্বলে ওঠে। নানুকে সপাটে একটা চড় কষিয়েছে। ওরাও তৈরী ছিল। বুলুও ওকে মারতে আসে। কিন্তু বিজয় ওদের দুজনকেই মাটিতে ফেলেছে। দুচারঘা দিয়েছেও।

সেজদাই ছাড়িয়ে দিয়ে বলে —তুই যা বিজু।

বুলু-নাদু গোঁ গোঁ করে। ওরা বলে—ও থাকলে খেলবো না।

বিজু গর্জে ওঠে —নাইবা খেললি!

ইদানীং স্কুলের দুচারজন বন্ধুও জুটেছে। পাড়ার ওদিকের মাঠে—নদীর ধারে তারা খেলা করে। বিজয় তাদের ওখানেই যাবে। বের হয়ে আসে সে।

ব্যাপারটা দোতলার বারান্দা থেকে কমলা ও কিছুটা দেখেছিল। বিজয়কে ওইভাবে দুজনকে আক্রমণ করতে দেখেছিল সে, কিন্তু কোনছেলেই ছাড়িয়েছে ওদের।

সন্ধ্যার পর বিজয়কে বই নিয়ে থাকতে দেখে চাইল কমলা। শুধায় সে—কি হয়েছিল ওদের সঙ্গে বৈকালে?

বিজয় চুপ করে থাকে। কমলা বলে—জবাব দাও?

বিজয়ের ওসব বলতে ভালো লাগে না। বৌদির সম্বন্ধে দু একটা মন্তব্যও করেছে তারা। ওই ল্যাজ ট্যাজ এর কথা ভাবতেও পারে না বিজয়।

একবার হনুমানের ল্যাজ ধরে বিপদে পড়েছিল তাই ল্যাজ ধরার কথাতে সে ক্ষেপে উঠেছিল ওদের উপর।

বৌদির মুখচোখ বদলে গেছে। কঠিন স্বরে বলে—কি হল? চুপকরে আছো যে?

বলে বিজয়—আমি নাকি টুকে ফার্স্ট হয়েছি। তুমি লিখে দিয়েছ ওসব নয়ে গিয়ে টুকলিফাই করে—

কমলা হেসে ওঠে। বলে সে হাল্কা স্বরে।

—এতেই রেগে গিয়ে মারামারি সুরু করবে? আরও অনেক কিছু সহ্য করতে বে বিজয়। অনেক দুঃখ অনেক কষ্ট অনেক অপমান না সইতে পারলে জীবনে বড় হওয়া যায় না। এসব তো তুচ্ছ।

বিজয় চাইল ওর দিকে।

যেন একটা নোতুন কথা শুনছে সে, বৌদি বলে।

—মনে থাকবে তো? নাও পড়তে বসো।

বিজয় কদিন বুলু-নানুদের এড়িয়ে চলেছে। স্কুলে থেকে ফিরে বৌদির াছে হোম টাস্কগুলো শেষ করে বের হয়ে যায় মলয় অসীমদের ওখানে। ওরা াড়ার শেষ প্রান্তে আমবাগানের মাঠে খেলা করে! সেখানেই আশীষের সঙ্গেও পরিচয় হয়।

বৈকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামছে।

নদীর চরে আলো মুছে গিয়ে আঁধার হয়ে আসে। সবুজ মটর কলাই এর ক্ষেতে সাদা ফুল ফোটে, পাখীরা কলরব করে ঘরে ফেরে। পটল ওদের দলের াণ্ডা। এমনিতে গোঁয়ার গোবিন্দ ষণ্ডামার্কা চেহারা। সেদিন পটল পকেট থেকে াঁচ সিগারেটের একটা প্যাকেট বের করে বলে—নে। ধরা।

মলয় অবশ্য কারিত কর্মা। সে একটান টেনেই বেজায় কাশতে শুরু করে। ৰজয় ওদের ব্যাপার দেখে চমকে ওঠে। সিগারেট-বিড়ির ব্যাপার তাদের াড়িতে নেই।

কিন্তু এখানে তারই বয়সী ছেলেদের ওটা টানতে দেখে চমকে ওঠে সে।

এতবড় একটা অন্যায় কাজ এত সহজে এরা করতে পারে তা ভাবেনি। পটলা বলে —কিরে বিজে, টান ! নে—ধরা।

বিজয় বলে—না। ওসব খাই না। জানতে পারলে বাড়িতে সাংঘাতিক কান্ড হবে। খাবো না।

পটলা বলে, স্কুলে পড়ছিস, এখনও খোকা আছিস নাকি ? কাওয়ার্ড কোসাকার।

চুপ করে থাকে বিজয়। মলয় বলে,

—যেতে দে পটলা।

পটলা আপাততঃ তাকে রেহাই দিল, বিজয় তবু এদের মেনে নিতে পারে না। এরা যেন ঠিক অন্য জগতেরই ছেলে।

এইখানেই আশীষকে দেখেছিল বিজয়। এই দুরন্ত ছেলেদের মধ্যে আশীষ কিছুটা শান্ত প্রকৃতির। স্কুলে দেখেছে, পড়াশোনাতে ভালো তেমন নয়, কিন্তু চেষ্টা করে। আশীষও বিজয়ের কাছে আসে। ওই দলের সকলে যখন কবাডি খেলায় মত্ত, আশীষ তখন গল্প করে। সেই দেখায় তাকে দূর জার্মানীর একটা পাহাড়, নদীর ছবি আঁকা একটা ডাকটিকিট। তার দাদা জার্মানীতে গেছে। সেখানে নাকি চাকরী করবে, সেখান থেকে চিঠি ছবিওয়ালা পোষ্টকার্ডও পাঠায় অনেক।

বিজয় অবাক হয়ে সেই গল্প শোনে। তার বৌদির কথা মনে পড়ে। ওর ঘরে ঘূর্ণায়মান গ্লোবে ওই দূর জার্মানীর ছবি ফুটে ওঠে। কোথায় বরফঢাকা আল্পস। বিজয়ের কিশোর মন যেন মহানন্দার তীরের সবুজ মটর খেত আম-বাগানের সীমা ছাড়িয়ে দূর সেই অজানা দেশে হারিয়ে যায়। পাইন-ফার-চিরহরিদ বৃক্ষের বনসমাকীর্ণ পাহাড়শ্রেণী, কোথায় হ্রদ, রাইন নদী !

আশীষ বলে—আমাদের বাড়িতে আরও অনেক ছবি আছে।

তারই আকর্ষনে বোধ হয় বিজয় গেছে আশীষদের বাড়িতে। ছোট একতলা বাড়ি—সামনে অতসী, গন্ধরাজের গাছ। ওদিকের ঘরের দেওয়ালে জার্মানীর কোন পাহাড় পাইন বন আর বরফ ঢাকা পাহাড়ের ছবি।

আশীষ বলে—দাদা লিখেছে, বি-এ পাশ করতে পারলে জার্মানীতে নিয়ে যাবে। ওখানেই কাজকর্ম করে দেবে।

বিজয় দেখছে ওকে। মনে হয়, খুবই ভাগ্যবান ওই আশীষ। তার দাদা রয়েছে ওখানে, বিজয়ের তেমন কেউ নেই ; আশীষ বলে—ভালো ছেলেদের ওখানে খুব কদর ! ভালো ভালো চাকরী দেয়।

বিজয় কি ভাবছে।

আশীষের ও ভালো লাগে বিজয়কে। সে একটা ছবিওয়ালা পোষ্টকার্ড দিয়ে বলে—তোমাকে দিলাম এটা। ওদের দেশের রাইন নদীর ছবি।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। বাড়ি ঢুকে হঠাৎ খেয়াল হয় বিজয়ের দেরী হয়ে গেছে। এ বাড়িতে দেরী করে ঢোকা মস্ত অপরাধই। বলুরাও কদিন ধরে বিজয়ের উপর চটে ছিল। আজ ওকে ফিরতে না দেখে শ্যামসুন্দরবাবুকেই জানায়।

—বিজু ওপাড়ায় কোথায় আড্ডা দিতে যায়।

শ্যামসুন্দরবাবুও তাক করেছিলেন বিজয়কে ফিরতে দেখে বলেন—বই নিয়ে আয়। কোথায় ছিলি এতক্ষণ? আড্ডা হচ্ছিল? অর্থাৎ এলে তার জন্য ক'টা গাঁট্টার ব্যবস্থাই হবে।

কমলাও একটু অবাক হয় ওকে দেরী করে ফিরতে দেখে। চাইল ওর দিকে; বিজয়ের মনে তখন সেই সবুজ দেশের স্বপ্ন। বিজয় হাতের পিকচার পোস্টকার্ডটা দেখিয়ে বলে।

—দ্যাখো বৌদি। আমার ক্লাশফ্রেন্ডের দাদা জার্মানীতে থাকেন তিনিই পাঠিয়েছেন।

গ্লোবটায় জার্মানীর ম্যাপ বের করে বিজয় খুঁজছে রাইন নদীকে, কমলা দেখছে ওই কিশোরকে, ওর চোখে যেন দূর সেই দেশের স্বপ্ন। বিজয় বলে—ওদের বাড়িতে আরও ছবি আছে। আশীষ নাকি ভালো ভাবে পাশ করলে ওর দাদা ওকে জার্মানীতে নিয়ে যাবে।

কমলা বলে—তুমি ভালোভাবে পাশ করলে একদিন নিজেও যেতে পারবে ওখানে।

বিজয় চাইল ওর দিকে—সত্যি?

হাসে কমলা—হ্যাঁ! এই নিয়েই ওখানে দেরী হয়েছে বুঝি?

বিজয় চাইল। বলে সে—সত্যি জার্মানীর গল্প শুনছিলাম ওর কাছে। ওর দাদা এলে আমাকে খবর দেবে বলেছে। কি সুন্দর দেশ—কত বড় কলকারখানা। জার্মানরা খুব বুদ্ধিমান জাত, না বৌদি?

কমলা ওই কিশোরের স্বপ্ন জগৎকে যেন নিজেও দেখছে। সে বলে,

—বড়হতে গেলে পরিশ্রমী সৎ-বুদ্ধিমান হতেই হয় বিজু।

যাও পড়তে বসো গে!

খেয়াল হয় বিজয়ের। বলে সে।

—নীচে গেলে আজ মাস্টারমশায় কসে গাঁট্টা মারবেন, দেরী করে ফেলেছি কিনা! সত্যি বৌদি—গল্প শুনতে শুনতে দেরী হয়ে গেল।

কমলা বুঝেছে ব্যাপারটা। বলে সে।

—ঠিক আছে। চলো আমি মাস্টারমশায়কে বলে দেব। কিছু করবেন না উনি।

—সত্যি! বিজয় অবাক হয়।

বৌদি যে তাকে ভুল বোঝেনি, এটা ভেবে বিজয়ও খুশী হয়েছে। আরও

নিশ্চিন্ত হয়েছে জেনে যে এ বাড়িতে একজন আছে যার উপর সে একান্ত নির্ভর করতে পারে।

মানদাকে দিয়ে মাষ্টার মশায়কে ডাকিয়ে এনেছে কমলা।

শ্যামসুন্দরবাবু শুধোন—কি ব্যাপার মা!

এই বউটিকে এ বাড়ির সকলেই সমীহ করে। শ্যামসুন্দরবাবুও। কমলা বলে—বিজুকে আমিই একটু কাজে পাঠিয়েছিলাম, দেরী হয়ে গেছে।

শ্যামসুন্দরবাবু বলেন—ঠিক আছে মা।

বিজয় আজ বৌদিকে নোতুন করে চিনেছে। কি অপরিসীম খুশী আর তৃপ্তিতে মন ভরে ওঠে ওর।

নায়েব সরসীবাবু বিভিন্ন মহালে ঘুরে বেড়ান এবং অসিতের সম্বন্ধে নানা কথাই শোনেন। ভবানীপুরেও অসিতের স্বভাব চরিত্র নিয়ে নানা কথা ওঠে। ইদানীং অসিত আনুসঙ্গিক নেশাও ধরেছে। আর সেই মেয়েটিকে নিয়ে কাছারি বাড়িতেও তুলেছে।

মনোতোষবাবু খবরটা পেয়ে গম্ভীর হয়ে যান। তার শান্তির সংসারে যেন ঝড়ের একটা কালো মেঘ উঠছে। মনোতোষবাবু দেখেছেন কমলাকেও।

শান্ত একটি মেয়ের জীবনে তিনি একটা দুঃখের কালোছায়া এনেছেন। তবু মুখফুটে সব বঞ্চনা, দুঃখকে সহ্য করে চলেছে কমলা। মনোতোষবাবু নিজেকেই অপরাধী মনে করেন। তাই শুধোন—পড়াশোনা কেমন চলছে মা?

কমলার সঙ্গেই মনোতোষবাবুর সকালে কিছু কথা হয়। মনোতোষবাবুও বুদ্ধিমতী মেয়েটিকে গভীর স্নেহ করেন। দেখেছেন তিনি বিজয়ের মত দুরন্ত ছেলেকে কমলা কি ভাবে বদলেছে। তাঁর আশাও বেড়েছে বিজয়ের উপর। তাই এক জায়গায় তিনি কমলার কাছে কৃতজ্ঞ।

কমলা বলে—ভালোই চলছে বাবা। সামনের এপ্রিলে পরীক্ষা দেব ভাবছি—কুষ্টিয়ার কলেজ থেকেই পরীক্ষা দিতে চাই।

বিয়ের পর এ বাড়িতে এসে বিশেষ আর বাবার ওখানে যায় নি কমলা। মনোতোষবাবুও বোঝেন ওর মানসিক অবস্থাটা। এবাড়ি ওকে বিশেষ কিছুই দেয় নি।

তাই বলেন তিনি—বেশ তো যাবে। মাসখানেকের ব্যাপার তো! ও হয়ে যাবে।

কমলা দেখছে মানুষটিকে। এ বাড়িতে এই মানুষটির নীরব অস্তিত্ব সকলের মনে নির্ভর আনে। কমলাও তার থেকে বঞ্চিত হয় নি।

মনোতোষবাবু বলেন—তোমার ছাত্র, কেমন পড়ছে মা?

কমলা হাসে। বলে সে—বিজয় ভালোই পড়ছে বাবা।

তবু ভয় হয় মনোতোষবাবুর। বলেন তিনি।

—ও বড় জেদী, এক গুঁয়ে মা। তাই ভয় হয়—

কমলা বলে—বড় হলে বদলে যাবে। খুব বুদ্ধি ওর।

মনোতোষবাবু বলেন—তুমিই ওকে বদলেছো মা। ও যদি মানুষ হয় তোমার জন্যই হবে।

তার কথার সুরে নিবিড় শান্তি আর কি কৃতজ্ঞতার সুর ফুটে ওঠে।

মনোতোষবাবু সরসী নায়েবের মুখে ওই সব খবর শুনে চটে ওঠেন। রেগে গেলে ও জোরে কথা বলেন না। একটু বেশী গম্ভীর হন মাত্র। সেদিন অসিত এ বাড়িতে এসেছে অনেক রাত্রে। কোথায় কাজ সেরে ফিরতে নাকি রাত্রি হয়ে গেছে।

সিমু গেট খুলে দিয়েছে।

মনোতোষবাবু রাত্রি অবধি নিজের ঘরে কাজ করেন। বাড়ি নিস্তব্ধ। রাত্রিতে মনোতোষ বাবু ঠাণ্ডা মাথায় ব্যবসার কাজ পত্র দেখতে পারেন, নোতুন পরিকল্পনা করেন ব্যবসার।

হঠাৎ অসিতকে ঢুকতে দেখে চাইলেন।

বারান্দা দিয়ে চলেছে অসিত নিজের ঘরের দিকে, ওর দেহটা টলছে। চমকে ওঠেন মনোতোষবাবু। বোধ হয় নেশা করেই এসেছে অসিত। এ বাড়িতে কেউ কখনও যা করেনি অসিত তাই করেছে বোধ হয়। এ নিজেরই যেন দুঃসহ লজ্জা। মনোতোষবাবু তাঁর কর্তব্যও স্থির করে নিলেন। অসিতকে এবার তিনি শাসনই করবেন। একটা ব্যবস্থা তাকে নিতেই হবে।

কমলা দেখছে অসিতকে।

ওর সারা মনে নীরব একটা জ্বালা তীব্রতর হয়ে ওঠে। অসিতের এসব ভাবার মত মানসিক অবস্থাও নেই। সে বিছানায় এসে ঘুমিয়ে পড়েছে।

মনোতোষবাবুর কথায় অসিত চমকে ওঠে।

সকালেই বাবা তাঁর ঘরে ডেকে পাঠিয়েছেন। অসিত বাবাকে এড়িয়ে চলে যেতো, কিন্তু আজ তা পারে নি।

মনোতোষ বাবু বলেন—ভবানীপুর কাছারিতে আমি সরসীকেই পাঠাবো মাসে মাসে, তুমি এখানে থাকবে।

অসিতের মুখটা বিবর্ণ হয়ে ওঠে।

—ওখানে অনেক কাজ।

মনোতোষবাবু বলেন—সরসী সামলাবে। এখানে ব্যবসা পত্র বাড়ছে। এত পাট সস্তায় ছাড়তে হয়। জুট প্রেস করে গাঁট বন্দী করে রাখলে ভালো দাম পাবো। জুট প্রেস করছি এসব তোমাকেই দেখতে হবে। জমিদারীর দিন ফুরিয়ে আসছে, ব্যবসাতেই নামো। তাই চাই এখানে থাকবে তুমি।

অসিতের সারা মনে ঝড় ওঠে।

মনে হয় তার কীর্তি কাহিনীর কথা কেউ বোধ হয় বাবার কানে তুলেছে। আর হয়তো কমলাই করেছে এটা। চটে উঠেছে অসিত। কিন্তু বাবার উপর কোন কথা বলার সাহস তার নেই। তবু আমতা আমতা করে—ওখানে কিছু জরুরী কাজ আদায় উশুল বাকী আছে খাতাপত্রও সারতে হবে।

মনোতোষবাবু বলেন—দশ দিনের মধ্যে ওসব শেষ করে চলে এসো। তারপর যা বাকী থাকবে সরসীকে বলে দিও—ও করে নেবে। যাও।

বের হয়ে এল অসিত। বেশ বুঝেছে তার জীবনের গতিতে এবার বাধার সৃষ্টি করেছে কমলাই। বাবা সেটাকে সমর্থন করেছেন মাত্র।

কমলা চুপ করে বসেছিল। বিজয় পড়ছে। হঠাৎ রুদ্রমূর্তি ধরে অসিতকে ঢুকতে দেখে চাইল কমলা। অসিত গর্জে ওঠে।

—কি বলেছো বাবাকে?

কমলা অবাক হয়ে চাইল! শুধোয় সে।

—কি আবার বললাম?

অসিত বলে—ন্যাকা। কিছু জানো না। ভেবেছ আমার নামে বাবার কাছে চুকলি খেয়ে আমাকে জব্দ করবে? ওসব ন্যাকামি রাখো। এই অসিত শর্মাকে চেনোনি—তোমার ন্যাকামি আমি ছুটিয়ে দেব।

রাগে দুচোখ জ্বলছে অসিতের।

ওর মুখে চোখে ফুটে উঠেছে বিশ্রী একটা কাঠিন্য। বিজয়ও চমকে উঠেছে। মনে হয় বড়দা যেন একেবারে বদলে গেছে, একটা জানোয়ারে পরিণত হয়েছে।

চমকে ওঠে কমলা। বলে সে।

—তুমি এখন যাও বিজু!

বিজয়কে সে বাইরে পাঠিয়ে দিল, কমলা বলে জ্বালা ভরা কণ্ঠে,—যা ইচ্ছা বলতে পারো, গায়ে হাত দিতে চাও—দিও। ওদের সামনে এ ভাবে অকারণে অপমান কোরনা। আমি এসবের কিছুই জানি না। তোমার কাছে কোন চাওয়ার দাবীও আমার নেই। সেটা জানাবারও কোন চেষ্টা করিনি, করবোওনা।

বিজয় বাইরে এসে দাঁড়িয়াছে। বৌদির আজ অশ্রুভেজা কণ্ঠস্বর তার সারা মনে কি ঝড় তোলে। বৌদির এতবড় দুঃখ, বেদনার খবরটা সে জানতনা।

আজ ওর জন্য সমাবেদনায় বিজয়ের দুচোখ বেয়ে জল নামে। দেখছে সে বড়দা রেগে ঘর থেকে বের হয়ে গেল। বৌদির চাপা কান্নার শব্দটা তার বুকে ঝড় তুলেছে। ছাদের নির্জনে গিয়ে বিজয়ও অসহায় কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। খুব রাগ হয় বড়দার উপর।

ছাদ থেকে দেখা যায় বড়দা তখন কালো ঘোড়াটায় চেপে জোর কদমে ছুটে

চলেছে—নদীর ধারের মাঠ পেরিয়ে আমবাগানের মধ্যেকার পথ দিয়ে চলে গেল।

বিজয়ের চোখের জল বাধা মানে না। বৌদির জন্য আজ তারও গভীর বেদনা জমেছে মনে। বৌদিকে সে সুখী দেখতে চায়, কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে যেন সেই আশাগুলো বর্ণহীন—শূন্যতায় পরিণত হয়েছে।

সারা বাড়িতে থমথমে ভাব জাগে।

নীচের মহলেও কথাটা কিভাবে প্রকাশ পেয়ে গেছে। পিসীমা এসবে খুশি হন নি। কোথায় বৌদির সম্বন্ধে তার মনের অতলে একটা নীরব জ্বালা ছিল। আজ সেটা মুখর হয়ে ওঠে।

মহামায়া সংসারের এসব ব্যাপারে কোন কথা বলেন না, স্বামীর কথাতেই সব চলে।

কিন্তু পিসীমা তবু বলে।

—বৌমাকে বুঝিয়ে বলো বউদি। অসিতের মা নেই—আজ তুমিই তার মা। ও বেচারার দুঃখটা তোমাকেও বুঝতে হবে।

মহামায়ার কাছে অসিতও নিজের ছেলের মতই। কিন্তু পিসীমা যেন ইচ্ছা করেই মহামায়াকেও ইঙ্গিত করেছে সৎমায়ের ব্যাপারটা। মহামায়া কাতর স্বরে বলে—তুমি তো জানো ঠাকুরঝি, অসিতকে আমিই মানুষ করেছি। আমার মেজ-সেজ-বিজুদের ও বড়দাদাই। কিন্তু কত্তা যা বলেছেন তাতে আমি কি বলবো বলো! তবু দেখছি, বউমাকেও বলছি।

পিসী বলে—তাই বলো বাছা। স্বামীর কাছে একটু মাথা হেট করুক ও মেয়ে। এত লেখাপড়ার গৌরব কিসের?

বিজয়ের কিশোর মন শুনেছে ওদের কথা গুলো। আজকের ব্যাপারের সেও নীরব সাক্ষী ছিল। মনে হয় বৌদির সমন্ধে এসব কথা উঠলে সেও জোর করে বলবে তার দাদার কথাটাও। বৌদি দোষী নয়।

কিন্তু বলতে পারে না।

চুপ করে থাকে বিজয়। তার কিশোর মনে এ বাড়িতে মানুষদের এই অবিচারের জন্য ঝড়ই ওঠে। তার বহিঃপ্রকাশ না থাকলেও সেই ঝড়ের আলোড়নটা বিজয়ের মনের চিন্তা ভাবনা, ধারণা গুলোকে যেন বদলে দিচ্ছে ক্রমশঃ। মাও কেন পিসীমায় কথায় প্রতিবাদ করতে পারে না জানে না সে, মায়ের এই নীরবতাও ভালো লাগে না বিজয়ের। বাবাকে সে আরও গভীর শ্রদ্ধা করতে পারে।

বাবা বড়দাকে ওই কথা বলে ঠিকই করেছেন। এখানে এসে থাকবে বড়দা, বৌদি খুশী হবে। খুশী হবে বিজয়ও।

পর দিনই খবরটা আসে।

সারা বাড়িতে একটা সাড়া পড়ে যায়। যেন শান্তির সংসারে একটা দুর্নিবার ঝড় উঠেছে।

বড়দা সেদিন মহালে যাবার পথে জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে যাবার সময় ঘোড়া থেকে ছিটকে পড়েছে, মাথায়, বুকে দারুণ চোট লেগেছে। মনোতোষবাবুও সরসী নয়েবকে নিয়ে ছুটেছেন সেখানে। সারা বাড়িতে একটা দমবন্ধ করা পরিবেশ। বৈকালে বড়দার জ্ঞানহীন দেহটাকে নিয়ে ওরা হাসপাতালে ভর্তি করেছে।

বৌদি—মা—পিসীমা সবাই গেছে সেখানে। বাবাও বাড়ি ফেরেন নি। ক্ষেত্র সরকার ছেলেমেয়েদের বাড়িতে রেখেছে। বিজয় গুম হয়ে গেছে।

রাত্রে ফেরে তারা। স্তব্ধ শোকাহত মূর্তিগুলো।

বড়দার জ্ঞান ফেরে নি। ডাক্তারদের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে বড়দা রাত্রে মারা গেছেন।

বিজয় জীবনে এই প্রথম মৃত্যুকে দেখেছে।

ভোরেই বড়দার প্রাণহীন দেহটাকে এনেছে ওরা। ফুলে ফুলে ঢেকে দিয়েছে। মা—পিসীমা—মেজদির চোখে জল। বিজয় দেখেছে বৌদিকে, ওর শান্ত মুখখানায় যেন কালো মেঘের ছায়া নেমেছে। ওকে চেনে না যেন— ও আজ কোন দূর জগতের মানুষ।

বিজয়, দেখেছে বাবাকে। গম্ভীর মানুষটির চোখেও দেখেছে নীরব অশ্রুধারা। মৃত্যুর এই প্রশান্তি মানুষের মনের সব দুর্বলতাকে জাগিয়ে তোলে। প্রিয়জনকে আজ হারাবার বেদনায় বিজয় ফুঁপিয়ে ওঠে—কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে সে। আজ বড়দার উপর আর তার কোন রাগ নেই। দুঃখ হয়—কেন চলে গেল সে এভাবে।

বড় বাড়ির জীবন-যাত্রায় ছন্দটা যেন এক প্রচণ্ড দুঃখে শোকে স্তব্ধ হয়ে গেছে।

কিন্তু কোথাও কিছু থেমে থাকে না। প্রকৃতির নিয়মেই সব কিছু নিজের গতিতে আপন ছন্দে চলতে থাকে। গতিময়তাই জীবন—সেই জীবনের স্রোত থামে না। গতিপথ কিছু বদলায় হয়তো, কিন্তু থামতে সে জানেনা।

এই বড় বাড়ির ছন্দটা আর নিজের গতিতে চলতেও শুরু করেছে অনেকেই সহজ—স্বাভাবিকভাবেই অসিতের মৃত্যুটাকে মেনে নিয়েছে। তবু মনোতোষবাবুর মনে এই বেদনাটা রয়ে গেছে।

তিনি কমলার দিকে চাইতে পারেন না। ওর জীবনের সব আশাই যেন হারিয়ে গেছে। এর জন্য নিজেকেও কিছুটা অপরাধী বোধ করেন মনোতোষবাবু। মহামায়াও স্বামীর এই বেদনাটাকে বুঝেছে। মনোতোষবাবু বলেন—বউমাকে থান পরতে দিও না বড় বউ। আর মাকে নিরাভরণা দেখতে আমি পারবো না।

শাঁখা পরা তো ঘুচে গেল, মায়ের হাতে চুড়িগুলো থাক।

পিসীমা এসব বিধানে খুশী হননি। এ বাড়ির কর্তার উপর তার কথা বলার কোন সাহসই নেই। তবু আড়ালে বলে।

—কপাল পুড়েছে মেয়ের নিজের দোষে, তবু বিধবার লক্ষণ মানবে না এ কেমন কথা বাপু? আমরা তো মেনেছি।

মহামায়া বলে—ছেলে মানুষ। বাছার সারা জীবন তো পড়ে আছে ভাই।

পিসীমা বলে—কে জানে বাবা। যা ভালো বোঝ করো তোমরা। তবে বলছি ও মেয়ের লক্ষণ ভালো না বাপু। এ বাড়িতে এসে এই অকল্যাণ হলো, আর যেন কিছু না হয়?

মহামায়া শিউরে ওঠে—এ সব কথা বলো না ভাই।

বিজয় শুনেছে কথাগুলো। তার মনের অতলে বৌদির জন্য গভীর দুঃখই হয়। সে যায় বৌদির ঘরে।

কিন্তু আগেকার মত সেই সহজ হাসিখুশী ভাব আর নেই। বৌদি কেমন গম্ভীর হয়ে উঠেছে।

—বৌদি!

বিজয়ের ডাকে চাইল কমলা।

ক'দিনেই তার জীবনে যেন ঝড় বয়ে গেছে। সেই মধুর খুশিভরা ঝলমলে ভাব নেই, নিঃস্ব একটি বিষন্ন নারীকে দেখছে সে। সেই সুন্দর মূর্তি আজ কি এক বিষন্ন প্রতিমায় পরিণত হয়েছে, বিজয় অবাক হয়।

—তুমি কাঁদছো বৌদি, চোখে জল—

কমলা সহজ হবার চেষ্টা করে—কই না তো! কি যেন পড়লো চোখে, বিজয় বেশ বুঝেছে বৌদি তার কাছেও আজ ওর কান্নাটাকে চাপতে চায়। কমলা দেখছে ওকে।

এ বাড়ির কিছু মানুষকে দেখছে কমলা।

পিসীমার সেই নানা কথাও কানে আসে তার। বারবার যেন ওরা কমলাকে; তার ভাগ্যকে দোষী করেছে এই সর্বনাশের জন্য। ও যেন এ বাড়ির অকল্যাণই এনেছে এই কথাটাই বলতে চায়।

নিজেকে ঠিক রাখতে পারে না কমলা।

ওর সর্বনাশের খবর পেয়ে কমলার বাবাও এসেছিলেন। দরিদ্র শিক্ষক তার চোখেও জল নামে।

মনোতোষবাবুকে বলে ছিলেন—মাকে কদিনের জন্য নিয়ে যেতে চাই বেই-মশায়, যদি অনুমতি দেন—

মনোতোষবাবু বিবেচক লোক। বলেন তিনি,

—যাবে, সামনে পরীক্ষা-তখনই পাঠাবো। দু'চারদিন থেকে পরীক্ষাটা দিয়ে আসুক।

কমলাও শুনেছে কথাটা।

বাবা ফিরে গেছেন আশা নিয়ে। কমলা তখুনিই এ বাড়িতে থেকে যেতে চায় নি ওই মনোতোষবাবুর জন্যই।

কমলা বলে মনোতোষবাবুকে—ঠিকই বলেছেন বাবা। কিছুদিন আপনার কাছে থেকে যাই।

বৃদ্ধের শোকে যেন সান্ত্বনাই দিতে চায় কমলা। মনোতোষবাবুও খুশী হন। বলেন—এ বাড়ি তোমারই মা। যেতে হয় দু'চারদিনের জন্য বাবার ওখানে যাবে, তবে তোমার পথ চেয়ে থাকবো মা।

কমলা ওই মানুষটিকে আর বিজয়কে কেন্দ্র করেই এ বাড়িতে থাকতে চেয়েছিল। কিন্তু ক্রমশঃ পিসীমা—অন্যদের ওই সব কথায় কমলার মনে একটা নীরব জ্বালাই বেড়ে উঠেছে। ওরা বার বার স্মরণ করিয়ে দিতে চায় যে কমলাই এই সংসারের অমঙ্গলের মূল, তার অদৃষ্ট দোষেই এ বাড়ির বড় ছেলের অকাল মৃত্যু ঘটেছে।

এ যেন তার কাছে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটের মতই দুঃসহ জ্বালা আনে।

অসহ্য হয়ে, উঠেছে কথাগুলো।

তাই ওর চোখে জল নামে। কমলাও মনে মনে কথাটা ভেবেছে। তার মত স্বাধীন সত্তার মেয়ে বিনা কারণে এসব অবিচার সহ্য করবে না, সে এর প্রতিবাদই করবে।

আর নিজের পথ নিজেই দেখে নেবে সে। শূন্য জীবনের বোঝা বয়ে নিজেকে সে ফুরিয়ে দেবে না।

মনোতোযবাবু অসিতের এই আকস্মিক মৃত্যুর পর থেকেই কেমন বদলে গেলেন। তাঁর জুট প্রেস—করাও হল না। আর অন্য সব ব্যবসাপত্রেও তাঁর উৎসাহ নেই।

সকালে সেদিন কমলাকে জল খাবার নিয়ে আসতে দেখে চাইলেন। কমলাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বলেন।

—কিছু বলবে মা?

কমলার বি-এ পরীক্ষার দিন এগিয়ে আসছে। বলে সে।

—পরীক্ষার তো দেরী নেই বাবা।

কথাটা মনোতোযবাবুর ও খেয়াল হয়। বলেন তিনি।—তাই তো। তাহলে বাবার ওখানে থেকেই পরীক্ষা দেবে ঠিক করেছো? অবশ্য পড়াশোনা দেখানোরও দরকার।

কি ভেবে বলেন তিনি।

—তাহলে চিঠি দিচ্ছি তোমার ভাইকে পাঠান। পরীক্ষাটা দিয়েই এসো।

কমলা চুপ করে বের হয়ে এল।

এই বড় বাড়িটা তার কাছে আজ থেকেই যেন আকর্ষণহীন যন্ত্রনাদায়ক হয়ে উঠেছে।

পিসীমা অবশ্য বলেছিল—বাপের ওখানে না গিয়েও এখান থেকে পরীক্ষা দেওয়া যায় দাদা।

মনোতোষবাবু খুশী হন না। বলেন।

—এ সময় একবার মায়ের কাছে যাক নিরু, বাধা দিস না।

নীরুবালা বলে—বাধা কেন দেব। যেতে চায় যাক—যা খুশী করুক, এবার সেই পালাই সুরু করার পথ দেখালে।

বিজয়ের মনে একটা বেদনার ছায়া নামে। এ বাড়িতে তার দুরন্ত স্বভাবকে শান্ত করেছিল বৌদিই। সেজদা—বুবু—নান্দু—নিতুদের সঙ্গেও এখন বেশী মেলামেশা করে না বিজয়। বাড়িতে বৌদির ঘরে পড়াশোনা করে, স্কুলে যায় আর বৈকালে ছাদে বেড়ায় বৌদির সঙ্গে না হয়, মলয়—আশীষদের ওখানে যায় খেলতে।

বৌদিই তার সব সময়টাকে ভরিয়ে রেখেছে।

সেই বৌদির বাপের বাড়ি যাবার কথা শুনে কি নীরব অভিমানে বিজয়ের মন গুমরে ওঠে।

কমলাও গোছগাছ করছে, বিজয়কে এড়িয়ে থাকতে দেখে সেদিন ডেকেছে। সকালের ট্রেনে পরদিন চলে যাবে সে। তার ভাই অনিলও এসেছে।

কমলা এই ফাঁকে বিজয়কে ডেকে এনে শুধায়।

—কাল এলে না যে? পড়া টাস্ক সব হয়েছে?

বিজয় গুম হয়ে আছে। কাল বৈকালে ওর যাবার খবরটা শুনে বিজয় একা বের হয়ে গেছল বাড়ি থেকে। একাই বসেছিল মহানন্দার বালুচরে। সারা মনে তার দুঃসহ একটা বেদনার আভাষ, মনে হয় বৌদি তাকে এতটুকু ভালো বাসে না, না হলে তাকে ফেলে চলে যাবে কেন?

তার কিশোর মনে এইটাই বারবার জেগেছে।

কমলা দেখছে ওকে। বলে সে—জবাব দাও।

বিজয়ের মনের ঝড়টা এবার ফুটে ওঠে। বলে সে।—আমার জন্য ভাবো? ছাই—আমার পড়া-টাস্ক হ'ল না হল তোমার তাতে কি?

চমকে ওঠে কমলা। বিজয়ের নরম কোমল মুখখানায় কি কাঠিন্য ফুটে ওঠে। কি কঠিন আঘাতে ওই কিশোর একেবারে বদলে গেছে।

কমলা ভাবতেও পারে নি এটা।

রাগ করতে গিয়েও পারে না কমলা। ওকে কাছে টেনে নেবার চেষ্টা করে।

প্রতিবাদ করে বিজয়—থাক্ ! খুব চিনেছি তোমাকে ? কেন—কেন আমাকে রেখে চলে যাবে ?

ওর দুচোখে অশ্রু নামে। সব রাগ যেন ওই চোখের জলে কিছুটা ধুয়ে যায়। কমলা বলে।

—পরীক্ষা দিতে যাচ্ছি। তুমি কি চাও—মূর্খ হয়ে থাকবো ?

মানুষকে নিজের পায়ে দাঁড়াবার, মাথা উচু করে বেচে থাকায় চেষ্টা করতেই হবে বিজু। তুমিও নিজের চেষ্টায় একদিন বড় হবে। দেশযোড়া নাম হবে তোমার। আমি যেখানেই থাকি তোমার এই গৌরবে খুশী হবো।

জীবনে সব কিছু পাওয়া যায় না—অনেক কিছু হারাতে হয়। দুঃখ কষ্টও সইতে হয়। এ সবই বড় হবার পরীক্ষা। এতে ভেঙ্গে পড়বে না। সামনে এগোতেই হবে তোমাকে।

বিজয় দেখছে বৌদিকে। ওর সান্নিধ্যে এসে বিজয়ের সব রাগ অভিমান মুছে যায়। তবু মনের অতলে একটা তীব্র হাহাকার জেগে থাকে। বৌদির ওই কথা গুলোর অর্থও ঠিকমত বোঝায় ক্ষমতা তার নেই।

বের হয়ে এল সে।

বিজয় যেন বদলে গেছে। কি তার হারিয়ে গেল—যা কোন দিনই আর ফিরে আসবে না। সেই সব হারানোর বেদনায় তার মনে হাহাকার জাগে।

সকালের সূর্য ওঠে। এখানে আলোর তুফান বয়। মহানন্দার বালুচর—জল সীমায় লুটিয়ে পড়ে সেই আলোর আভাষ। আজ সকালের এত আলো—পাখীর ডাক বিজয়ের মনের হতাশা ভরা অন্ধকারকে দূর করতে পারে না।

বৌদি চলে যাচ্ছে, নদী পার হয়ে বালুচরের উপর দিয়ে গরুর গাড়িটা চলেছে ষ্টেশনের দিকে।

এদিকের ঘাটে বাড়ির সকলেই এসেছে, আসেনি বিজয়। কমলা যাবার আগে মনোতোষবাবু, মহামায়া—পিসীমাকে প্রণাম করে, সেজো—বুলুরা সবাই রয়েছে। নেই শুধু বিজয়। সে কোথায় সরে গেছে।

মনোতোষবাবু বলেন—ট্রেনের দেরী হয়ে যাবে মা। কমলা উঠল গাড়িতে। দুচোখ মেলে এদিক ওদিকে দেখছে সে, কিন্তু বিজয় ত্রিসীমানায় কোথাও নেই। গরুর গাড়িটা চলেছে। সঙ্গে চলেছে, এ বাড়ির ক্ষেত্র সরকার, অনিল আর ওদের পিছু নিয়েছে বাচ্চু, এ বাড়ির কুকুরটা মধ্যে মাঝে চাইছে সে কমলার দিকে, ক্ষেত্র সরকার ওকে বাড়ি ফেরাবার চেষ্টা করে।

কিন্তু কুকুরটা ন্যাজ নাড়তে নাড়তে আবার এগিয়ে যায়। কমলাকে ছেড়ে যেতে সেও চায় না।

কমলা তখনও চেয়ে আছে নদীতীর আমবাগান—ওই বড় বাড়িটার দিকে। ওখানে তার অজানতেই অনেক স্মৃতি রেখে গেল সে।

দূরে আমবাগানের ছায়ায় বিজয় দাঁড়িয়ে আছে। চেয়ে রয়েছে সে ওই বালুচরে গরুর গাড়িটার দিকে। মনে হয়, ছুটে যাবে। বৌদিকে যেতে দেবে না সে কিছুতেই।

কিন্তু পারে না। মনে হয় বৌদি তাকে বিনা দোষেই ইচ্ছা করেই এই শাস্তি দিয়েছে।

ওর সঙ্গে তার আড়ি—আর কোনদিনই কথা বলবে না ও। কিশোর মনে আজ বড়দার মৃত্যু—বৌদির এই ভাবে চলে যাওয়া সব যেন শুধু নিবিড় দুঃখই এনেছে। এই দুঃখের বেদনাকে সে প্রথম চিনেছে।

হঠাৎ তার চোখের সামনে আমবাগান—নদীতীর—বালুচর ঝাপসা হয়ে যায় দুচোখ ছেয়ে জল নেমেছে। আচ্ছন্ন হয়ে যায় সব কিছু।

বৌদির ওই গাড়িটাকে আর দেখা যায় না। ওপারের গ্রামসীমার আড়ালে কোথায় হারিয়ে গেছে। বিজয় তখনও আমবাগানে বসে আছে।

আজ তার কোন কাজেই উৎসাহ নেই।

বাড়ি ফেরার ইচ্ছাও নেই—স্কুল। স্কুলে যেতেও আর ইচ্ছা নাই। পড়াশোনা—স্কুলে যাওয়া, ভালো ছেলে হতে চাওয়া সব কিছুই ছিল বৌদিকে কেন্দ্র করে। তাকে খুশী করার জন্যই এই সব করতো সে। কিন্তু সেই বৌদিই নিষ্ঠুরভাবে তাকে ছেড়ে চলে গেল। সুতরাং আজ থেকে বিজয়েরও আর ওসব কাজে কোন ইচ্ছাই নেই। নীরব প্রতিবাদে আর কি জ্বালায় বদলে গেছে সে।

—কি রে! বিজু! হঠাৎ ছায়াঘন আমবাগানে কাকে দেখে চাইল বিজয়। পটলা—গুপী চলেছে। পটলা বলে।—মাছ ধরতে যাছি, যাবি নৌকায়?

বাগানের নীচেই নদী। ডিঙ্গিও যোগাড় করেছে তারা। বিজয় আজ হঠাৎ বেপরোয়া হয়ে ওঠে।

বলে সে চল!

অবাক হয় শুনে—তুই যাবি? স্কুল যাবি না!

বিজয় ডিঙ্গিতে উঠে বলে—না!

পটলা বলে ওঠে—আসল বুদ্ধি এবার খুলেছে তোর। নে-বুদ্ধির গোড়ায় একটু ধোঁয়া দে, দেখ কেমন বুদ্ধিগুলো খুলবে এবার। ধর।

একটা সস্তা সিগ্রেট এগিয়ে দেয়। বিজয় সেদিন এসব খায় নি। আজ যেন জেদের বশে, বৌদির উপর রাগটা দেখাবার জন্যই সেটা ধরিয়ে বেদম টান দিতেই কাশতে থাকে।

পটলা বলে—ধীরে ধীরে বৎস! আস্তে টান—তোর হবে!

বিজয় আজ প্রথম এই বাঁধন হারা বেপরোয়া জীবনের স্বাদ পায়। ডিঙ্গিটা ভেসে চলেছে অজানা গ্রাম সীমার দিকে। নদীতে গাংচিল ডাকে, পাল তুলে

মাল গুজোরী নৌকা দূর অসীম পদ্মার দিকে চলে যায়, আকাশে শ্বেত শুভ্র মেঘের আনাগোনা। বাতাসে কোথায় ভাটিয়ালী গানের সুর ভেসে আসছে।

অসীম-বিশাল—বন্ধনহীন এক নোতুন জগৎ। বিজয়ের শোক গ্রস্ত মন ক্রমশঃ যেন এই মুক্তির স্পর্শে তার দুঃখটাকে ভুলতে পারে। এই বেপরোয়া জীবনকে সে ভালোবেসে ফেলে।

ফিরতে বৈকাল গড়িয়ে যায়। মাছও ধরেছে ওরা। পাবদা—বাটা-আড়মাছ। পটলা ওকে কিছু মাছ দিতে গেলে বিজয় নেয় না। এবার তার মনে পড়ে বাড়ির কথা। ভয়ও হয়।

সেজদা ফাইন্যাল পরীক্ষা দিচ্ছে, বুলু-নিতু-নানুরা বিজয়ের খবর জানে না। মনোতোষবাবুও কাজে বের হয়ে গেছেন। বৌদি চলে যাবার পর বাড়িতে নানা আলোচনাই চলেছে। ওরা বিজয়ের খবর ঠিক রাখেনি। মনে হয় বাইরের বাড়িতে খেয়ে যথারীতি স্কুলে গেছে।

তাই বিজয় ভয়ে ভয়ে বাড়ি ঢুকে কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়। সাবান বাড়ির মাঠে ছেলেরা খেলছে। বিজয়ের অনুপস্থিতিটা আজ কেউ বুঝতে পারে নি।

বিজয় উপরে উঠে থমকে দাড়ালো।

অভ্যাসমত বৌদির ঘরের দিকে এসেছিল, আজ সেই ঘরটা শূন্য তালাবন্ধ। বিজয় 'ওই রুদ্ধ দরজার সামনে হঠাৎ নোতুন করে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে।

কার পায়ের শব্দে চাইল!

—তুই।

বিজয় চমকে উঠেছে মাকে দেখে। মহামায়াও দেখছে ছেলেটাকে। মা জানে ওর দুঃখটাকে। তাই বিজয়কে বলে।

—কাঁদিসনা। চল—

সকালে বিজয়ের আজ কোন কাজ নেই। বই খুলে বসেছে মাত্র। শ্যামসুন্দর বাবু সেজদার পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত। ওর পরীক্ষা হয়ে গেলে তিনিও চলে যাবেন।

বিজয় অঙ্ক—ইংরাজী ভূগোলের বই খুলে বসেছে। পড়ায় মনও বসে না। অঙ্কগুলো যেন কঠিনই বোধ হয়। ইংরাজীও কটমট ঠেকে। বিরক্তি বোধ হয়। বই বন্দেকরে বসে থাকে। বার বার বৌদির কথাই মনে পড়ে।

গ্লোবটা ও রয়েছে। অন্যদিন কত আগ্রহ নিয়ে দেখতো ওর বুকে আঁকা বিভিন্ন দেশকে। আজ আর কোন আগ্রহই নেই। গ্লোবটাকে তাচ্ছিল্যভরে ঘুর পাক খাইয়ে যেন সারা দুনিয়াকে সে তালগোল পাকিয়ে দিতে চায়।

স্কুলের টাস্কও ঠিকমত হয় নি।

সেকেন্ড স্যার বলেন—আজ তোমার অংক হয় নি কেন বিজু?

বিজয় চুপ করে থাকে। এসব ভালোও লাগে না আর।

ইংরাজী টিচার তাঁর পিরিয়ডে চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকানি দিয়ে বলেন।

ট্রানশ্লেসন কই? ফাঁকি দিতে শিখে গেলি এর মধ্যে। স্ট্যান্ড আপ্ অন্ দি বেঞ্চ!

বিজয়-এর চোখ মুখ লাল হয়ে ওঠে অপমানে, রাগে। বেঞ্চে আর কোন দিন দাঁড়ায় নি। আজ তাকে দাঁড়াতে হয়েছে।

মনে হয় বৌদি এসব লাঞ্ছনা, অপমানের জন্য দায়ী।

স্কুলটা ছিল এতদিন বিজয়ের কাছে একটা প্রতিষ্ঠার ঠাই। নিজের বুদ্ধির প্রতিষ্ঠা করতে পেয়েছিল। প্রতিযোগিতায় জয়ী হতে চেয়েছিল বৌদিকে খুশী করার জন্যই। আজ তার কোন প্রয়োজন নেই। তাই স্কুলও তার কাছে আজ হৃদয়হীন। শিক্ষকদের শাসনে কাঠিন্যময় একটা জগতে পরিণত হয়েছে।

বিজয় এসবকে আর ভালোবাসতে পারে না। কোন কিছুকেই ভালোবাসার মত মানসিক অবস্থাও তার নেই।

মনে পড়ে পটল, গুপীদের সেই অবাধ মুক্তির জগতের কথা। বাধা দেবার কেউ নেই। পড়া নাহলে সেখানে বেঞ্চের উপর দাঁড়াতেও হবে না।

বিজয় কি ভাবছে।

গুপীদের বাগানে চাষ বাস হয়। গুপীকে খুশী করার জন্যই বিজয় আজ সহরের বাইরের দোকানে সিগ্রেট কিনেছে, আর আট আনা দিয়ে গরম সিঙ্গাড়াও কিনেছে।

অবশ্য তার জন্য বিজয়কে কিছু কৌশলও করতে হয়েছে।

সেজদার অধীনে একটা কৌটা আছে তালাবন্ধ করা থাকে সেটা, তাতে এবাড়ির সব ছেলেরাই হাতখরচের পয়সা রোজ ওতে ফেলে আর প্রত্যেকের নামে সেই অঙ্ক জমা করা হয় একটা খাতায়।

বিজয় তার নামে আট আনা জমা করেছে কিন্তু জমা দিয়েছে অন্য জিনিষ। পয়সাটা দিয়ে সিগ্রেট—সিঙ্গাড়া কিনে এনেছে গোপনে।

পটলা-গুপী-নিপুরা এখন ঘুড়ি ওড়াবার জন্য তৈরী হচ্ছে। ঘুড়ি ওড়ানোর মরসুম এসে গেছে। পাড়ায় পাড়ায় ঘুড়ি ওড়াবার পাল্লা চলে। তার জন্য মাঞ্জা দেওয়া হয় নানা ভাবে। সাগু, ডিম, কাঁচগুড়ো চাই। আর ঘুড়ির খটা-লাটাই-সুতো এসব তো আছেই। পটলারা বিজয়কে সিঙ্গাড়া সিগারেট আনতে দেখে খুশী হয়। পটলা বলে—নাহ। মানুষ হবি এবার বিজু। কি যে করিস পড়াশোনা-টোনা। ধ্যাৎ! নে!

সিগ্রেটও টানতে শিখছে বিজয় ক'দিনেই। পটলা বলে।

—ঘুড়ি-সুতোর দরকার। পয়সা তো চাই, নাহলে পাল্লা দিই কি করে?

বিজয়-এর ঘুড়ি ওড়াবার সখ অনেক দিনের। কিন্তু বাবার কড়া নিষেধ। ঘুড়ি ওড়ানো এ বাড়িতে চলেনা। আজ সেই সুযোগ পেয়েছে সে বাইরে। বিজয় বলে।

—পয়সা কিন্তু আমি দেব।

গুপী বলে—গুড বয়।

পটলা শোনায়—কালই আন। তোকে এমন ঘুড়িয়াল করে দেব!

গুপী বলে—সিগ্রেটও আনবি কিন্তু।

বিজয় এখন ওদের কাছে আপনজন হয়ে উঠেছে। বিজয় ব্যাঙ্কের খাতায় পয়সা জমা করে, কিন্তু সেই পয়সা সরিয়ে রাখে এই সব সৎকাজের জন্য।

বিজয় স্কুলে আসে, এখন আর ফার্স্ট বেঞ্চে বসে না। পিছনে তার দলবল নিয়ে, বসে, আর দেখেছে শেষের পেরিয়ড গুলোয় স্কুলে মনও বসে না। জানলা দিয়ে দেখা যায় নীল আকাশে রং বেরং এর ঘুড়িগুলো উড়ছে। তার মনও উধাও হয়ে যায় ওই দূরে আকাশে। মলয়, বলে—কোথায় চল্লি রে?

বিজয়ের মন পড়ে আছে পটলা—গুপী—নিপুদের ওখানে। এখন নীপুদের ছাদে ওদের ঘুড়ির পাল্লা চলেছে। চিলেছাদের ঘরে সিগ্রেট টানে, আর ঘুড়ি কেটে গেলে উম্মাদের মত চীৎকার করে—ভো কাট্টা! সেই উম্মাদনার কাছে ক্লাশের এই পড়া অনেক প্রাণহীন—নীরস বলে বোধ হয়।

বিজয় বলে—চলে যাচ্ছি।

ক্লাসের ফাঁকে কোন মতে বের হয়ে গাছ গাছালির আড়াল দিয়ে সাবধানে স্কুলের বাইরে এসে এবার হাঁফ ছেড়ে বাঁচে বিজয়। দৌড়য় সে নীপুদের বাড়ির দিকে। নীচে থেকে কলরব ওঠে আকাশ ভরা ঘুড়ির মধ্যে তাদের চাঁদিয়াল যেন বিজয়ীর মত এক একটাকে কেটে শূন্যে ভাসিয়ে চলেছে।

বিজয়ও চীৎকার করে—ভো কাট্টা—দুয়ো।

বিজয়ীর মত বাড়ি ফিরেছে বিজয়। ক'টি মাস তার কাছে ঝড়ের মধ্যে দিয়ে কেটেছে। বাবাও খুব ব্যস্ত। ব্যবসাপত্র গুটিয়ে আনছেন, বাড়িতে একটা স্তব্ধতা নেমেছে আজ।

বৌদির কথাটা কাঁটার মত বাজে বিজয়ের বুকে। মনে হয় বৌদি ফিরে আসার আগে বিজয় আবার পড়াশোনায় মন দেবে।

কিন্তু পিসীমার গলা শুনে চমকে ওঠে।

বাবা কি বলতে চান। মাও রয়েছে। পিসীমা বলেন।—তখনই জানতাম ও বৌ এ সংসারে আর আসবে না। ও এসেছিল শুধু আমাদের সর্বনাশই করতে! তাই করে চলে গেল। নিজের পায়ের দাঁড়াবেন! এ বাড়ির বৌ হয়ে বি—এ পাশ দিয়ে ওখানে ম্যাষ্টারনী হবেন! তুমি এখনও চুপ করে থাকবে?

মনোতোষবাবু কি ভাবছেন।

কমলাই তাঁকে জানিয়েছে কথাটা। বি-এ পরীক্ষা দিয়েছে। পাশও করবে, ওর বাবার স্কুলের গার্লস শেকশনে একটা চাকরী নিয়ে ওখানেই থাকতে চায়।

মনোতোষবাবু বোনের কথায় বলেন।

—তার উপর জোর করার কিছুই নেই নীরু। তবু ক্ষেত্রকে একবার পাঠাই, যদি আসতে চায় ভালো।

পিসীমা ঘোষণা করে—যদি না আসে এ বাড়ির সঙ্গে তার আর কোন সম্বন্ধই থাকবে না এটাও লিখে দিও দাদা। একটা হেস্তনেস্ত করা চাই।

বিজয় শুনেছে কথাটা।

বৌদি আর হয়তো কোনদিনই আসবে না। এ বাড়িতে বিজয় গুম হয়ে ওঠে। না আসুক—তার দিন গুলো হাল্কা হাওয়ার মত কি মত্ততায় কেটে চলেছে। খারাপ সে নেই।

বৌদিকে না হলে তার চলে যাবে।

এ বাড়ির জীবনছন্দ ঠিকই চলেছে।

মনোতোষবাবু ব্যবসা গুটিয়ে এনেছেন। এখন সেজছেলে কলকাতায়, সেজ ছেলের পরীক্ষার ফল বের হলে সেও চলে যাবে পড়তে। তাই ব্যবসাপত্র, গুদাম আড়তের কাজ কমিয়ে, এখন ছেলেদের নামে নামে বিভিন্ন জায়গায় জমি ভূ-সম্পত্তি কিনছেন। যাতে বড় হয়ে বিভিন্ন জায়গাতে নিজেদের বিষয় আশায় নিয়ে থাকতে পারে।

বার হারোয়াতেও জমি বাড়ি করেছেন, মালদহ—পুরোনো মালদহেও করেছেন বিষয় আশয়, বাড়ি।

পূর্ব বাংলার শেষ প্রান্তে তাদের পৈত্রিক বাসস্থান, একদিন হয়তো এখান থেকে পশ্চিম বাংলাতেই চলে যেতে হবে। তাই আগে থেকেই এবার সেখানে বিভিন্ন জায়গায় বাড়ি সম্পত্তি করছেন।

তাই নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়। যাতায়াত করতে হয় এখানে ওখানে।

বাড়িতে শ্যামসুন্দরবাবু এতদিন গৃহশিক্ষক হিসাবে ছিলেন, তিনিও চলে গেছেন।

বিজয়ের উপর তার অনেক আশা। তাই বিজয়ের জন্য সহরের নামকরা শিক্ষক করুণাবাবুর কাছে প্রাইভেট পড়ার ব্যবস্থা করেছেন। ব্যবস্থা করেই নিশ্চিন্ত হতে হয়েছে তাঁকে। তার সময় নেই।

বিজয়ও এই অবধি স্বাধীনতা পেয়ে এখন স্কুল পালাচ্ছে—ঘুরছে নদীর ধারে, আমবাগানে কোন গাছে গাংশালিখের বাচ্ছা হয়েছে সে খবরও রাখে বিজয়। নদীতে ডিঙ্গি বেয়ে ভাটিতে চলে যায় আর যখন ফিরে আসে তখন বৈকাল নামে।

স্কুলের ছুটি হয়ে যায়, বিজয়ও নৌকা থেকে নেমে বাড়ি ফেরে। যেন স্কুল সেরে ফিরছে।

সামনে পরীক্ষা। শীতের আভাষ এসেছে—নদীর চরের বুকে মটরছোলার শ্বেত শ্যাম সঞ্জীবতা নামে। বিজয়ের কাছে হঠাৎ ওদের আকর্ষণ ম্লান হয়ে আসে কি অজানা আশঙ্কায়।

এবার খেয়াল হয় ইংরাজী-অঙ্ক-ইতিহাস-বাংলা সব পড়াই যেন ভুলে গেছে সে। অঙ্কগুলো আগে চটপট মাথায় আসতো, ইংরাজী ট্রানশ্লেসন—গ্রামার ছিল তার মুখস্থ, আজ সব কেমন ভুলে গেছে। বৌদির উপরই রাগ হয়। বিজয়ের সব খুশীর দিন—আশার দিন গুলোকে বৌদি যেন রাত্রির অন্ধকারের মত সব মুছে দিয়ে গেছে।

বিজয়ও মরীয়া হয়ে ওঠে। নাড়ে চাড়ে বই পত্তর। তার বেপরোয়া মন আজ সব কিছুর জন্যেই তৈরী হয়ে উঠেছে।

পরীক্ষার হলে যেতে হয়েছে বাধ্য হয়ে। না হলে বাড়িতে ধরা পড়ে যাবে। খাতায় কি লিখেছে জানে না। প্রশ্নপত্র গুলো পকেটে নিয়ে গুম হয়ে বাড়ি ফিরেছে।

বাবা শুধোন—কেমন পরীক্ষা দিলি ?

বিজয় আজ সহজেই মিথ্যা কথাটা বলতে পারে। বলে সে।

—ভালোই দিয়েছি।

মনোতোষবাবুর অনেক আশা ভরসা বিজয়ের উপর। বলেন।

—ফাস্ট-সেকেণ্ড হতে পারবি তো ?

বিজয় এবারও জানায়—দেখা যাক !

পরীক্ষা হয়ে গেছে। সেজদাও পাশ করেছে। কলকাতা যাবে সে পড়তে, এবার বিজয় আরও স্বাধীন হবে। বুলু—পিতুরা বলে।

— ব্যাঙ্কের টাকা তাহলে মিটিয়ে দাও সেজদা !

ওরা সেজদা যাবার আগে নিজেদের জমা টাকা ফেরৎ পেতে চায়। তাই ব্যাঙ্কের বাক্স খোলা হয়েছে। খাতাও বের করা হয়েছে।

কিন্তু অবাক হয় তারা দেখে বেশ কিছু টাকা কম, তার জায়গায় সিগ্রেটের প্যাকেটের রাংতা দিয়ে আধুলির সাইজে কিছু চাকতি ঢোকানো। প্রায় পনেরো টাকা যা বিজয়ের জমার অংক, সেই পরিমান টাকাই কম। তার বদলে রয়েছে তিরিশটা চাকতি।

চমকে ওঠে তারা—এসব কে ঢোকালো ?

সেজদা দেখছে বিজয়কে। বুলু আরও হিসেবী। সে দেখেছে বিজয়কে নগদে পয়সা দিয়ে সিঙ্গাড়া—ঘুড়ি সুতো কিনতে। পটলাদের সঙ্গে মিশতে। এবার বুলুই বলে—বিজয়ের কাজ।

বিজয় বুলুর উপর চটেই ছিল। সে গর্জে ওঠে।

—খবরদার বাজে কথা বলবি না। তোরই কাজ এসব।

বুলুও বাধা দিতে বিজয় এবার ঝাঁপিয়ে পড়ে তার উপর। বুলুও দুচার ঘা দেয় আজ। বিজয়ও ছাড়ে নি। এসে পড়েছে সরসী নায়ের, ক্ষেত্রদা। পিসীমাও।

বুলু এবার জোর পেয়ে বিজয়ের স্কুল ব্যাগটাই টেনে এনে প্রকাশ্যে খুলতে তার মধ্যে বেশ কিছু পয়সা সিগ্রেটের রাংতা বানানো দুতিনটে আধুলির সাইজের চাকতি, আর একটা সিগ্রেটের বাক্সও বের হয়।

চোর অপরাধীকে এবার হাতে নাতে ধরে ফেলেছে ওরা। পিসীমা বলে।

—এই তোর কাণ্ড বিজয়! ইস্কুলে যাস সিগ্রেট-এর বাক্স নিয়ে। লজ্জায় ভয়ে বিজয়ের মুখ চোখ লাল হয়ে ওঠে।

ব্যাপারটা মনোতোষবাবুর কানেও যায়।

অবাক হন তিনি। বিজয় যে এমনি কাজ করতে পারবে তা ভাবতেও পারেন না। বলেন তিনি সরসী নায়েবকে।

—তুমি ঠিক বলছো সরসী?

সরসীনায়েব ব্যাপারটাকে হালকা করার জন্য বলে।

—ছেলে মানুষ খেয়াল বশে করেছে। বড় হলে ঠিক হয়ে যাবে।

বলেন মনোতোষবাবু।

—ঠিক বুঝছি না সরসী। ও বড় জেদী আর একগুয়ে। বুদ্ধি ওরই সব থেকে বেশী, তাই ভয় হয়, বদ সঙ্গে পড়ে সেটা বদবুদ্ধিতে পরিণত না হয়।

ভাবনায় পড়েন মনোতোষবাবু।

পরীক্ষার রেজাল্ট বের হয়েছে।

বুলু—নিতু-নিপুরা এসেছে মার্কসিট নিয়ে। মনোতোষবাবু দেখছেন ওদের নম্বরগুলো। এবার মোটামুটি ভালোভাবেই পাশ করেছে তারা। বিজয় তখনও ফেরেনি।

মনোতোষবাবু শুধোন – বিজু কোথায়?

বিজয় জানতো এমনি রেজাল্ট হবে তার। তবু ভেবেছিল পাশ নম্বর তার থাকবে। প্রমোশন সে পাবেই। কিন্তু পাশও করেনি। চারটে বিষয়ে ফেল করেছে।

মার্কসিট নিয়ে ভয়ে সরে আসে।

বাড়িও ফেরেনি। বেশ জানে বাড়িতে বাবা তার জন্য অপেক্ষা করবেন। আজ অজানা ভয়ে বিজয়ের বুক কাঁপে।

তবু বাড়ি ফিরতে হয়।

মনোতোষবাবু ওর মার্কসিটটা দেখে যেন বিশ্বাসই করতে পারেন না।

গতবার ফাষ্ট হয়েছিল বিজয়। আর এবার তিনটে সাবজেক্টে ফেল করেছে। প্রমোশনও পায় নি।

মনোতোষবাবুর মনে পড়ে ব্যাঙ্কের বাক্সে সিগ্রেট এর রাংতা রাখার কথা, পয়সা নিয়ে সে বদসঙ্গে পড়ে বিগড়ে গেছে। কোথায় বিজয়ের মনে একটা জ্বালাই প্রকট হয়ে উঠেছে। সেই জ্বালার প্রতিবাদে যেন নিজেকেই শেষ করতে চায় সে। মনোতোষবাবু কঠিন স্বরে শুধোন।

—এটা কি হয়েছে? ফেল করেছো? একদম গোল্লায় গেছো দেখছি। লজ্জা করে না, ছিঃ ছিঃ!

বিজয়ের মনে সব কাঠিন্য এবার বাবার সামনে গলে পড়ে। লজ্জাই হয় তার। আজ সে নিদারুণ ভাবে হেরে গেছে। কি দুঃখে দুচোখ ছাপিয়ে জল নামে তার। বৌদির মুখখানা ভেসে ওঠে।

আজ বৌদির জন্যই সে এইভাবে হেরে গেছে।

বৌদির কথাও শোনে নি সে। কাঁদছে বিজয়। বৌদি যেন তার সামনে এসে ঘৃণা ভরা চোখে তার দিকে চেয়ে আছে। অপরাধী সে। বিজয়ের দুচোখ বেয়ে জল নামে।

মনোতোষবাবু দেখছেন বিজয়কে। বহুদর্শী মানুষ তিনি। জীবন থেকে অনেক শিক্ষাই নিয়েছেন। তাই বুঝতে পারেন বিজয়ের মনোবেদনাকে। একদিক থেকে বিজয় একটা কঠিন আঘাতই পেয়েছে বৌমা চলে যাবার পর। সে আঘাতের সমভাগী তিনিও।

তাই বিজয়ের এই পরাজয়ের বেদনাটাকে তিনি কিছুটা বুঝতে পারেন। বলেন তিনি—ঠিক আছে। এবার ভালো করে চেষ্টা করো।

বিজয় আজ নিজেকে যেন কিছুটা চিনেছে।

এখানের পরিবেশ, বৌদির শূন্য ঘর-ওই বাইরের পটলা গুপীদেরও আজ ভালো লাগে না তার। বিজয়ের কাছে এখানের জগতের সব আকর্ষণ মুছে গেছে। এখানে থাকলে সে বাইরের জগতেই হারিয়ে যেতে বাধ্য হবে।

বলে বিজয়—আমি অন্য কোথাও অন্য স্কুলেই পড়বো বাবা। ভালো করে পড়াশোনা করবো। এখানে নয়—

মনোতোষবাবু চাইলেন ছেলের দিকে!

কোথায় যেন একটা চরম দুঃখের সুরই বাজে তাঁর মনেও। বিজয়ের কথায় বলেন মনোতোষবাবু।

—ঠিক আছে। পরে দেখছি। একদম আর বাইরে দিনভোর বেরবে না। বাড়িতে থাকবে।

বিজয় আজ বদলে গেছে। জীবনে এক একটা জিনিষকে আপন করে ধরে. কিন্তু তা হারাতেও বেশী সময় লাগে না। এখানের বন্ধুদের কথাও ভুল যেতে

চায় সে।

মনোতোষবাবুও কথাটা ভেবেছেন। বিজয়কে অন্যত্রই পাঠাবেন তিনি পড়ার জন্য। কোন বোর্ডিং স্কুলেও দিতে ভরসা হয় না। তাই একটা ব্যাবস্থার কথাই ভাবছেন।

বিজয় ক'দিন বাড়ি থেকে বের হয় নি। নিজেরই যেন লজ্জা করে বাইরে যেতে।

মনে হয় সকলেই তাকে যেন আঙুল দেখিয়ে বলছে—ফেল করেছে সে। একটা বোকারাম।

সেদিন ক্ষেত্রদা বৈকালে তার হাতে তুলে দেয় চিঠিখানা। তার নাম লেখা একটা চিঠি। হাতের লেখাটা চেনে সে। হাত কাঁপছে বিজয়ের। বৌদি!

অনেকদিন পর বৌদি চিঠি লিখেছে তাকে।

চিঠিখানাই খুলে পড়তে থাকে।

তার ফেল করার খবর বোধ হয়, বাবাই দিয়েছেন বৌদিকে। তার এই চিঠির প্রতি ছত্রে ছত্রে বৌদির নীরব হাহাকারই ধ্বনিত হয়।—এ তুমি কি করেছো বিজয়। আমাকে এতবড় দুঃখ তুমি দেবে তা ভাবিনি।

বৌদির দুচোখের চাহনিটা যেন প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে বিজয়ের সামনে। বৌদি লিখেছে।

—এখনও মন দিয়ে পড়াশোনা করো, জীবনে তোমাকে বড়, আরও বড় দেখতে চাই বিজয়। আমার কাছে এই সব থেকে বড় চাওয়া।

সন্ধ্যা নামছে। বিজয় আজ অনুভব করে একটা মহা অপরাধ করেছে সে। নির্জন সাবান বাড়ির আকাশে দু একটা করে তারা জেগে ওঠে। বিজয়ের মনে হয় বৌদিই যেন দূর আকাশ থেকে আজও তার দিকে এমনি আশাদৃপ্ত উজ্জ্বল চাহনি মেলে চেয়ে আছে স্থির লক্ষ্যে।

বিজয় কান্না ভেজা স্বরে বলে।

—তোমার কথা মনে থাকবে বৌদি। পড়াশোনা আবার করবো। আবার আমি ভালো হবো। আমার জন্য কোনদিন তুমি দুঃখ পাবে না। না।

আজ চোখের জলে বিজয় যেন দূর কোন নক্ষত্রকে তার শপথের কথা শোনাতে চায়।

হঠাৎ ক্ষেত্রদার ডাকে চাইল। ক্ষেত্রদা বলে।

—কত্তা মশায়, ডাকছেন বিজু।

বিজয় বাবার ঘরে গিয়ে ঢুকলো ধীর পায়ে। তখনও তার চোখে মুখে কান্নার থমথমে ভাব।

মনোতোষবাবু বলেন।

—তোমার পড়ার ব্যবস্থা অন্যত্র করেছি বিজয়। মন দিয়ে পড়াশোনা করবে তো।

বিজয় চাইল বাবার দিকে। আজ সে অনুতপ্ত—অপরাধী।

বলে সে—হ্যাঁ বাবা! আমি কথা দিচ্ছি—

মনোতোষবাবু ওকে কাছে টেনে নিয়েছেন। গম্ভীর রাশভারি মানুষটিকে দেখছে বিজয়। মনোতোষবাবু বলেন।

—তোর উপর আমার অনেক আশা বিজয়। বৌমাও অনেক আশা করেছিল তুই বড় হবি।

বিজয় চুপ করে থাকে। মনোতোষবাবু বলেন।

—কুচবিহারে তোর বড়দির ওখানে থেকে পড়ার ব্যবস্থা করেছি তোর।

বিজয় খুশি হয়। এখানে আর সে থাকবে না।

মনোতোষবাবু বলেন—কালই সন্ধ্যার গাড়িতে রওনা হতে হবে।

বিজয় বলে—তাই হবে বাবা।

পার্বতীপুর হয়ে গাড়ি বদল করে যেতে হবে।

সন্ধ্যায় ট্রেন। বিজয় আজ যেন এই এত দিনের সহর—ওই নদীতীর এখানের সবকিছুকে ভুলতে চায়।

ক্ষেত্রদা তাকে পৌঁছে দিতে চলেছে।

বাবা মা—পিসীমাকে প্রণাম করে বুলু নিতুদের কাছে বিদায় নিয়ে আগত সন্ধ্যার অন্ধকারে এখান থেকে অজানা পথে বের হল বিজয়। বৌদির সেই চিঠি খানাও সঙ্গে রয়েছে তার। মনে হয় বিজয়ের নোতুন অজানা পথে এই তার যাত্রা সুরু হল। এ পথ কোথায় কতদূর গেছে তা জানে না। তবু চলতে হবে তাকে। আর নিজের ইচ্ছাতেই এই পথকে সে মেনে নিয়েছে। নদীপার হয়ে সহরের সীমা ছাড়িয়ে একটি কিশোর নোতুন জগতের সন্ধানে হারিয়ে গেল।

সন্ধ্যার পর ট্রেন। বিজয় ষ্টেশনে এসে ক্রমশঃ বাড়ির কথা, মা—বাবা—বন্ধুদের কথাও ভুলে গেছে। জীবনের একটা নোতুন অভিজ্ঞতাও তার হয়েছে।

কোন কিছুকে চিরকালের জন্য আঁকড়ে ধরে মানুষ বাঁচতে পারে না। সে পরিবর্তন চায়, বৈচিত্র্য চায়। তাই নোতুন পরিবেশে এসে মন পিছনের কথা ভুলে যায়।

পৃথিবীর সীমা ক্রমশঃ বাড়ছে তার।

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমেছে। ট্রেনটা একটার পর একটা ষ্টেশন পার হয়ে চলেছে। ও বাড়ি থেকে আরও-আরও দূরে চলেছে। প্রথম প্রথম ষ্টেশন গুলোর নাম দেখছে উদগ্রীব হয়ে ঈশ্বরদি জংশনে এসে আরও বিচিত্র ঠেকে।

বড় ষ্টেশন—আলোয়, ঝলমল করছে। কত লোকজনের ভিড়, ক্ষেত্রদার

সঙ্গে নামলো এখানে। ওদিকে প্লাটফর্মে এসেছে দার্জিলিং মেল। ওখানে ট্রেন বদলে চলেছে।

এ ট্রেনের যেন রাজকীয় মেজাজ। ছোটখাটো ষ্টেশনের মিটমিটে বাতিগুলোকে অবজ্ঞা করে ছুটে চলেছে। সব জায়গাতে দাঁড়ায় না।

ক্ষেত্রদা বলে—মেল ট্রেন। ডাকগাড়ি কিনা, তাই সব জায়গায় ধববো নি। পার্বতীপুর জংশন যাই ট্রেন বদলি করতে হবে। বিজয়ের ঘুম আসে না। ঝড়ের বেগে এ ট্রেন ছুটে চলেছে। কখন পার্বতীপুর জংশন আসবে তার অপেক্ষায় বসে আছে সে।

পার্বতীপুরে ট্রেন ছেড়ে অন্যগাড়িতে উঠলো।

সে ট্রেন অনেক আস্তে চলে, আর সব ষ্টেশনেই প্রায় দাঁড়ায়। রাত কত জানে না। অন্ধকার-এর বুক চিরে ট্রেনটা চলেছে। আকাশের অগুনতি তারার দিকে চেয়ে চেয়ে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল বিজয় তা জানে না।

ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখছে সে—বৌদির হাসি ঝলমল মুখখানা চেয়ে আছে সে। বিজয় ফার্ষ্ট হয়ে এসেছে।

বৌদি ওকে কাছে টেনে নিয়ে বলে।

—আরও বড় হবে তুমি বিজয় ?

ওর চোখের সামনে গ্লোবটার ছবি ফুটে ওঠে। বিচিত্র কত দেশ বিদেশের ম্যাপ আঁকা। বিশাল পৃথিবীটা এখানে অনেক ছোট হয়ে গেছে। বৌদি বলে।

—কত দেশ বিদেশে যাবে, কত নাম ডাক হবে তোমার। দেশের জন্য অনেক কিছু করবে।

হঠাৎ কার ডাকে চমকে ওঠে বিজয়।

ধড় মড়িয়ে উঠল। চমকে ওঠে সে। কোথায় তাদের নবাবগঞ্জের বাড়ি-কোথায় বা বৌদির সেই হাসি ভরা মুখ! স্বপ্নই দেখছিল সে। বাস্তবে আজ ওসবের কোন অস্তিত্বই নেই।

দিনের আলোয় ভরে গেছে চারিদিক। বেশ বেলা হয়েছে।

গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে বড় একটা ষ্টেশনে। ক্ষেত্রদার সঙ্গে নামতেই দেখা যায় প্লাটফরমের ওই ভিড়ের মধ্যে বিজয়ের জামাইবাবু তাদের খুঁজছেন। কাছে আসতে বিজয় প্রণাম করে।

জামাইবাবু বলেন—পথে কোন কষ্ট হয় নি তো ?

বিজয় জানায়—না-না।

বিজয় নোতুন এক সহরকে দেখছে।

তাদের চাঁপাই নবাবগঞ্জের সহরের সঙ্গে এর যেন কোন মিলই নেই। চাঁপাই নবাবগঞ্জ সহরটা ঘিঞ্জী। আর বাড়িগুলোও রকমারি ধরনের। রাস্তার

গঞ্জের লোকজন কারবারীদের ভিড়। পাট-ধান-কলাই এর আড়ত। ধুলোয় ভর্তি আর লোকজন এবং ভিড়।

কিন্তু তার তুলনায় কুচবিহারের চেহারাই আলাদা। এখানের মহারাজাদের নাম ডাক আছে। সহরের রাস্তাও বেশ চওড়া, পিচ ঢাকা, দুপাশে সারবন্দী লাইটপোস্ট, রাস্তা লোকজনের ভিড়ও তত বেশী নয়।

দু'চারটে সাইকেল রিক্সা ট্রেনের যাত্রীদের নিয়ে প্রশস্ত পথে ছুটে চলেছে আর আছে কিছু সাইকেলের ভিড়।

জামাইবাবুরা দীর্ঘদিন কুচবিহারের বাসিন্দা।

জামাইবাবু বলেন—এ সহর এখানের মহারাজাদেরই গড়া। মাঝে একটা বিরাট সুন্দর পুকুর। ওদিকে প্রাসাদের সুরু।

বিজয় দেখছে অবাক হয়ে নোতুন সহরকে। চৌরাস্তার মোড়ে একজন পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে। হাত তুলে সে এক একদিকে গাড়ি-লোকজন সাইকেল রিক্সার ভিড় নিয়ন্ত্রণ করে যাতায়াত করাচ্ছে।

জামাইবাবু বলেন—ওকে বলে ট্রাফিক পুলিশ। রাস্তার ভিড় কনট্রোল করছে।

বিজয় এই প্রথম ট্রাফিক পুলিশ দেখলো।

ওদিকে বিরাট একটা বাড়ি, কলেজ হোস্টেল। ডানদিকে বেশ বড় একটা বাড়ি! ওটা এখানের বড় পোস্টাপিস, সামনে সুন্দর একটা ঘাট বাধানো দিঘী। চার পাশে বেশ কিছু গাছ গাছালির ভিড়। ওপাশে একটানা লম্বা একটা বিল্ডিং। বেশ তকতকে। এটা এখানের বড় হাসপাতাল।

বিজয় এই সহরের রূপটিকে তার অজানতেই ভালোবেসে ফেলেছে। এর একটা ঐতিহ্য—আভিজাত্য আছে।

হাসপাতালের বাঁদিকে চলে গেছে একটা রাস্তা, রাস্তার নামটাও পড়েছে সে, বিশ্ব সিং রোড। জামাইবাবু বলেন।

—সাহেবদের আমলে এর নাম ছিল ডালটন।

এবার লোকজনের বাড়িঘর, সহরের বাড়ি বসতি শুরু হয়েছে। তবু বাড়ি গুলো ফাঁকা ফাঁকা, সকলের বাড়িতেই বেশ কিছুটা বাগান মত রয়েছে।

এই রাস্তার ধারেই জামাইবাবুদের বাড়ি।

রিক্সা এসে থেমেছে বাড়ির সামনে। আশপাশে আরও কিছু বাড়ি—বাগান ফাঁকা মাঠ মত রয়েছে। ওদিকে গাছের আড়ালে একটা বড় পুকুরের কিছুটা দেখা যায় দূরে।

বিজয় জামাইবাবুদের বাড়িটাকে দেখছে।

রাস্তার থেকে পাশেই নয়ানজুলির উপর কাঠের পুল পার হয়ে সামনে বেশ কয়েকটা নারকেল গাছ ঘেরা বাগানমত, সামনের বাড়িটা মুলিবাশের তৈরী,

বেশ সুন্দর ছিম ছাম বাইরের ঘরের পিছনে বসত বাড়ি' ওটা পাকা পাঁচীল ঘেরা।

আর আশপাশেও মুলি বাঁশের তৈরী কিছু বাড়ি ঘরও রয়েছে। এখানের অনেক বাড়িই ওই ধরণের। সব মিলে বিজয়ের এই পরিবেশটাকে ভালোই লাগে। ওদের আসতে দেখে বাড়ি থেকে একটি তরুণ বের হয়ে এল।

জামাইবাবু বলেন—এ সুশীল। আমার ভাগে; এখানে থেকে পড়াশোনা করে। ওর সঙ্গে যাও।

বিজয়কে নিয়ে সুশীল বাড়ির ভিতরে চলে গেল।

বড়দি বিজয়ের জন্য অপেক্ষা করছিল। ওকে দেখে কাছে টেনে নিয়ে শুধোয়—বাবা মা পিসীরা আর সবাই ভালো আছেতোরে?

বিজয় জানায়—হ্যাঁ।

তবু বিজয় অবাক হয় বড়দি বৌদির কোন খবরই শুধোয়না। তাদের বাড়িতে যে একদিন আর একজন ছিল, এরা তাকে যেন ভুলতে চায়। বিজয়ের মনে হয় বড়দিও বোধ হয় বৌদির খবরটা জেনেছে।

বড়দি বলে—রাত ভোর ট্রেনে জেগে এসেছিস। জল টল খেয়ে স্নান সেরে খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়। আজ আর বৈরাগী দিঘীতে স্নান করতে যেতে হবে না, বাড়িতেই স্নান করে নিবি—

বিজয় এর ট্রেনের ধকলটা সত্যিই লেগেছিল। তখন বুঝতে পারে নি, কিন্তু স্নান খাওয়ার পর ঘুমে ডুবে যায়।

পরদিনও ঘুমের জের চলেছে। বৈকালে একটু সুস্থ বোধ করে।

সুশীল মামাকেও বিজয়ের ভালো লাগে। দেখছে তার পড়ার ঘরের আলমারিতে বইগুলো সাজানো। স্কুলের ভালো ছাত্র সে, শান্ত নম্র। সুশীল মামাই বৈকালে ওকে নিয়ে পাড়ার এদিক ওদিকে ঘুরতে বের হয়।

বিজয় দেখছে তার নোতুন পরিবেশকে।

অনেক বাড়ির বাইরে দু একটা করে কাঠের হেলান দেওয়া বেঞ্চও রয়েছে। বিকালে ওখানে মেয়েরা বসে গল্প গুজব করে।

ছেলের দল মাঠে খেলছে।

বিজয় এর ভালো লাগে এখানের প্রাণ উচ্ছল পরিবেশটাকে। সহজ মেলামেশার মাঝে দেখেছে সে আত্মীয়তার একটা উষ্ণ পরিবেশ। যদিও সে ওদের চেনেনা। তবু ভালো লাগে।

জামাইবাবুকে বোধ হয় বাবা চিঠিতে সবই জানিয়েছিলেন বিজয়ের সমন্ধে। এখান থেকে তাকে দূরে সরাবার কারণটাও। তাই বোধ হয় বিজয়ের উপর জামাইবাবু একটু বেশী নজর দিয়েছিলেন। বড়দিও।

জামাইবাবু বলেন—স্কুলে ভর্তি হতে হবে বিজয়। আজই যাবো। ওখানের

হেডমাস্টার মশায় আমাদের বাড়িতেই থাকেন, তাঁকেও বলে রেখেছি। দশটার পরই তৈরী হয়ে বের হতে হবে স্কুলে।

সহরের মধ্যে বেশ কিছুটা জায়গা নিয়ে গড়ে উঠেছে জেনকিনস্ হাইস্কুল। বিজয় দেখছে স্কুলটাকে। তাদের শহরের স্কুলের থেকেও অনেক বড়। বাড়িটাও সুন্দর। মাঠে ছেলেরা খেলা করছে। ঘণ্টা পড়তেই সকলেই যে যার ক্লাশে গিয়ে ঢুকলো, আরও অবাক হয় সে একমুহূর্তে সব কলরব থেমে গেছে। স্কুলের নিয়মকানুনও বেশ কড়া।

স্কুলের বাইরের গেট বন্ধ হয়ে গেল। দেরীকরে এলে স্কুলে ঢোকার জন্য অনুমতির দরকার, আর ক্লাশ পালানোও অসম্ভবই এখানে। বড় বারান্দা দিয়ে দুরু দুরু বুকে চলেছে বিজয় হেডমাস্টার মশায়ের ঘরের দিকে।

এমনি জাঁদরেল—নামী স্কুলে যে সে পড়তে পাবে কোন দিন তা ভাবেনি।

হেডমাস্টার মশায়ের ঘর খানাও বেশ বড়। ওদিকে আলমারীতে কি সব বই কাগজপত্র, বড় টেবিলের ওদিকে কি খাতাপত্র দেখছিলেন তিনি। জামাই-বাবুকে দেখে বলেন।

—আসুন!

বিজয় এর মধ্যে গিয়ে মাস্টারমশায়কে প্রণামও করেছে। এটা অবশ্য জামাইবাবু আগেই বলে দিয়েছিলেন। হেডমাস্টার মশায় বলেন।

—ছেলেটির রেজাল্ট তো দেখলাম। ট্রানসফার সার্টিফিকেটেও লেখা আছে ক্লাশ সেভেন এর উপযুক্ত ও নয়।

জামাইবাবু একটু ক্ষুন্নই হন।

কিন্তু হেডমাস্টার মশায় বলেন—একটা বছর নষ্ট হচ্ছে ভাবছেন, কিন্তু আমার মনে হয় ওতে ওর ভালোই হবে। এরপর মন দিয়ে পড়াশোনা করলে আর আটকাবেনা।

প্রবীন—বিচক্ষণ শিক্ষক তিনি। বিজয়েরও ভালো লাগে সৌম্য দর্শন ভদ্রলোককে। জেনকিনস্ হাইস্কুলে ভর্তি হওয়াই কঠিন। তবু পরিচিত বলেই তাঁরা বিজয়ের ব্যাপারটা বিবেচনা করেছেন। বিজয় সেইদিনই ভর্তি হয়ে গেল স্কুলে।

জামাইবাবু একজন প্রাইভেট টিউটারও ঠিক করেছেন।

বাইরের বাড়ির একটা ঘরে পড়াশোনার ব্যবস্থা হয়েছে। ওপাশের ঘরে সুশীলদা পড়াশোনা করে। ওখানেই থাকে সে। বিজয়কে বাড়ির ভিতরেই থাকতে হয়।

এ বাড়ির নিয়মও বেশ কড়া। দিদি—জামাইবাবু সেই নিয়ম গুলোকে যাতে সবাই মেনে চলে এটাও দেখেন। সন্ধ্যার আলো জ্বলবার আগেই ছেলেদের খেলা সেরে বাড়ি ফিরে পড়াশোনায় বসতে হয়।

কিছুক্ষণ পড়ার পর বাড়ির ভিতর থেকে খাবার ডাক আসে। রাতের খাবার পর আধঘণ্টা খানেক বাইরের বেঞ্চে, বাড়ির পাশের মাঠে আশপাশের বাড়ির ছেলেরাও আসে। একটু গল্পগাছার পর আবার যে যার বাড়ি ফিরে গিয়ে পড়াশোনায় বসে। রাত্রি দশটা নাগাদ পড়া সেরে শুতে যেতে হয়।

সকালে পড়াশোনা সেরে স্নান খাওয়ার পরই স্কুল।

তবে ওর মধ্যে স্নানের অবকাশ একটু মেলে।

বিজয়ও সুশীল মামার সঙ্গে তাদের পাড়ার ওদিকে বৈরাগী দিখীতে স্নান করতে যায়। নবাবগঞ্জের সেই পুরোনো অভ্যাসটাকে ভোলেনি সে। মহানন্দা নদীতে সাঁতার দিতে নামতো দল বেঁধে।

এখানে বৈরাগী দিখীতে স্রোত নেই, তবে বেশ বড় দিখী। জলও গভীর। বিজয় রোজই সাঁতার দিয়ে পারাপার হয়। পাড়ার সতা, চারু—ননী আর ও দুচারজনের সঙ্গে পরিচয়ও হয়েছে। বিজয় ক্রমশঃ নোতুন পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে। মনে হয় তার জীবনের সঙ্গে জলের একটা মিল আছে।

জলও বয়ে যায়, জীবনের মতই। বিভিন্ন পথ দিয়ে তার গতি। আর স্থির থাকলেও যখন যে পাত্রে রাখা যায় সেই পাত্রের আকার ও ধারণ করে। এখানে এসে বিজয়ও ক্রমশঃ সহজ স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে।

সাইকেল চালানো শিখে গেছে। মফঃস্বল সহর, বাজার দোকান একটু দূরে দূরে। জামাইবাবুও তাঁর নিজের ব্যবসাপত্র, কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত। বিজয় সাইকেল হাঁকিয়ে বাজার দোকানেও যায়। স্কুলের দু একজন বন্ধু থাকে অন্য পাড়ায়, সেখানেও যায়।

তবু বিজয়ের নিজেকে মাঝে মাঝে নিঃসঙ্গই বোধ হয়। সুশীলদা নিজের পড়া নিয়ে ব্যস্ত। এখানে অন্য ছেলেরাও পড়াশোনা করে। নবাবগঞ্জের সেই বাঁধন ছেড়া পরিবেশ, গুপী-নিপুদের মত বেপরোয়া বন্ধুও নেই। এখানে ওভাবে চলার উপায়ও নেই।

তাই বিজয়ও এখন অন্তর্মুখী হয়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে মনে পড়ে বাবার কথা। বাবাকে বলেছে সে—এবার ভালো ভাবে পড়াশোনা করবে। বৌদির চিঠিখানা এখনও আছে তার বই এর মধ্যে। এবার পরীক্ষায় ভালো ভাবে পাশ করতে পারলে সে বৌদিকে তার চিঠির জবাব দেবে।

বিজয়ের কাছে এ যেন অলিখিত একটা শপথ। নবাবগঞ্জের সেই পরিবেশ তার মনে এনেছিল নীরব বিদ্রোহের কাঠিন্য, এখানে এসে বিজয়ও বদলে গেছে। তার মনের সেই জ্বালাটা পরিণত হয়েছে কি এক কঠিন প্রতিজ্ঞায়। ভালো ভাবে পড়াশোনা করতেই হবে তাকে। আর সে হেরে যাবেনা, হারিয়ে যাবেনা কোন-দিনই।

পড়াশোনার জন্যই বড়দিকে বলে বিজয় সুশীল মামার ঘরেই থাকে রাত্রিতে। সুশীল মামাও তাকে নানা বই এর গল্প করে। গান্ধীজির আত্মকথা, কোন দূর আমেরিকার নিগ্রোজাতির এক কর্মবীরের গল্প শোনান। বুকার-টি-ওয়াশিংটন, দূর অজানা দেশের কথা। বিজয় এর মনে পড়ে বৌদির কথাগুলো। সেই গ্লোব আঁকা কত দেশের ম্যাপ।

আশীষের কথা মনে পড়ে। তার দাদা থাকেন জার্মানীতে। রাইন নদী, পাইনবন, তুষারাবৃত পাহাড়, দূর এ্যাটলাণ্টিকের পারে সেই আমেরিকার কথা মনে পড়ে। সুশীল মামা যেন তাকে হারানো দিনগুলোর মাঝে নিয়ে যায়। বিজয়ের মনের অতলের সুপ্ত বাসনাটাকে জাগিয়ে তোলে। বিজয় যেন নোতুন করে নিজেকে খুঁজে পায় আবার। পড়াশোনাতে ডুবিয়ে দিয়েছে নিজেকে।

কটা মাস কোনদিকে কেটে গেছে, পুজোর ছুটির পরই ফাইন্যাল পরীক্ষা। বিজয়ের কাছে এ যেন কঠিন এক অগ্নিপরীক্ষা। তবু তার অজানতেই আকাশের রং বদলায়। কালো মেঘপুঞ্জ সরে গিয়ে শরতের নীল আকাশ জেগে ওঠে। বাতাসে জাগে শিউলির সুরভি, বৃষ্টিধোয়া নারকেল, কলাগাছের পাতায় চাঁদের আলো উপছে পড়ে। বাতাসে পুজো পুজো ভাব জেগেছে।

স্কুলের ছুটি হয়ে গেছে, বিজয়ের হঠাৎ মনেপড়ে মায়ের কথা, মহানন্দার চরে এখন কাশফুলের মেলা বসেছে, ভরা নদীর বুকে পালতুলে কোন নৌকা উধাও হয়।

ক্ষেত্রদাকে আসতে দেখে চমকে ওঠে বিজয়।

বড়দি বলে—ক্ষেত্রদা, বিজয়কে পুজোর পরেই পৌঁছে দিয়ে যাবে কিন্তু, স্কুল খুললেই পরীক্ষা সুরু হবে।

অর্থাৎ বড়দিও যেন বিজয়কে বেশীদিন ছেড়ে থাকতে চায় না।

বিজয় বলে—না দিদি, দেরী হবে না।

মেজদা, সেজদা এখন কলকাতায় থেকে কলেজে পড়ছে। তারাও বাড়ি এসেছে, নানু নিতুরা এখানের স্কুলে পড়ে। পুজোর সময় বিজয়ও এসেছে বাড়িতে। মা ওকে কাছে টেনে নিয়ে মাথায় গায়ে হাতবুলিয়ে বলে, মন দিয়ে পড়াশোনা করছিস তো?

বিজয় দেখছে মাকে। বাবা যেন আজ দূরের মানুষ।

প্রণাম করতে তিনি ওকে সন্ধানী দৃষ্টিতে দেখে বলেন।

—ভালো ভাবে থাকবে ওখানে, সামনেই তো পরীক্ষা!

বিজয় চুপ করে থাকে। মনে মনে যেন তার শপথটাকে সে আবার স্মরণ করে। বলে সে—এবার রেজাল্ট ভালো হবে বাবা।

বাবা জবাব দিলেন না।

ক'মাসে তিনি যেন বদলে গেছেন। বিজয়ের মনে হয় সেও নিজে বদলে

গেছে। অজানতে এবাড়ি—এই নবাবগঞ্জ, এখানের বন্ধুদের কাছ থেকেও দূরে সরে গেছে।

তবু আশীষ-মলয়ের সঙ্গে দেখা হয়। গুপী-নিতাইদের সঙ্গেও। ওরা এখন বারোয়ারী পুজো নিয়ে ব্যস্ত। বিজয়ও যেন আগেকার সেই আকর্ষণটা হারিয়ে ফেলেছে। নবাবগঞ্জ তাকে বোধ হয় দূরে সরিয়ে দিয়েছে। এবাড়ির মানুষ গুলোও।

তাই বিজয়ের অন্তর্মুখী মন আজ নোতুন করে কুচবিহারের জীবনটাকেই ভালোবাসে।

পুজোর পরই ফিরে এসেছে কুচবিহারে। এবার পরীক্ষার জন্য তৈরী হতে থাকে।

শীতের আভাষ এখানে পুজোর সময় থেকেই পড়ে যায়। হিমালয়ের কাছেই। আকাশ পরিষ্কার থাকলে দেখা যায় নীল আকাশ কোলে মেঘছোঁয়া কাঞ্চন-জংঘার শিখর দেশ। একটা উচু প্রাচীর যেন উঠে গেছে আকাশের দিকে। কোন মেঘাছায়া তোরণের মত দাঁড়িয়ে আছে কাঞ্চনজংঘার শিখর, পেঁজা তুলোর মত বরফ – সেই বরফের উপর সকালের আলো সোনা—কখনও রুপার ঝলমলে বর্ণাভা আনে।

শীতও এসে যায় তখন থেকেই।

গ্রীষ্ম—বর্ষায় ফুটবল খেলে ছেলেরা।

শীতের দিনে সামনের মাঠে কোট করে সেখানে ব্যাডমিন্টন খেলে। হৈ চৈ করে কিছুক্ষণের জন্য।

বিজয়ও ওখানে এখন মিশে গেছে। ভুতু-চারু-ননী-সুশীল মামাদের সঙ্গে সে ও ব্যাডমিন্টন খেলে বৈকালে। সন্ধ্যা নামার আগেই এসে পড়তে বসে।

বাৎসরিক পরীক্ষা হয়ে যেতে ক'দিন ছুটি মেলে এবার।

তাদের বাড়ির ওদিকে রাম বাবুদের বাড়ি। এককালে ভদ্রলোকের অবস্থা ভালোই ছিল। বাড়িটাও বেশ সুন্দর. গেট দেওয়া—অনেকটা জায়গা জুড়ে নারকেল. আম-লিচু-জামরুল নানা ফল মূলের গাছ, এদিকে মাচায় শশা-কুমড়োও হয়। কিছু ফুলের গাছও আছে।

রামবাবুর তবু এ পাড়ায় বদনাম ছিল। ভদ্রোলোক নাকি খুবই কৃপণ স্বভাবের ছিলেন। তাই সকলেই আড়ালে রাম পোটকা বলেই ডাকতা। এখন রামবাবু বেঁচে নেই, তবু ওই নামটো বহাল হয়ে আছে। রাম পোটকার বাড়ি বল্লে এ তল্লাটে সবাই দেখিয়ে দেবে। রামবাবুর স্ত্রী অবশ্য ও ধরণের নয়। দুই মেয়েকে নিয়ে এ বাড়িতে থাকে। বড় মেয়ে রাণী ও এখানে মেয়েদের হাইস্কুল সুনীতি পাঠশালায় পড়ে।

ও পাশের লাগোয়া বাড়িতে ভাড়া থাকেন এখানের হাসপাতালের ডাক্তার মিঃ

দত্ত। অমায়িক সুদর্শন ভদ্র লোক। পাড়াতে ওকে বিশেষ দেখা যায় না, অধিকাংশ সময় হাসপাতালেই থাকেন। বাড়িটা দেখলেই নজরে পড়ে।

ছিম ছাম, সামনে একটু ফুলের বাগান মত। বারান্দায়, দু চারটে বেতের চেয়ার সাজানো। জানালা দরজায় কাজ করা রঙ্গীন পর্দা, বাড়িটাকে ঘিরে একটা বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে।

তার এদিকে উকিলবাবুর বাড়ি।

এপাশে খেলার মাঠে ব্যাডমিন্টন খেলে ছেলেরা। ওদিকে মেয়েরাও অনেকে দাঁড়িয়ে দেখে। মাঝে মাঝে ছেলেদের দলের কাউকে হারতে দেখলে মন্তব্যও করে তারা।

বিজয় ও দেখেছে ওদের। কিন্তু কি যেন লজ্জায় সেও গুটিয়ে যায়। মেয়েদের হাসির শব্দে তার হাত কেঁপে ওঠে, ফেদার বলটা সামনে এসেছে উচু হয়ে, তার পার্টনার ভুতো অন্য কোর্ট থেকে চীৎকার করে।

—চাপ মার! প্লেস করে দে—

কিন্তু বিজয়ের কানে আসে ওদের হাসির শব্দ। বলটা র‍্যাকেটে ঠেকাতেই পারে না। তার র‍্যাকেট গেছে অন্যদিকে বলটা এসে পড়েছে ওর নাকের উপরই।

তুমুল হাসির শব্দটা বিজয়ের কানে আসে।

ওই মেয়ের দল সমন্ধে চটে ওঠে বিজয়। ভুতো গজ গজ করে।

— কি করছিস বিজু? হেরে গোহারাণ হয়ে যাবি।

আজ ব্যাডমিন্টন ঠিক জমোনি।

স্কুলের বাৎসরিক পরীক্ষার রেজাল্ট বের হয়েছে। বিজয়ও স্কুলে গেছে। দুরু দুরু বুক কাঁপছে তার। এ যেন তার জীবন-মরণের প্রশ্ন? ক্লাশে নাম ডাকা হচ্ছে। বিজয়, চমকে ওঠে। প্রথম হয়েছে রমেণ।

ব্যানার্জি, তার পরই মাষ্টার মশায় ডাকছেন তারই নাম। বিজয় কুমার সাহা দ্বিতীয়।

বিজয় ভাবতেই পারে না। উঠে দাঁড়িয়েছে সে। ক্লাশের সব ছেলেদের দৃষ্টি তার দিকে। মাষ্টারমশায়ও দেখছেন তাকে। তারপর বাকী ছেলেদের নাম পড়ে যান।

বিজয় মার্কসিট নিয়ে এসেছে বাড়িতে।

জামাইবাবুও মার্কসিট দেখে খুশি হন। দিদি বলে।

—বাবা মাকে জানিয়ে দে বিজু। নিজে চিঠি লেখ! এবার নোতুন ক্লাশে উঠে আরও মন দিয়ে পড়াশোনা কর। এবার কিন্তু ফার্ষ্ট হতে হবে।

জামাইবাবু বলেন—এবার তো প্রাইজটা তোমাকে দিতে হয়। বিজয় চাইল।

আজ সেও খুশি হয়েছে। এবার থেকে আর পিছিয়ে পড়বে না সে। পড়াশোনা করতেই হবে। আজ বাবা খুশি হবেন। বিজয় পড়ার ঘরে।

এসে বাবাকে চিঠি লিখছে, শুধু বাবাকেই নয় আর একজনকেও আজ চিঠি দিতে হবে তাকে।

কোনদিনই বৌদিকে চিঠি লেখেনি। আজ মনে হয় এ যেন তার চিঠি নয়। বৌদিকেই সে জানাতে চায় হারিয়ে যাবে না তার বিজয়। সে জয়ী হবেই।

কুষ্টিয়ার ঠিকানাটা তার চিঠিতেই ছিল। বিজয় নিজেই বের হয়েছে বড় ডাকঘরের দিকে চিঠি দুটো পোষ্ট করতে।

ওদিকেই মেয়েদের স্কুল। ওদেরও রেজাল্ট বের হয়েছে। এ পাড়ার অনেক মেয়েকেই দেখেছে বিজয় খেলার মাঠের আশ পাশে। তাদের মধ্যে একজনকে তার নজরে পড়ে। ফর্সা রং-ধারালো নাক মুখ, চোখে বুদ্ধির দীপ্তি। ডাঃ দত্তের ভাই-এর মেয়ে। ওর দেশ দূরে কোথায় মৈমনসিং না কোন জেলার গ্রামে।

সাথী এখানে কাকার কাছে থেকে পড়াশোনা করে ?

মেয়েটিকে দেখেছে বিজয়। তার বন্ন মিস্ হলেই মেয়েটি হেসে ফেলে। কোনদিন কিছু মন্তব্যও করে।

—ব্যাডমিন্টন খেলতে পারে না ও, ডান্ডাগুলি খেলতে বলগে ওকে। বিজয়ের চাপা রাগ কিছুটা ছিল আজ ওকে স্কুল থেকে ফিরতে দেখে চাইল। সাথী পড়াশোনাতে ভালোই। কিন্তু এবার অঙ্কে কম নম্বর পাবার জন্য ষ্টান্ড করতে পারে নি। মনমেজাজ ভালো নেই। দল ছেড়ে একাই ফিরছে, বিজয় ওকে গম্ভীর দেখে বলে ওঠে।—পড়াশোনা না করলে এমনিই হয়। দিনরাত লোকের পিছনে ফুট কাটবে।

সাথী চাইল ওর দিকে। ওর ফর্সা মুখখানা রাঙ্গা হয়ে ওঠে। ব'লে সে —সেকেন্ড হয়েই এতো ? তবু যদি ফাণ্ট হতে পারতে।

আর পড়াশোনাতে আমিও খারাপ নই। স্পোর্টস' এ। নিজে তো ব্যাড-মিন্টনই খেলতে পারে না। খুব বোঝা আছে। বিজয় চাইল ওর দিকে।

সাথী কথা গুলো বলে চ'লে গেল ওদের বাড়ির দিকে। বিজয় থমকে দাঁড়ালো। হঠাৎ মনে হয় তার মেয়েটিকে ওভাবে কথাগুলো বলা ঠিক হয় নি।

কি অন্যায়, রাগের বশেই এতদিনের জমা ক্ষোভটাকে প্রকাশ করে ফেলেছিল।

বিজয় ডাকছে ওকে। ও যেন অনুতপ্ত সেই কথাটাই জানাতে চায়।

কিন্তু সাথী আর দাঁড়ায় নি। তাদের বাড়ির দিকে চলে গেছে রাগত ভাবেই।

বিজয় বোকার মত দাঁড়িয়ে থাকে। সারা মনে তার নীরব একটা অনুশোচনা। কিন্তু আর করার কিছু নেই। বাড়ির দিকে চলেছে সে। হঠাৎ মনেহয় তার এই খুশির দিনে সাথীকে ওই ভাবে আঘাত দিয়েছে, এই ভাবনাটা বিজয়ের মনে কাঁটার মত বিঁধে !

বৈকালে খেলার মাঠে ব্যাডমিন্টন খেলা সুরু হয়েছে। পাড়ার সব ছেলেই পাশ করেছে! কেউ বা ভালো রেজাল্ট করেছে? বিজয়ের সেকেণ্ড হবার খবরটাও ও জেনেছে সকালে। ওদের চোখে আজ বিজয়ের কদরও বেড়েছে। পাড়ার বয়স্কা মহিলারাও ছেলেদের স্নেহ করে। রামবাবুর স্ত্রী, তাঁর মেয়ে বাণীদিও বলে বিজয়কে। —ভালো রেজাল্ট করেছো শুনলাম। খুব খুশি হয়েছি।

খেলার মাঠে হৈ-চৈ চলেছে। মেয়েরাও ওদিকে বের হয়েছে। বিজয়ের চোখ আজ ওদের মাঝে বার বার একজনকে খুঁজছে। কিন্তু সাথীকে দেখা যায় না। আজ সে বের হয় নি।

বিজয়ের মনে সেই বেদনাটা যেন আরও তীব্রতর হয়ে ওঠে।

খেলাতেও মন বসে না। লাভ গেমই খেয়ে গেল।

চারু বলে—কি হয়েছেরে তোর?

বিজয়ও জানে না সেটা। এই বেদনা বোধ তার কাছে নোতুন। বলে সে —কি আবার হবে?

অন্য প্লেয়াররা তখন কোর্টে নেমেছে। বিজয় বের হয়ে আসে।

পরদিন সকালে বিজয় বের হয়েছিল বইএর দোকানে। সব বই একসঙ্গে পাওয়া যায় নি। তবু কিছু নোতুন বই নিয়ে ফিরছে। হঠাৎ বাড়ির ওদিকে ছায়াঘন পথ দিয়ে সাথীকে আসতে দেখে চাইল বিজয়।

সাথীও দেখেছে তাকে।

ওকে দেখে সাথী চোখ নামিয়ে না চেনার ভান করেই চলে যাচ্ছে। বিজয় বলে—শোনো!

সাথী দাঁড়ালো। গাছ গাছালির ফাঁক দিয়ে এক ফালি সোনা রোদ এসে পড়েছে ওর ফর্সা মুখে। পরনে ধানী রং শাড়ি। নরম মুখটায় হঠাৎ যেন একটি কাঠিন্য ফুটে ওঠে।

বিজয় বলে—কাল ওসব কথা বলা আমার ঠিক হয় নি। বলে আমার ও দুঃখ হয়েছিল।

সাথীর নরম মুখের মেঘের ফাঁকে যেন একটু হাসির আভাষ জাগে। কিন্তু সেটা তখুনিই মিলিয়ে যায়। বলে সে।—ও সব তোমার মনে হয় নাকি?

বিজয় আরও কিছু বলতে চায়। কিন্তু সাথী বলে।

—জুতো মেরে গরুদান নাই বা করলে।

কথাটা শুনে বিজয় চমকে ওঠে। ভেবেছিল সাথী তাকে ভুল বুঝবে না। কিন্তু তেজস্বী মেয়েটি ওদিকেই যায় না। বরং এমনি হৃদয়হীন ব্যবহারে চটে উঠেছে। বলে সে, —আর একটা কথা—

সাথী চাইল ওর দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে। বিজয় বলে।

—ব্যাডমিণ্টন খেলার সময় তুমি মাঠের ধারে কাছে আসবে না।

—কেন ? সাথীর কণ্ঠে কাঠিন্য ফুটে ওঠে। বলে সে—তোমার হুকুম !

বিজয় বলে—তুমি এলেই আমার খেলার গোলমাল হয়ে যায়। বলগুলো মিস্ করি। হেরে যাই—

সাথীর কঠিন মুখটা হঠাৎ কি যেন খুশীর আভায় ঝলমলে হয়ে ওঠে। বিজয় দেখছে ওকে। বাতাসে ভেসে আসে কনকে-বকুল ফুলের সুবাস। সাথী কিন্তু বদলায় নি। সংযত স্বরে বলে সে।

—খেলতে না জানলে অমন হবেই। খেলতে যে জানে তার কাছে হারা জেতার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

কথাগুলো বলে বিজয়িনীর মত ভঙ্গীতে সে চলে গেল।

বিজয় তখনও চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। তার মনের অতলের রাগটা বেড়ে ওঠে। ওই দর্পিতা মেয়েটিকে সেও এবার জানিয়ে দেবে ওর কোন তোয়াক্কাও বিজয় করে না।

সাথীও কিছুদিন ধরে বিজয়কে লক্ষ্য করেছে।

পাশাপাশি নাহলেও কাছাকাছি বাড়ি ওদের। এ পাড়ার সকলের খবর সকলেই রাখে। সাথীও জেনেছে ওর পরিচয়।

সাথীর বাবা নেই। দেশের বাড়িতে মা থাকে, সাথীকে আসতে হয়েছে পড়াশোনার জন্য কাকার এখানে। আর শুনেছে বিজয়ও বাবা মাকে ছেড়ে এখানে এসেছে।

দুজনের মধ্যে ঘর হারানোর একটা নীরব নির্জনতার মিল আছে। সাথী দেখেছে বুদ্ধিদৃপ্ত ওই ছেলেটিকে। খেলার মাঠেও দেখেছে ছেলেটিকে। অন্যদের মত নয়। অনেক সংযত। অকারণে ঝগড়া ও করে না। কোথায় যেন সাথীরও মনে হয়েছে ওর মতই নিঃসঙ্গ সে।

ওকে ভালো রেজাল্ট করতে শুনে খুশি হয়েছিল সে।

কিন্তু হঠাৎ ওইভাবে কথা বলতে দেখে সাথী দুঃখও পেয়েছিল। আজ বিজয়ের কথাতে মনে খুশী হয়েছিল সাথী। মনে হয়েছিল ভুলই বুঝেছিল বিজয়কে। সাথীর মনটাও কি দুঃখে ভরে ছিল।

কিন্তু আজকের বিজয়ের ওই ভাবে দুঃখ প্রকাশে খুশিই হয়েছিল সে। আরও খুশি হয়েছিল বিজয়ের ওই খেলার ব্যাপারে তাকে সরে থাকতে বলায়।

সাথী সদ্যজাগরণ কোন স্বপ্ন দেখা নিঃসঙ্গ মনে বিজয় বিচিত্র একটি সাড়া এনেছে। কিন্তু সাথীর সাবধানী মন বিজয়কে এই কথাটা জানতে দিতেও চায়নি। এ তার একান্ত গোপন একটি অনুভূতি, এ তার নিজস্ব একটি মনোরম স্বপ্ন-স্মৃতি। একে সে গোপনেই রাখতে চায়।

তাই সাথী নির্লিপ্ত উদাসীন ভঙ্গীতেই বলেছিল কথাটা। দেখেছিল বিজয়ের মুখের অসহায় ভাবটাও। বেশ মজাই পেয়েছিল সে।

পথের বাঁকে এসে সাথী চাইল, বিজয়কে দেখতে চায় সে, কিন্তু বিজয় তখন নেই। চলে গেছে। কি খুশিতে সাথী হাসছে। হঠাৎ তাদের বাড়ির কাজের মেয়ে বুলুকে দেখে চাইল। বুলু বলে—কোথায় গেছলা? মা খুঁজছেন—ইস্কুলে যাবে না?

সাথীর খেয়াল হয় দেরী হয়ে গেছে। সাথী বলে—চল।

বাড়ীর দিকে এগোলো সে।

সারা মনে সাথীর একটি বিচিত্র নোতুন সুর বাজে। এই সুরও এতদিন তার কাছে অজানা ছিল।

বিজয় নিজের জগতে হারিয়ে যায়।

এই বয়সে তার মন এখানে এসে অনেক কিছুই দেখেছে। জামাইবাবু বড় বইটা এনে দেন—নাও! তোমার প্রাইজ! সামনের বার ফাস্ট হতে পারলে আর একটা প্রাইজ পাবে।

রঙ্গীন মলাটের বইটা দেখে খুশি হয় বিজয়।

ওয়েবষ্টার ডিক্‌শনারী। ইংরাজী—বাংলা নানা প্রতিশব্দ মানে রয়েছে। এমনি একটা ডিক্‌শনারী পেয়ে খুশিই হয়েছে সে।

সুশীলমামা বলে—শুধু স্কুলের পড়া পড়লেই হবে না। বাইরের কিছু আউটসাইডের বইও পড়তে হবে।

সুশীল মামাই সঙ্গে করে নিয়ে যায় সাগরদীঘির পারে বিরাট লাইব্রেরী লান্সডাউন হল এ। বিরাট দিঘী। চারপাশে অনেক বড় বড় বাড়ি। কুচবিহারের মহারাজাদেরই নানা অফিস কাছারী ছিল এসব বাড়িতে। এখন মহারাজাদের সে সব বাড়িতে বহু সরকারী অফিস বসে।

আর এই ল্যান্সডাউন হল এখন জেলার সদর পাঠাগারে পরিণত হয়েছে।

হলঘরে বড় বড় টেবিল ঘিরে অনেক চেয়ার, সেখানে অনেকেই পড়াশোনা করছে। আর দেওয়াল ভর্তি আলমারী রকমারী বই-এ ঠাসা।

এত বই—এত বিভিন্ন বিষয়ের উপর এত বই এর আগে কোনদিন দেখেনি বিজয়। সাহিত্য—দর্শন—ইতিহাস—রাজনীতি প্রবন্ধ এসব লেবেল লাগানো সারবন্দী আলমারিতে সারা বিশ্বের মনীষিদের সারা জীবনের সাধনার ফল যেন সঞ্চিত হয়ে আছে। বিজয় অবাক হয়ে দেখছে।

তার মনে হয় পৃথিবীটা যেন অনেক ছোট হয়ে গেছে।

ফর্ম সই করে চাঁদা দিয়ে মেম্বার করিয়ে দিলেন তাকে সুশীল মামা।

বড় বড় খাতায় বই এর নাম, গ্রন্থকারের নাম—বই এর নম্বর লেখা আছে।

ওই নাম্বার দেখে ঠিক তার ফর্দ দেওয়া বইটাও এসে গেছে।

সুশীলমামাই বইটা পছন্দ করেছিলো ওর জন্য। রাশিয়ার বিখ্যাত লেখক লিও টলস্টয়ের 'অ্যানা ক্যারেনিনা।'

বিজয় বিশাল এক জগতে হারিয়ে গেছে। নবাবগঞ্জের সেই ছোট কিশোর যেন বহুপথ পার হয়ে রাশিয়ার মাটিতে চলে গেছে। দেখছে সেখানের জীবন, সেখানের মানুষ। সেই বরফ ঢাকা বিচিত্র দেশ, তাদের মানুষকে।

বিজয় সেই বই-এর মধ্যে হারিয়ে গেছে। মনে পড়ে বৌদির কথা। বৌদি বলতো।

—পৃথিবীটা অনেক ছোট হয়ে গেছে বিজয়। দেখবে তার মানুষকে সেই সব দেশকে। তবেই নিজের দেশকে ঠিক ভাবে চিনতে পারবে। এখানের মানুষকে ভালোবাসতে পারবে। সকলের জন্য কিছু করতে পারবে।

…বিমুগ্ধ মন নিয়ে একটি কিশোর সেই বিচিত্র জগতের অজানা পথে হারিয়ে যায়।

এমনি দিনে বাবার চিঠি আসে। বাবা তার পরীক্ষার খবর শুনে খুশী হয়েছেন। আর আসে বৌদির চিঠিও।

দিদি শুধোয়—কার চিঠিরে?

বিজয় জানাতে দিদির মুখটা যেন গম্ভীর হয়ে ওঠে। বেশ বুঝেছে বিজয় বড়দি খুব খুশি হয় নি।

কিন্তু খুশি হয়েছে বিজয়। তার বৌদি বাড়ি থেকে হারিয়ে গেলেও তার কাছ থেকে হারায় নি। দূরে থেকে কোন রাতের ধ্রুবতারা যেমন দিশাহারা নাবিককে অকূল সমুদ্রে পথ নির্দেশ করে, বৌদিও তার জীবনে তেমনি একটি ঠাঁই জুড়ে রয়ে গেছে।

বৌদি জানিয়েছে তার আশীর্বাদ। বলেছে—তার বিজয়কে জীবনের বৃহৎ ক্ষেত্রে কেউ আটকাতে পারবে না।

"বিজয়ের কাছে এ যেন পরম একটা নির্দেশ। কি আনন্দে, নির্ভয়ে তার দুচোখ বয়ে অশ্রু নামে।

বৌদিকে খুব দেখতে ইচ্ছা করে। কিন্তু কুষ্টিয়া অনেক দূর। তবু একদিন সে যাবেই সেখানে।

খেয়াল হয়, স্কুলে যেতে হবে।

এখন ফাস্ট বেঞ্চেই বসতে হয় স্কুলে। মাষ্টার মশায়দের নজর ও তার উপর। তাই সব পড়া, টাস্ক ঠিকমত করতে হয়। আর খুশি মনেই করে সে।

এখন শুধু স্কুলের শিক্ষক, সহপাঠীদের কাছে তার প্রতিষ্ঠার আসন বজায় রাখা ছাড়া বৌদির জন্যও মন দিয়ে পড়তে হবে। আর একজনের কথা মনে পড়ে।

সাথীকে ও দেখাতে চায় বিজয় সে কোনদিক থেকেই কম নয়। এরাই যেন আজ তাকে এগিয়ে যাবার অনুপ্রেরণা এনেছে।

বই রেখে স্নান করতে দৌড়ালো।

দেরী হয়ে গেছে। বৈরাগী দিঘীতে তখন দলের অনেকেই নেমেছে সাঁতারে।

বিজয়ও লাফ দিয়ে পড়লো জলে।

শীতের মরশুম চলে গিয়ে বসন্ত আসে।

শহরের বাইরে আশপাশে সেগুন—খয়ের গাছের পাতা ঝরে যায়। আবার আসে নোতুন পাতার গন্ধ। বাতাসে শীতের কাঠিন্য চলে গেছে। স্কুলের পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে বিজয় এখন লায়ব্রেরীতে বহু বইও পড়ছে।

মাঠে ব্যাডমিণ্টন উঠে গিয়ে এখন ফুটবল পড়েছে।

এখেলায় উত্তেজনা আরও বেশী। বিজয় পড়াশোনা শেষ করে মাঠে এসে নামে।

শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে এমন অনেক টিম আছে। তাদের মধ্যে শিল্ড-কাপ খেলাও হয়। এ পাড়ার মাঠে এখন তাদের ক্লাবের শিল্ড খেলা চলেছে। বিভিন্ন দলের মধ্যে খেলা হয়। বাছাই করা দল জিতে ফাইন্যালে ওঠে।

বিজয়দের ক্লাবের ফুটবল খেলায় শহরে সুনাম আছে। বিজয়ও ব্যাডমিণ্টনের চেয়ে ফুটবল ভালো খেলে।

তার নবাবগঞ্জের দস্যিপনা অন্য সব দিকে মুছে গেলেও একেবারে মুছে যায় নি। খেলার মাঠে নামলে শান্ত ছেলেটা একেবারে বদলে যায়।

ফরোয়ার্ড লাইনে খেলে বিজয়। আর দৌড়তে পারে ও খুব জোরে। ও বল পেলে প্রতিপক্ষের বিপদ ঘটিয়ে ছাড়বেই। স্কুলের টিমে ও খেলছে এখন। পড়াশোনা খেলাধুলোতেও পারদর্শী। দুটো জিনিষ একত্রে দেখা যায় না। কিন্তু বিজয়ের ক্ষেত্রে সেইটা সম্ভব হয়েছে।

শহরের মধ্যে এদের শিল্ড খেলার সুনাম আছে। অনেকদলই যোগ দেয়। এবার বিজয়দের টিম অনেক বাধা কাটিয়ে ফাইন্যালে উঠেছে। ওদিকে উঠেছে টাউন ক্লাব।

বিজয়ের বড়দিদি এসব ব্যাপারে একটু ভীতু। সে বলে—ওইসব সব্বোনেশে খেলা কেন করিস ?

জামাইবাবু শহরের সামাজিক অনেক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত। তিনি বিজয়কে নিরস্ত করেননি। আর দেখেছেন পড়াশোনাতেও বিজয় মন দিয়েছে। তাই বলেন স্ত্রীকে।

—আজকাল খেলাধুলোরও প্রয়োজন আছে। তুমি কেন বাধা দেবে ? খারাপ কাজ তো কিছু করেনি।

জামাইবাবু শুধোন—কি বিজয় এবার শিল্ড পাবে ?

বিজয় ও তা জানে না, বলে সে—দেখা যাক।

সারা শহর যেন ভেঙ্গে পড়েছে। মেয়েরাও খেলার মাঠের একদিকে ভিড় করে। এ পাড়ার বাণীদি, রমা, শিউলিরাও এসেছে সাথীও রয়েছে তাদের দলে।

বাণীদি বলে—এবার শীল্ড আমাদের পাড়ার ক্লাবই জিতবে। বিজয় যদি দু'একটা গোল করতে পারে—ব্যস!

বিজয়ের কথা উঠতে সাথী চাইল। সে মনে মনে এইটা চায়। প্লেয়ারদের মধ্যে সাথীর দু'চোখ যেন বিজয়ের দিকেই নিবদ্ধ। কেন জানে না সাথীর মনে হয় বিজয় জয়ী হোক এই সে সারা মন দিয়ে চায়। তার জয়ে সেইই খুশী হবে সব থেকে বেশী।

টাউন ক্লাবও প্রাণপণে খেলছে। বিজয়ের উপর তাদেরও নজর আছে।

দু'জন প্লেয়ার তাকে ঘিরেছে। বল পাবার কোন পথই রাখেনি।

ওদিকে টাউন ক্লাব একটা সুযোগ পেয়েই গোল করেছে। জয়ধ্বনি চীৎকারে সারা মাঠ ভরে ওঠে। চুপকরে গেছে এ পাড়ার সমর্থকরা।

…হাফটাইমের মধ্যে বিজয়দের টিম কোন গোলই করতে পারে নি। টাউনক্লাব ব্যূহ তৈরী করে গোল রুখছে। জিততে তাদের হবেই ফলাফল যেন ঠিক হয়েই গেছে। আবার খেলা সুরু হয়েছে। বিজয় এদিকে দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ বলটা সামনে পেতেই একজন প্লেয়ারকে কাটিয়ে তীব্রবেগে দৌড়ে গিয়ে গোলকিপারকে একটা ডজ করে বল সমেত গোলে ঢুকে যায়।

প্রথমে দর্শকরা ভাবতে পারেনি যে এই ব্যাপার ঘটবে। তার পরেই সারা মাঠ ফেটে পড়ে—গো—ওল!

…বাঁধভাঙ্গা জনতা খুশীতে লাফাচ্ছে।

বাণীদি বলে—বলিনি বিজয় ঠিক পথ করে নেবে?

জেতার আশা দেখে এবার এরা মরীয়া হয়ে খেলছে। টাউন ক্লাবও রুখে উঠছে, সমানে সমানে পাল্লা চলেছে। কোন পক্ষই গোল করতে পারেনি আর।

খেলা শেষ হবার মিনিট তিনেক আগে বিজয় বলটা পেতে দৌড় শুরু করে, টাউনক্লাবের দু'তিনজন প্লেয়ার দৌড়ে আসছে। বিজয় বলটা ভুতোকে দিয়ে নিজে এবার গোলের দিকে দৌড়ে যায়। ভুতো সট করতে বিজয় লাফিয়ে উঠে ব্যাক-ভলি করেছে, টাউন ক্লাবের একজন প্লেয়ার তার পা লক্ষ্য করেই বুট মেরেছে।

বলটা ওইভাবে গোলে আসবে গোলকিপার ভাবতে পারে নি। তাকে চমকে দিয়ে বলটা গোলে ঢুকে গেছে। জয়ধ্বনিতে ফেটে পড়ে সারা মাঠ।

ওদিকে অতর্কিতে লাথি খেয়ে ছিটকে পড়েছে বিজয়।

আর উঠতে পারে না।

সারা মাঠে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। বিজয়কে ধরাধরি করে তুলে এনেছে বাইরে। কে বরফ নিয়ে আসে তখুনিই।

চমকে ওঠে সাথী। ওই ভিড়ের দিকে চেয়ে থাকে সে। কে জানে বিজয়ের কি হল।

বাণীদি রমা সকলেই ক্ষুব্ধ। এ পাড়ার সমর্থকরাও। কিন্তু টাউন ক্লাবকে

মোক্ষম হার হারিয়েছে আজ বিজয়।

…একটু পরেই বিজয় উঠে দাঁড়ালো। চোটটা কিছুটা সামলেছে। ওদিকে পুরস্কার বিতরণ শুরু হয়েছে। বিজয়ই আজ টিমকে জিতিয়েছে আর খেলার বেষ্ট প্লেয়ারের পুরস্কার পেয়েছে সে। একটা শেফার্স ফাউটেনপেন।

ব্যান্ড বাজিয়ে জয়ধ্বনি করে শীল্ড নিয়ে তারা ফিরছে।

দূর থেকে সাথী দেখছে বিজয়কে। ওই শোভাযাত্রায় সেও চলেছে। তবে মনে হয় খুব ক্লান্ত। হাটতেও কষ্ট হচ্ছে।

…পায়ের ব্যাথাটা জোরই লেগেছে। তখন সামলে নিলেও রাতে ব্যাথাটা বেশ বেড়েছে। পায়ের গোড়ালিটা ফুলে গেছে। জামাইবাবু বলেন—ও কিছু না, তাহলে ডাঃ দত্তর কাছে একবার গিয়ে একটু দেখিয়ে এসো। আমি ওকে বলে যাচ্ছি।

ডাঃ দত্তের নাম শুনে বিজয় চমকে ওঠে।

সাথীর কাকা। ওদের পাড়াতেই থাকেন। বিজয়ের ওখানে যাবার কথা মনে করতে সাথীর কথা মনে পড়ে। কেমন ভয় করে।

কিন্তু জামাইবাবুর নির্দেশ অমান্য করার উপায়ও নেই। বাধ্য হয়েই বিজয়কে আসতে হয়েছে।

ডাঃ দত্ত বেলা দশটা নাগাদ হাসপাতালে গিয়ে ঢোকেন, ফেরার সময়ের ঠিক নাই। সাথী ওদিকের ঘরে বসে পড়ছিল। সাইকেল রিক্সা থেকে নেমে বিজয়কে কোন মতে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে আসতে দেখে চাইল। চোটটা ভালোই লেগেছে নাহলে ওদের বাড়ি থেকে এইটুকু পথ সাইকেল রিক্সায় আসতো না।

সাথী দেখছে বিজয়কে ঘর থেকে। কাল ওভাবে নিজেকে বিপদের মধ্যে ফেলে টিমকে জেতাবার ব্যাপারটাকে সাথীর ভালো লাগেনি। সাথীরও ভয় করেছিল খুবই। আর রাগও হয়েছিল।

আজ এইভাবে ওকে আসতে দেখে যেন সাথী মনে মনে খুশীই হয়েছে।

ডাঃ দত্তও বিজয়কে চেনেন। কাল ওর খেলার কথা শুনেছেন।

ওকে আজ আসতে দেখে বলেন।

—কি ব্যাপার? পায়ে লেগেছে না? এসো দেখি কি হ'ল আবার?

বিজয়ের পাটা ভালো করে দেখেন তিনি টেনে টুনে, বিজয়ের যন্ত্রণা করছে। ডাঃ দত্ত বলেন।

—নাঃ ভাঙ্গে নি! তবে চোট লেগেছে। ওষুধ দিচ্ছি আনিয়ে নিও।

ব্যান্ডেজটা এই ওষুধ দিয়ে ভিজিয়ে রাখবে। কাল একবার দেখবো। মনে হয় এতেই সেরে যাবে।

বিজয় প্রেশক্রিপসনটা নিয়ে ফিরছে।

ওদিকে গলিপথে ছায়া নেমেছে। সাথীকে দেখে চাইল বিজয়।

সাথী বলে—কি হল বীর পুরুষের ?

বিজয় দেখছে ওকে। ফর্সা সুন্দর মুখে কি যেন তীক্ষ্ম হাসির আভা।

খোপাটা ফর্সা ঘাড়ের উপর ভেসে পড়েছে। বিজয় বলে।

—পায়ে লেগেছে কাল!

সাথীর মনের সেই উৎকণ্ঠা আজ যেন রাগেই পরিণত হয়। বলে সে!

—টিমকে জেতাতেই হবে। তারজন্য পা কেন প্রাণটাও দিতে তৈরী ছিলে। এখন যন্ত্রনা সইতে কষ্ট কেন 'হিরোর ?'

বিজয়কে যেন ব্যঙ্গই করছে সাথী। বিজয় বলে কঠিন স্বরে।

—জিততে হলে এসব সহ্য করতেই হবে। এসবকে ভয় করি না।

—তাই নাকি! মা বাবা তো এখানে নেই—পাটা ভাঙ্গলে কি হতো ?

সাথীর কণ্ঠে তার অজ্ঞানাতেই উৎকণ্ঠার সুর জাগে। বিজয়ের ওসব দিকে নজর দেবার সময় নেই। বলে সে।

—তোমাকে দেখতে হতো না নিশ্চয়ই। এত ভাবনা কেন ?

বিজয় কথাগুলো বলে চলে গেল কোনমতে। সাথী ওই ছায়াঘন পরিবেশে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। বিজয়ের জন্য উৎকণ্ঠা—ভয়ই হয়েছিল তার।

কিন্তু বিজয় তার কোন স্বীকৃতিই দেয় নি।

নীরব অভিমানেই সাথীর মন ভরে ওঠে। বিজয়ের সঙ্গে কথাই বলবে না আর। ওই ডাকাবুকো ছেলেটা যা খুশী করুকগে, সাথীর ওর জন্য ভাবতে বয়ে গেল।

বর্ষার মেঘ নেমেছে আকাশ ছেয়ে।

বর্ষাটা এখানে জাঁকিয়ে আসে। বৈরাগী দিঘী ছাপিয়ে ওঠে। নয়ানজুলিতে যেন বান ডাকে। ধূসর পাংশু আকাশ থেকে বৃষ্টি ঝরেই চলেছে।

...বর্ষার পর আসে শরৎ।

এখানে প্রতিটি ঋতুর নিজস্ব রূপটি সুন্দরতর হয়ে ফুটে ওঠে।

শরৎ মানে পুজোর অবকাশ। কালো মেঘ মুছে গিয়ে নীল আকাশ দেখা যায়। বাতাসে ওঠে শিউলির সজল মিষ্টি সুবাস, চাঁদের আলো উছলে পড়ে বৃষ্টি ধোয়া নারকেল-কলা গাছের পাতায়।

এই সময় নষ্ট চন্দ্রের উৎপাত শুরু হয়। শুক্ল পক্ষের বিশেষ কোন তিথিকে কেন্দ্র করে একটা রাত্রি যেন কিছু লোকের কাছে আতঙ্কের, উৎপাতের রাত্রিতে পরিণত হয়।

সকলের বাড়িতেই বাগান যত আছে ফলফুল শাকসব্জীতো হয়ই। আর এই রাত্রে পাড়ার দুরন্ত ছেলের দল গোপনে এই কাণ্ডটা করে।

রাম পোটকার বাগানে নারকেল—শবরী কলা-জামরুল গাছগুলো ফলে ভরে আছে। ওর স্ত্রী আর বাসীদি নিজেরা চেষ্টা করে কুমড়ো-শশা-পেঁপে গাছ ও

করেছে। ওদিকে নবীন উকিলবাবুর বাগানে প্রচুর ফল হয়।

রাত্রির অন্ধকার আবছা চাঁদের আলোয় ভরে গেছে। রাত্রে হঠাৎ সাথীর ঘুম ভেঙ্গে যায়। কারা যেন তাদের বাড়ির পাশেই রাম পোটকার বাগানে ঢুকে নারকেল পাড়ছে, কলার কাঁদিও দুটো নামালো সে দেখে। ওদিকে শশার মাচা থেকে শশা তুলছে।

সাথী এদিকের ঘরে থাকে।

মনে হয়েছিল চোর ডাকাতই পড়েছে। কিন্তু সাবধানী মেয়েটা জানলার ফাঁক দিয়ে বাগানে ওই সখের চোর ডাকাতদের দেখে একটু অবাক হয়।

ভুতো চারু আরও কারা নিঃসাড়ে বাগানে ওইসব করছে। আরও অবাক হয় সাথী ওদের দলপতিকে দেখে, বিজয় একটা কালো হাফ প্যাণ্ট হাফ সার্ট পরে নারকেল গাছ থেকে ডাব নামাচ্ছে।

নিঝঝুম নিস্তব্ধ রাত্রি।

ওদিকের বাড়িতে কেউ এদের কীর্তি কাহিনীর কথা টের পায়নি। বাণীদিরাও অসাড়ে ঘুমুচ্ছে। তাদের বাড়ির সকলেই নিদ্রামগ্ন।

এই অবকাশে বিজয়ের দলবল ওই কাজ সারছে। সাথী চীৎকার করতে গিয়ে কি ভেবে থেমে যায়।

বিজয়রা কাজ শেষ করে তাদের পাঁচিল টপকে বের হয়ে গেল অন্য কারোও বাগানের দিকে।

সাথী বের হয়ে আসে, দেখে তাদের পাঁচিলের পাশে কি একটা পড়ে আছে, চাঁদের আলোয় চক্ চক্ করছে সেটা। সাথী তুলে নিয়ে দেখে একটা ফাউণ্টেন-পেন।

ঘরে এনে আলোয় দেখে অবাক হয়—সেফার্স পেন! এইটা বিজয় সেদিন খেলায় প্রাইজ পেয়েছিল। কলমটা ড্রয়ারে রেখে দিল সে। ওর মুখে বিজয়ীর হাসি ফুটে ওঠে। এবার দেখবে সে বিজয়কে।

সকলেই সারা পাড়ায় কলরব সুরু হয়ে যায়।

নবীন উকিল এর চেহারাটা পাট কাঠির মত শীর্ণ, কিন্তু এজলাসে সওয়াল করে গলাটা বেশ ভরাটি হয়ে উঠেছে। নবীন উকিল লাফাচ্ছে, কেস করবো। মানহানির কেস, কমপেনসেসন কেস! বাগানের কলা, পেপে শেষ করেছে, আর এই ভাবে ইনসাল্ট করবে? দেখুন আপনারা—সাক্ষী রইলেন। আমি কোর্টেই দেখবো এবার।

নবীন উকিলের সাইনবোর্ড খানা নেই, সেখানে লাগানো রয়েছে 'বিভূতি সেলুন' উত্তম রূপে চুল দাড়ি কামানো হয়, আসুন।

সাথীও অবাক হয়।

তার ডাক্তার কাকার সাইন বোর্ডখানা অদৃশ্য হয়ে গেছে। সেখানে লাগানো

রয়েছে 'অন্নপূর্ণা মিষ্টান্ন ভাণ্ডার'। বাগানের তার সখের গোলাপ ফুলগুলো একটাও নেই।

ওদিকে রামবাবুর বাড়িতে তখন চীৎকার চলছে।

বাণীদির মা বলে ডাব, কলা, পেঁপে মায় মাচার কুমড়ো সব গেছে। কারা করেছে বের করতেই হবে? যত সব চোর ডাকাত তৈরী হচ্ছে পাড়ায়।

থানায় যাচ্ছি। ডাইরী করে আসবো।

বিজয়ের বড়দির বাগানেও কারা কলা, ডাব, বড় বড় পেপেগুলোকে কেটে রেখে গেছে।

বাদ কেউ যায়নি ওদের অত্যাচার থেকে।

জল্পনা কল্পনাও হয়। বাণীদি বলে।

—ও পড়ার নন্দী, মদনদের কাজ।

নবীন উকিল চুল দাড়ি কাটার সাইন বোর্ডটা ছুড়ে ফেলে শাসায় – পুলিশ ঠিক বের করবে। আজই কেস ফাইল করে ওদের ঘানি টানাবো। সব কটাকেই ধরছি এবার।

কিন্তু অপরাধীদের সামনে কেউ দেখে না। আজ খেলার মাঠেও কাউকে দেখা যায় না সকালে। সাথী জানে এসবের দলপতি কে? কিন্তু কাউকেই বলেনি সেকথা। নিজের গোলাপফুল নষ্ট করার রাগটা তবু রয়েছে তার মনে। বৈরাগী দিঘীতে চান করতে যায় ছেলেরা। সাথী ওদের পথ চেয়ে আছে। কিন্তু অবাক হয় আজ বিশেষ কেউ বৈরাগী দিঘীর দিকেও যায় নি। সবাই যেন হঠাৎ ভালো ছেলে হয়ে লেখা পড়ায় মন দিয়েছে।

বিজয়দের কাছে সব খবরই পৌচেছিল। নবীন উকিল অবশ্য কোর্টকাছারি করে নি। অন্নপূর্ণা মিষ্টান্ন ভাণ্ডার তার সাইন বোর্ড ফিরে পেয়েছিল। কিন্তু ডাব-কলাগুলো নষ্টই হয়ে গেছল।

বাণীদির মা সেদিন খেলার মাঠে আবার দলবলকে উপস্থিত হতে দেখে বলে—খাবার ইচ্ছা হয়েছিল বললেই তো হতো। এভাবে ফলমূল নষ্ট করে লাভ কি?

অবশ্য এরা নীরবই ছিল। আবার খেলা শুরু হয়।

বিজয় সন্ধ্যার আগেই বাড়ি ফিরছে, ওদের গলিপথটা এমনিতেই নির্জন। হঠাৎ সাথীকে দেখে চাইল।

সাথী আজ ওদের খেলার মাঠে দেখে নজর রেখেছিল বিজয়ের উপর। ওই দুষ্টু দুরন্ত ছেলেদের সঙ্গে মিশে বিজয়ও যে এইসব কাজ করবে রাতের অন্ধকারে তা ভাবতেও পারেনি সাথী।

তাই সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। আজ বিজয়কে দেখে শুধায়।

—সেদিন রাতে তুমি নষ্টচন্দ্র করোনি?

বিজয় বেপরোয়া হয়ে ওঠে, মাঝে মাঝে তার আগেকার সেই দুরন্ত স্বভাবটা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। বলে বিজয়।

—না! ওসব কেন করবো? এভাবে ক্ষতি করা অন্যায়।

সাথীর সুন্দর নরম মুখখানা কঠিন হয়ে ওঠে। বলে সে।

—তাই নাকি? মিথ্যা কথা বলতে এতটুকু বাধলোনা আমার সামনে?

সাথী আশা করেনি বিজয় তার সামনে ও মিথ্যা কথা বলবে।

বিজয় কিছু বলার আগে সাথী ওর হারানো কলমটা বের করে বলে।

—এটা তোমার পকেট থেকে সেদিন আশাদের পাঁচিল টপকাতে গিয়ে পড়েছিল! এইটাই তো প্রাইজ পেয়েছিলে। তোমার কলম?

চমকে ওঠে বিজয়।

কলমটা সে দিন রাত্রে হারিয়ে গেছল। দুঃখও পেয়েছিল। কিন্তু কাউকে জানাতে পারেনি। আজ কলমটা সাথীর হাতে দেখে চমকে ওঠে। মনে হয় ওটা হারিয়ে গেলেই ভালো হতো। এমনি ভাবে সাথীর সামনে হাতে নাতে ধরা পড়তে হতো না।

সাথী দেখছে বিজয়কে। ওর মুখ চোখ বিবর্ণ হয়ে গেছে।

সাথী বলে—আমার গোলাপ গাছ গুলোকেও নষ্ট করেছো। যদি সে দিন তোমার নামটা নবীন উকিল মশায়কে বলতাম কি হতো জানো?

কি কাণ্ড হতো তা অনুমান করতে পারে বিজয়। জেলেই পাঠাতো নবীন উকিল যা রেগেছিল। বিজয়ের এখানের পাটও উঠে যেতো। ভাবতে পারেনা বিজয়।

সাথী তাকে একটা চরম সর্বনাশের হাত থেকেই বাঁচিয়েছে। সাথীর ওই শাসনকর্ত্রীর ভূমিকাটা বিজয়ের কাছে আজ বিচিত্র বোধ হয়। সাথী বলে।

—নাও, দামী কলমটা এভাবে চুরি ডাকাতি করতে গিয়ে হারিয়ো না। আর ওসব কাজে যাবে না।

বিজয় অপরাধীর মত কলমটা নিয়ে বলে আমতা আমতা করে—সেদিন ওরা বললো—

সাথী শোনায়—ওরা বললে তাই চুরি করবে? লোকের ক্ষতি করবে? লোকের জন্য কিছু উপকার করার কাজ করো এসব না করে।

বিজয়কে এভাবে জ্ঞান দিতে দেখে বিজয়ও চটে উঠেছে। কিন্তু সাথীকে কিছু বলতে পারে না। বিজয়ের একটা গোপনতম দুর্বলতার খবর জেনে ফেলেছে সাথী।

বিজয় মাথা নীচু করে সরে এল।

কিন্তু আড়ালে এসে বিজয় অসহায় ক্ষোভে ফুঁসতে থাকে। সাথীর কাছে ধরা পড়ে গিয়েছে সে। ওর কাছে কৃতজ্ঞ।

তবু ভয় হয়, কে জানে যদি কোন দিন কারোও কাছে এ খবরটা প্রকাশ করে দিয়ে বিপদে পড়বে বিজয়।

তাই মনে হয় ওই মেয়েটিকে একটু এড়িয়ে চলাই সঙ্গত।

কিন্তু মনের অতলে এটা ভাবতেও কষ্ট হয় বিজয়ের।

দু চারদিন জোর করে সরে থাকার চেষ্টা করেছে বিজয়। খেলার মাঠে যেতে হয়। দেখেছে বিজয় সাথী ঠিক ওই সময়ই ওদের বাড়ি থেকে বেরু হয়ে মাঠের ধারে আসবে।

আর ওর শাল, ব্লাউজ, হলুদ শাড়ি পরা উজ্জ্বল দেহ-সুন্দর মুখের দিকে বিজয়ের দৃষ্টিটা বার বার যেতে চায়। কি যেন একটা নিবিড় আকর্ষণই বোধ করে বিজয়।

তবু খেলার শেষে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে পড়তে বসে। পুজোর আগে সেকেণ্ড টার্মিনাল পরীক্ষা। তারপরই কিছুদিনের জন্যে বাড়ি চলে যাবে।

সাথীর মুখোমুখি হতে হবে না।

সাথীও লক্ষ্য করেছে সেটা।

তবু খুশি হয়েছে সাথী। বিজয় ওই দুরন্ত ছেলেদের বেশ এড়িয়ে চলে। সন্ধ্যার আগেই বাড়ি ঢুকে পড়তে বসে। মনে মনে হাসে তীক্ষ্ণধী মেয়েটি। খুশিই হয়েছে সে বিজয়ের উপর তার প্রাধান্য বিস্তার করতে পেরেছে ভেবে।

পুজোর ছুটি এসেছে, আবার চলে গেছে।

বিজয় এখন নিজেই একা একা ট্রেন বদলি করে বাড়িতে আসতে পারে। ক্ষেত্রদাকে আর যেতে আসতে হয় না। বিজয়ও নিজে এবার নিজের পথ চলতে পারছে, বিজয়ও খুশী হয়।

ছুটির পর আবার কুচবিহারে ফিরে এসেছে বিজয়। এখন এই শহরকেই ভালো লাগে তার। চাপাই নবাবগঞ্জের যেন সে একজন অপরিচিতই।

আর বাবাও নানা কারণে নবাবগঞ্জের কাজ কারবার গুটিয়ে ফেলে পাশেই ভারতের মধ্যে মালদহ সহরে বাড়ি কিনেছেন।

আশীষ-মলয়রাও চলে যাচ্ছে মালদহেই। কারণ নানা রাজনৈতিক পরিস্থিতির জন্য নবাবগঞ্জের পরিবেশও বদলাচ্ছে। তাই বাবা মালদহ, বারহারোয়া অঞ্চলে বাড়ি জমি করেছেন।

নবাবগঞ্জ বিজয়ের কাছে তার সব আকর্ষণ হারিয়েছে। তাই বিজয় কুচবিহারের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে।

জামাইবাবু সহরের অনেক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত। বিজয়ও তাই রেডক্রশ, বয় স্কাউট দলে ভর্তি হয়েছে এখানে।

পাড়ার খেলার মাঠ থেকে সে সহরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে এসেছে। থাকি

পোষাক পরে ড্রিল করতে হয়।

সাথীও দেখেছে তাকে খাকি ইউনিফর্ম পরে ফিরতে। কিন্তু দেখেছে সাথী বিজয় যেন তাকে দেখেও এড়িয়ে গেছে। বিজয়ের মনে সেই আতঙ্কটা এখনও মুছে যায় নি।

সাথী চুপ করে দেখে মাত্র। ক'দিন এপাড়ার খেলার মাঠেও আসেনি বিজয়।

...কালীপুজোর সময় নিউ টাউনের রামকৃষ্ণ মিশনে ধুমধাম করে পুজো কীর্তন ভোগরাগ হয়। দুদিন ধরে বিরাট উৎসব চলে। শহরে আশপাশের গ্রাম থেকে হাজার হাজার লোকজন আসে। মেলাও বসে যায়।

রেডক্রশ থেকে ওই মেলায় সেবার কাজ করা হয়। ভলেনটিয়ারও থাকে অনেক। ওখানে রেডক্রশের ক্যাম্পও বসে। বিজয় ক'দিন ওখানে ডিউটি করছে রেডক্রশ ক্যাম্পে।

টুকটাক দুর্ঘটনা—এটা সেটা ঘটেই। হারিয়ে যায় কোন বাচ্চা, তারজন্য মাইকে ঘোষণা করা হয়।

ব্যস্ততা লেগেই থাকে।

সেদিন দুপুরে হঠাৎ মিশনের অধ্যক্ষ মধুমহারাজকে আসতে দেখে চাইল বিজয়।

মধু মহারাজ বলেন—ওদিকের প্যাণ্ডলে একজন ভদ্রমহিলা দু'একবার জ্ঞান হারিয়েছেন। আমার ভালো ঠেকছে না। ডাঃ দত্ত বললেন তুমি বাড়ি থেকে ওর ডাক্তারী ব্যাগটা নিয়ে এসো এখুনি। সাইকেল নিয়ে চলে যাও!

ডাঃ দত্তও এসে পড়েছেন। তিনি একটা স্লিপ লিখে দিয়ে বলেন—বাড়িতে এটা দেখালেই ব্যাগ দিয়ে দেবে। দেরী করোনা। যাবে আর আসবে। কুইক!

বিজয় স্লিপটা নিয়ে দেখে ওটা সাথীকেই লিখেছেন তিনি। একটু ঘাবড়ে যায় বিজয়। ওদিকে এক ভদ্রমহিলার প্রাণ সংশয়ের প্রশ্ন জড়িত। যে ভাবে হোক কার্য উদ্ধার করেই চলে আসবে বিজয়।

তাই দৌড়লো সে সাইকেল জোরে হাঁকিয়ে।

বুকটান ধরে। তবু প্যাডেল করার বিরাম নাই। তার আসা যাওয়ার উপর একজনের বাঁচা মরা নির্ভর করছে।

দুপুরের স্তব্ধতা নেমেছে বাড়িতে।

সাথী আর কাজের মেয়ে বুলু বাড়িতে রয়েছে। কাকীমা গেছেন রামকৃষ্ণ মিশনে কাকার সঙ্গে। সাথী বাড়ি পাহারা দিচ্ছে।

হঠাৎ কলিং বেলটা বেজে উঠতে সাথী চাইল। মনে হয় কাকীমা ফিরেছেন।

সাথী দরজা খুলেই সামনে খাকি পোষাক পরা গলদঘর্ম অবস্থায় বিজয়কে দেখে অবাক হয়। এসময় বিজয় খালি বাড়িতে আসবে তা ভাবেনি।

অস্ফুট স্বরে বলে সে—তুমি ! এসময়, এখানে ?

বিজয় চমকে উঠেছে। নির্জন দুপুরে এভাবে সাথীকে দেখবে তা ভাবেনি। সদ্যস্নান সেরেছে ও, পিঠ ছাপিয়ে পড়েছে একরাশ কালো চুল। মুখে সদ্যস্নান করার স্নিগ্ধতা, যেন শীতের শিশির ভেজা গোলাপফুলের কমনীয়তা ওর মুখে, দীঘল চোখের পাতায়। দুচোখে ওর বিস্ময়, কালো চোখের তারায় অথৈ সাগর দিঘীর রহস্যময়তা, ওকে ঘিরে জেগে আছে মিষ্টি একটি সুরভি।

বিজয়ের সদ্যজাগার মনে কি যেন ঝড় ওঠে। সেই এড়িয়ে থাকার ভয়ও তুচ্ছ হয়ে গেছে তার কাছে।

সাথীও বিজয়কে এখানে দেখে চমকে উঠেছে। দুচোখে তার বিস্ময়, হয়তো কাছে পাবার আকুতি। বিজয় তাকে এড়িয়ে থাকতে পারেনি, এযেন সাথীর কাছেও একটা জয়ের প্রতীকই।

দুজনে চেয়ে আছে দুজনের দিকে। সব ভাষা স্তব্ধ হয়ে গেছে তাদের। বিজয় ভাবতে পারেনি যে এমনি করে সেও সাথীকে সারা মন দিয়ে কাছে পেতে চেয়েছিল।

হঠাৎ খেয়াল হয় সাথীর। বলে সে।

—বসো। ঘেমে নেয়ে গেছো। জল আনি তোমার জন্য !

বিজয়ের এবার চমক ভাঙ্গে। কতক্ষণ সে চেয়েছিল জানে না। বিজয় বলে।

—বসার সময় নেই। তোমার কাকা স্লিপ দিয়েছেন, এখুনি ওর মেডিক্যাল ব্যাগ নিয়ে দৌড়তে হবে। এক ভদ্রমহিলা ওখানে খুব অসুস্থ ! ব্যাগটা দাও—

বুলু এর মধ্যে ব্যাগটা এনেছে। সাথী বলে।

—জলও খাবে না ?

বিজয় ব্যাগটা নিয়ে সাথীর সেইদিনের কথাগুলোই বলে।

—অন্যের উপকার করতেই চাই সাথী, তারজন্য নিজের কথাও অনেক সময় ভাবার উপায় থাকে না। চলি—

ব্যাগটা নিয়ে বিজয় সাইকেলে উঠে জোরে প্যাডেল করে বের হয়ে গেল।

সাথী তখনও দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ওর দিকে চেয়ে থাকে। আজ ভালো লাগে তার বিজয়কে। ওর চোখের তারায় যেন সাথী নিজের অস্তিত্বকেই নিবিড় করে খুজে পেয়েছে। তার কুমারী মনে কি বিচিত্র একটি সুরের অনুরণন জাগে।

বুলুর ডাকে খেয়াল হয় সাথীর ? বুলু বলে—ভিতরে যাবে না দিদি ?

—হ্যারে ! সাথী দরজা বন্ধ করে ভিতরে গেল।

কোথায় সাথীর নিঃসঙ্গ শূন্যমন কি পূর্ণতার স্বপ্নে ভরে ওঠে।

পড়াশোনার চাপ পড়েছে।

সামনে পরীক্ষা। বিজয়ও পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত। এবার ফার্স্ট হতেই হবে তাকে। সাথীর কথা মনে পড়ে। সেই ঘটনার পর আর তেমন দেখা হয় নি। তবু বিজয়ের সামনে যেন দুটি মেয়ে কি আশ্বাস এনেছে।

বৌদি আর সাথী।

ওদের খুশী করার জন্যই বিজয়কে এবার আরও ভালো রেজাল্ট করতে হবে।

পড়ছে সে, হঠাৎ পড়ার ঘরে সাথীদের বাড়ি থেকে বুলুকে আসতে দেখে চাইল বিজয়।

—কি রে?

বুলু একটা কাগজ এগিয়ে দিয়ে বলে।

—সাথীদি পাঠালো।

চমকে ওঠে বিজয়। সাথী কোনদিন চিঠি দেয় নি তাকে। শুনেছে বটে অনেক বন্ধুদের কাছে মেয়েদের চিঠি দেবার ব্যাপারটা।

আজ তাই কাগজটা পেয়ে বিজয়ের বুক কি অজানা আনন্দ, আতঙ্কে কেঁপে ওঠে।

পড়তে থাকে।

কয়েক লাইন মাত্র লিখেছে সাথী। ওর সংস্কৃত গ্রামার আর উপক্রমণিকা বইটা হারিয়ে গেছে। যদি ওর বইটা ধার দিতে পারে খুশী হবে সে।

খুশি হয় বিজয়।

সাথী তার দরকারে বিজয়ের কাছে সাহায্য চেয়ে যেন বিজয়কে ধন্য করেছে। সংস্কৃত উপক্রমণিকা তার দুটো আছে। সুশীল মামার পুরোনো বইটাও রয়েছে। সুতরাং তার কোন অসুবিধাই হবে না।

বিজয় বইখানা দিয়ে নিজেও একটা কাগজে লিখে দেয়—এটা কাছে রাখতে পারো। আমার অন্য বই আছে। বুলু চলে গেছে বই নিয়ে। বিজয় তখনও দেখছে সাথীর চিঠিখানা।

ওর হাতের নিবিড় স্পর্শ মাখানো ছোট কাগজটাকে ফেলতে গিয়েও পারে না।

এটা যেন তার কাছে একটা পবিত্র স্মরণ চিহ্ন।

বিজয় ওটাকে কাছে রেখেছিল সঙ্গোপণে, বৌদির চিঠির সঙ্গে।

দুটি নারীর অদৃশ্য প্রভাব যেন তার জীবনে নোতুন একটা সাড়া এনেছে।

খেয়াল হয় পড়ার কথা। বিজয় নোতুন উৎসাহ নিয়ে পড়তে থাকে।

টেষ্ট পরীক্ষা সুরু হয়েছে। বিজয় ক'দিন খুব ব্যস্ত।

পরীক্ষা ভালোই দিচ্ছে। সেদিন ভূগোলের পরীক্ষা। ওটা তার প্রিয়

সাবজেক্ট। কি কৌতূহল নিয়ে বিজয় পৃথিবীর কথা জানতে চায়, দেশ বিদেশের নানা খবর সমন্ধে তার কৌতুহলও অসীম। দিদি বলে—পরীক্ষার সময় বৈরাগী দিঘীতে স্নান করতে না গিয়ে বাড়ির কলেই স্নান করে নে।

বিজয়-এর অবগাহন স্নান না করলে যেন তৃপ্তি হয় না। বলে সে।

দেরী হবে না। যাবো আর আসবো।

অবশ্য শীতের দিন পরীক্ষার তাড়াও আছে সকলের। তাই দিঘীর জলে এখন দাপাদাপি কমই হয়।

বিজয় স্নান করতে নেমেছে। ডুব দিয়েই উঠে আসবে, হঠাৎ এমন সময় ওদিকে মেয়েদের ঘাটে কাদের চীৎকার কলরব শুনে চাইল।

দিঘীর গভীর জলে পড়েছে একটি মেয়ে, ঘাটে লোকজন বিশেষ কেউ নেই। মেয়েদের ঘাটে দুচার জন বয়স্কা স্নান করতে নেমেছে। ওদের কেউ হবে মেয়েটি, গভীর জলে পড়ে ডুবছে আর ভেসে থাকার জন্য ব্যর্থ চেষ্টা করে চীৎকার করছে—বাঁচাও!

মেয়েরাও চীৎকার আর্তনাদ করে।

—কি সর্বনাশ হ'ল রে!

বিজয় দেখেছে ব্যাপারটা। ডুবেই যাবে মেয়েটি। বৈরাগী দিঘীর গভীর জলে এমন দুর্ঘটনা প্রায়ই ঘটে। আজও ঘটতে চলেছে।

বিজয়ের সময় নেই, পরীক্ষার দেরী হয়ে যাবে।

কিন্তু ডুবন্ত মেয়েটির শেষ আর্তনাদ, ঘাটের মেয়েদের চীৎকারে সে স্থির থাকতে পারে না। কোমরে গামছাটা বেঁধে লাফ দিয়ে পড়ে সাঁতার কেটে এগিয়ে যায় ওই ডুবন্ত মেয়েটির দিকে।

ঘাটের ধারে তখন ওদের চিৎকারে আশপাশের বাড়ির মেয়েরাও জুটে গেছে।

বিজয় ভাবতে পারে নি যে তার নিজেরই বিপদ হতে পারে। এই ধারণা তারও ছিল না।

ডুবন্ত মেয়েটি বিজয়কে কাছে আসতে দেখে দুহাত দিয়ে বিজয়কে ধরে ফেলে বাঁচতে চায়। কিন্তু বিজয় হাত নাড়তে পারছেনা। চমকে ওঠে সে, মেয়েটার কঠিন বাঁধনে বাঁধা পড়ে সে ও তলিয়ে যাচ্ছে দিঘীর অতলে। চোখের সামনে নিশ্চিত মৃত্যুর ছায়াটা ঘনিয়ে আসে। চকিতের মধ্যে বিজয় মেয়েটাকে থাবড়া মেরে ওর হাতের বাঁধন খুলে নিজে ভেসে ওঠে।

মেয়েটাও চিৎকার করছে।

দিঘীর ধারে লোকজন জুটে গেছে।

সাথীও চীৎকার শুনে বের হয়ে এসেছে দিঘীর পাড়ে। ডুবন্ত বিজয় তখন দিঘীর গভীর জলে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। চমকে ওঠে সাথী।

বিজয় ভেসে উঠে মেয়েটার চুলের মুঠি ধরে গর্জন করে,—হাত পা নড়াবি না।

চুপ করে ভেসে থাক। খবরদার কাছে আসবি না। আমি টেনে নিয়ে চলেছি তোকে! কোন ভয় নেই!

মেয়েটার নিরাপদ দূরত্বে থেকে বিজয় ওর লম্বা চুলের মুঠি ধরে টেনে আনছে। হাত পা ভারি হয়ে গেছে, বিজয়ের মনে হয় তীরভূমি বোধ হয় অনেক দূরে। বাড়ি গাছ গাছালির কাছে এসে গেছে।

ভাসমান মেয়েটাকে কোন রকমে কোমর জলে আনতে মেয়েটার মা মেয়েকে ধরে তীরে নিয়ে আসে। হাঁপাচ্ছে বিজয়। তার ওঠার শক্তি নেই। কোন রকমে ঘাটে উঠেই চোখ পড়ে সাথীর দিকে। স্থির দৃষ্টিতে সে দেখছে বিজয়কে। ক্লান্ত বিজয়কে ঘিরে মেয়েরা—দু একজন বৃদ্ধ মায় নবীন উকিল অবধি কি বলতে চায়। হয়তো সাধুবাদই দিচ্ছে তারা বিজয়কে।

কিন্তু বিজয়ের সময় নেই। কোন রকমে উঠে ক্লান্ত দেহে বাড়ি ফিরে যায়।

খবরটা এর মধ্যে সাথীই নিয়ে এসেছে বিজয়ের বড়দির কাছে। বাড়ি ঢুকতে বড়দি বিজয়কে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে—কি সর্বনাশ করেছিলি এখুনি? তোর নিজের প্রাণের মায়াও নেই? কি দস্যিরে তুই!

সাথী ওদিকে গুম হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বিজয় বলে—খেতে দাও। পরীক্ষার দেরী হয়ে গেছে। স্কুলে যেতে হবে।

স্কুলের নিয়ম খুবই কড়া। পরীক্ষার সময় দেরী করে গেলে হলে ঢুকতেই দেওয়া হয় না। বিজয় তাই করেছে।

হেডমাষ্টারমশায়কে বলে বিজয়—দিঘীতে একটা বাচ্চা মেয়ে ডুবে যাচ্ছিল স্যার। দেখে থাকতে পারি নি। ওকে বাঁচাতে গিয়েই দেরী হয়ে গেল।

হেডমাষ্টারমশায় দেখছেন ওকে। কি ভেবে বলেন—আধঘণ্টা দেরী করে ফেল্লে, ঠিক আছে, যাও।

বিজয় হাঁপাতে হাঁপাতে গিয়ে কোশ্চেন পেপার নিয়ে বসল। তবু খুশী হয় সে। সব কোশ্চেনই তার জানার মধ্যে পড়েছে। মাথা নামিয়ে কি উৎসাহ নিয়ে দ্বিগুণ গতিতে সে লিখতে থাকে। মনে হয় একটা ভালো কাজ করতে গিয়েছিল বলেই হেডমাষ্টারমশায়ও তাকে হলে ঢোকার অনুমতি দিয়েছেন, আর প্রশ্ন গুলোও তার কাছে সব জানা এসে গেছে।

আধঘণ্টার দেরীর জন্য তার কোন ক্ষতিই হবে না। বরং পনেরো মিনিট আগে তাকে সব উত্তর লিখে খাতা জমা দিতে দেখে হেডমাষ্টারমশায় অবাক হন। শুধোন

—হয়ে গেল সব কোশ্চেন?

বিজয় জানায়—হ্যাঁ স্যার?

খাতা জমা দিয়ে বের হয়ে এল সে খুশি মনে।

সাথীদেরও টেস্ট পরীক্ষা চলছে।

সুনীতি একাডেমী বিজয়দের বাড়ির পথেই পড়ে। অন্যদিন বিজয়ও দেখেছে সাথী অন্য মেয়েদের সঙ্গে পরীক্ষা দিয়ে ফিরছে। এসময়, সাথী একেবারে যেন তাকে চেনে না।

ওরা নিজেদের মধ্যেই পড়া—প্রশ্নের আলোচনায় মত্ত থাকে। আজও ফিরছে সাথী।

বিজয়কে দেখে ওর সুন্দর মুখটা যেন গম্ভীর হয়ে ওঠে।

বিজয় চুপ করে বাড়ি ফিরছে।

এর মধ্যে বিজয়ের নিজের প্রাণ বিপন্ন করে একটি মেয়েকে বাঁচানোর কাহিনীটা সারা পাড়ায় ছড়িয়ে পড়েছে, মেয়েটির বাবা এখানের পুরোনো বাসিন্দা। বেশ বর্ধিষ্ণু পরিবার, তারাও এসেছে বিজয়ের সন্ধানে।

তাদের একমাত্র মেয়েকে বিজয় বাঁচিয়েছে। তার কাছে তাদের ঋণ অপরিসীম। পাড়ার নবীন উকিল দরাজ কণ্ঠে বলে—ভেরি গুড় বেনাভোলেণ্ট বয় বিজয়!

সন্ধার সময় বৈঠকখানাতে বিজয়ের গুণজ্ঞানের আলোচনা হচ্ছে।

বড়দিও খুব খুশি হয়েছে। জামাইবাবু পিঠ চাপড়ে বলে—ভেরি গুড় শালাবাবু!

খুশি মনে বিজয় এসে পড়ার ঘরে ঢুকেছে। কাল ইতিহাস পরীক্ষা হলেই টেস্ট শেষ। তারপর আসছে ফাইন্যাল পরীক্ষা।

ইতিহাসের বই নিয়ে বসেছে বিজয়। সারা মনে তার খুশির সাড়া, একটা ভালো কাজ করার তৃপ্তি জাগে।

হঠাৎ বুলুকে ঢুকতে দেখে চাইল।

মেয়েটাও এর মধ্যে তৈরী হয়ে গেছে। বলে সে।

—সাথীদির চিঠি!

বিজয় খুশী হয়! আজ সাথীও দেখেছে তাকে প্রাণপণ যুদ্ধ করে মৃত্যুর মুখ থেকে মেয়েটিকে বাঁচিয়েছে।

সাথীও বোধ হয় খুশি হয়েছে তাই ভেবে বিজয়ও তৃপ্ত হয়।

কিন্তু চিঠিখানা খুলে চমকে ওঠে।

এ যেন অন্য এক সাথী। যেন তার ব্যাকুল স্বরই ধ্বনিত হয় বিজয়ের সামনে। সাথীর ডাগর কালো চোখের তারায় দেখেছিল চকিতের জন্য বিজয়, কি নিদারুণ উৎকণ্ঠা।

তার চিঠিতে তারই সুর বাজে। এত মানুষের প্রশংসা ছাপিয়ে সাথীর ব্যাকুল কণ্ঠস্বর তার কানে বাজে।

—সংকাজ কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আজ আমার একটা দারুণ সর্বনাশই হয়ে যেতো যা তুমি কোনদিনই জানতে পারতে না। তোমার এই পরোপকার বৃত্তির জন্য আমার চিন্তা বেড়ে গেল, চোখের আড়ালে কখন কি করে বসো তার জন্য আমার উৎকণ্ঠার শেষ রইল না।

বিজয় চমকে ওঠে।

সাথীর চোখে এই ভাবনার ছায়াটাকে সেও দেখেছিল। দেখেছিল সেদিন খেলতে গিয়ে পায়ে চোট লাগার পরও। অকারণেই বার বার এসেছিল তাদের বাড়িতে। নীরব চাহনিতে ফুটে উঠেছিল কি উৎকণ্ঠা।

আজও তাই ছুটে এসেছিল ঘাটের ধারে।

তাই হয়তো সেই নষ্টচন্দ্রের রাতের তার কীর্তির কথা কাউকেই জানায় নি সাথী।

বার বার তাকে আগলে রেখেছে ওই মেয়েটি। আজ যেন সাথী কি এক নোতুন রূপে বিজয়ের কাছে ফুটে ওঠে। ও তার একান্ত আপনজন। বিজয়ের মনে হয় সাথী আর সে যেন দুজনকে দুজনে অনেকদিন থেকেই চেনে জানে দুজনে কোন অন্ধকার অতীত থেকে একসঙ্গে অনেক আলো আধারিভরা হাসি অশ্রুর পথ দিয়ে হেঁটে এসেছে।

—দাদাবাবু। বুলুর ডাকে চাইল বিজয়?

বুলু বলে – দিদিকে কি বলবো?

বিজয় কাগজ নিয়ে চিঠি লিখতে থাকে। আজ যেন বিজয় অনেকটা ভরসা পায়।

সাথীর কাছে সে কৃতজ্ঞ। তার জন্য সাথীর মনে এত অমৃতসঞ্চয় রয়েছে তা জেনেছে আজ। বিজয়ের চিঠিখানা একটু লম্বাই হয়ে যায়। বিজয়ও আজ একান্তে সাথীর কাছে নিজেকে প্রকাশ করেছে। দুজনে দুজনের অনেক কাছে এগিয়ে আসে।

ব্যাডমিণ্টনের আসর পড়েছে আবার।

টেষ্ট পরীক্ষার রেজাল্টও বের হয়েছে। বিজয় এবার ফাণ্ট হয়ে এলা হয়েছে। সাথীও ষ্ট্যাণ্ড করেছে।

মাত্র আর কমাস সময়। এর পরই শুরু হবে ফাইন্যাল পরীক্ষা। হেড মাষ্টার মশায় বলেন বিজয়কে।

—স্কলারসিপ্ পেতে হবে বিজু। জেলার মধ্যে ফাণ্ট হয়ে জেনকিন্স স্কুলের সুনাম বাড়াতে হবে।

বিজয়ও সেই চেষ্টাই করছে।

বৌদিকেও জানিয়েছে সে তার টেষ্টের খবর। কিন্তু দেখেছে এবাড়িতে বৌদির চিঠি আসাটা পছন্দ করে না বড়দি, জামাইবাবুও মুখে কিছু না বললে

খুশি হন না এটা বোঝা যায়।

দিক ওরা ক্ষমা করতে পারে নি।

ই বিজয় এবার বৌদির চিঠিখানার উত্তর দিতে বলেছে ডাঃ মজুমদারের ঠিকানাতেই। ডাক্তারবাবুর সময় নেই। সাথীর কাকীমাও লেটার বক্স খোলে না। ওসব সাথীই করে।

আজ বিজয় সাথীকে বিশ্বাস করে। তার গোপন কথাটা ওকেই জানায়।

সাথী ওর বড় বৌদির কথা শুনে অবাক হয়।

—এত দিন বলোনি কেন?

হাসে বিজয়। বলে সে—কি ভাববে, তাই জানাতে পারি নি। আজ মনে হয়েছে তোমার কাছে গোপন করার মত কিছুই নেই আমার। বড় বৌদিকে এরা সবাই ভুল বুঝেই রইল সাথী। ওর মত মেয়ে হয় না। জীবনে বড় হবার পথের কথা উনিই বলেছিলেন, তোমাকে প্রথম দেখে ওর কথাই মনে হয়েছিল সাথী। ওকে দেখে জেনেছি মেয়েরা কত ভালো, কত বড় হতে পারে।

সাথী চুপ করে শুনছে কথাগুলো।

শীতের কুয়াশা ভরা সন্ধ্যা নামছে। গাছগুলো এখন নিঃস্ব, রিক্ত। এই রিক্ততার মাঝে দূর আকাশে দু'একটা তারা ফুল ফুটে ওঠে। বিজয়ের জীবনেও যেন এত পূর্ণতার মাঝে কি সবহারানোর শূন্যতা জাগে।

বিজয় বলে—আমার ভয় হয় সাথী!

সাথী ওর দিকে চাইল। বিজয় বলে।

—আমার জীবনে যে যখনই এমনি কোন আসার আলো এনেছে, সে হারিয়ে গেছে। বৌদিও তাই চলে গেল দূরে। আবার যদি তুমিও সরে যাও সাথী—

বিজয়ের কণ্ঠে কি বেদনার সুর ভরে ওঠে।

সাথীর হাতখানা ওর হাতে। ওর ব্যাকুল কণ্ঠস্বর সাথীর মনেও ঝড় এনেছে। তবু সাথী যেন কি আশার স্বপ্ন দেখে। বলে সে—না বিজয়। যতই অন্ধকার আসুক—আমরা একসঙ্গেই পথ চলব!

বিজয় কি স্বপ্ন দেখে।

বৌদির চিঠিও এসেছে, বৌদি জানিয়েছে তার আশীর্বাদ—বৌদি বলেছেন তুমি ষ্ট্যাণ্ড করবেই বিজয়। আর দেখা নিশ্চয়ই একদিন হবে।

বৌদি যেন তাকে নোতুন আশার আলোয় মন ভরিয়ে তোলে।

সাথী বলে—তুমি বৌদিকে খুব ভালোবাসতে না?

বিজয় শোনায়-তাই তোমাকেও—

হাসে সাথী। হাল্‌কা ধমকের সুরে বলে।

—খুব ওস্তাদ হয়ে গেছো দেখছি। যাও, সন্ধ্যা হয়ে এল। পড়তে হবে না? সাথী ওর গতিবিধির উপর অদৃশ্য সন্ধানী দৃষ্টি রেখেছে অহরহ।

ফাইন্যাল পরীক্ষার কদিন যেন ঝড় বয়ে যায় বিজয়ের মনে। পড়ার মধ্যে ডুবেছিল সে। সাথীও পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত। মাথায় ওদের বোঝা।

পরীক্ষা শেষ হতে এবার যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচে।

ক'মাস ছুটি। অখণ্ড অবসর। এতদিনের ক্লান্ত মন এখার অবকা খোঁজে।

শীত গিয়ে বসন্তের সাড়া পড়েছে।

ঝরা পাতার দিন শেষ করে বনে বনে এসেছে নোতুন পাতার সাজ। শিমু পলাশের লাল আভা জাগে। সব গাছগুলো হঠাৎ ঘন বেগুনী হলুদ পাতা সেজে উঠেছে। বাতাসে ওঠে আমের বোনের মিষ্টি সুবাস, ওঠে মৌমাছিদে কানাকানি।

এমনি দিনে বাবার চিঠি আসে। বিজয় যেন ওদের নোতুন বাড়িতে আসে পদ্মা পার হয়ে পাহাড় ঘেরা ছোট্ট জনপদ বারহারোয়া। ওখানেই আসতে লিখেছেন তাকে।

সাথীও যাবে তার মায়ের কাছে মৈমনসিং জেলার টাঙ্গাইলে। ক'মাস তাদে ছুটি।

বিজয় বলে—চিঠি দেবে তো? আমি গিয়ে ঠিকানা দেব। না স্রেফ ভুলে যাবে।

হাসে সাথী। বলে সে—দিয়েই দেখো। আর ফিরে এসে দেখা হবে তো একসঙ্গে কলেজে ভর্তি হবো।

বিজয়ও স্বপ্ন দেখে। তাদের দুটি সদ্যজাগ্রত তরুণ মনে দুজনে দুজনকে ঘিরে ছোট্ট একটি জগৎ গড়ে তুলেছে।

সেই স্বপ্ন নিয়েই বিজয় ফিরছে বাড়িতে। নবাবগঞ্জে আর যাবে না সে চলেছে পাহাড় ঘেরা ছোট্ট নোতুন এক জনপদের দিকে।

আজ বিজয়ীর মতই ফিরছে সে। জানে পরীক্ষা ভালোই দিয়েছে। বাবা খুশী হবেন। আজ ওদের সে নিরাশ করেনি।

মাণিকচক ঘাটে দূর প্রসারী পদ্মার বুকে লঞ্চটা চলেছে। আকাশ কোলে দেখা যায় সাঁওতাল পরগণার নীল পাহাড় সীমা। বিজয় নোতুন ঘরে ফিরছে আজ।

পাহাড়গুলো সার বেঁধে দিগন্তে উধাও হয়েছে। মাঝে মাঝে শাল পলাশ বনসীমা। পথগুলো পাহাড় বনের দিকে উধাও হয়ে গেছে ছোট বাজার বসতি ছাড়িয়ে। মাঝে মাঝে নীচু জমিতে ধান ক্ষেত। পাহাড় থেকে বৃষ্টির জল নেমে ওই নীচু জমিগুলো সরস উর্বর। তাই রুক্ষতার মাঝে মাঝে সবুজের

ছোঁয়াও রয়েছে।

মাঝে মাঝে ছোট্ট বসতি। আদিবাসীদের ঘরগুলো নিকানো, ঝকঝকে। ওরা ও ক্ষারে কাচা কাপড় পরে খোপায় বুনো ফুল গুঁজে বাজারে আসে কাজ কর্ম করতে। হাসিখুশি প্রাণ উছল এরা।

সন্ধ্যার পর ডুংরি থেকে মাদল বাঁশীর সুর ওঠে। নাচ গান হয় ওদের।

বিজয় এই নোতুন জগতে এসে হারিয়ে গেছে। নোতুন জায়গা, বসতিও ফাঁকা ফাঁকা। বাজার গঞ্জ আর রেল কলোনী নিয়েই এর পরিধি।

ট্রেনগুলো কলকাতা—বর্ধমান, এদিকে সাহেবগঞ্জ, জামালপুর, গয়া থেকে আসে। লোকো শেডও আছে। ইঞ্জিন বদল হয়। আবার যে যার পথে চলে যায়।

ট্রেনগুলো যতক্ষণ থাকে ষ্টেশনে, ততক্ষণ জায়গাটা সরগরম থাকে, ট্রেনগুলো চলে যেতেই আবার ফাঁকা হয়ে যায়।

দু'চারদিন ষ্টেশনেও গেছে বিজয়। সময় কাটেনা। মনে পড়ে কুচবিহারের কথা। সেই ছায়াসবুজ পরিবেশের সঙ্গে মিশিয়ে আছে সাথী।

এখানে এসে সাথীকে চিঠিও দিয়েছে এই জায়গার বর্ণনা দিয়ে। এই নির্জন বন পাহাড়ের নিঃসঙ্গ জীবন তার ভালো লাগে না। জানিয়েছে সে কবে ফিরে যাবে কুচবিহারে, আবার দেখা হবে তার সঙ্গে তাই ভাবছে দিন রাত।

আনমনে ঘুরছে বিজয়।

সেদিন পোষ্টঅপিস গিয়েছে চিঠির সন্ধানে, ক'দিনই যাতায়াত করছে। প্রতিদিনই আশা করে সাথীর চিঠি আসবে।

কিন্তু আসেনি। ভয় হয় বিজয়ের। অজানা একটা ভয়।

কে জানে সাথী তাকে ভুলেই গেছে বোধ হয় নিজের বাড়িতে গিয়ে। তাই যদি হয়? বিজয় কথাটা ভাবতেও চমকে ওঠে। সব তার হারিয়ে যাবে।

সেদিন পোষ্টাপিসে গেছে। মনে হয় আজও শুধু হাতেই ফিরে আসবে। কিন্তু পিওনও চিনেছে তাকে। তাই ওকে দেখে চিঠিখানা দেয়।

—আপনাদের চিঠি!

চমকে ওঠে বিজয়। খামের উপর তার হাতের লেখাটা খুবই চেনা। সাথী তাকে ভোলেনি। চিঠি দিয়েছে। কি খুশীতে বিজয়ের সারা মন ভরে ওঠে।

বিজয়-এর এই জায়গাটা খুবই প্রিয়।

ছোট টিলার ওদিকে শাল মহুয়ার কটা গাছ ভিড় করেছে। গাছে গাছে কচি পাতার সমারোহ। একটা পাহাড়ী ঝোরা বয়ে চলেছে।

বিজয় তন্ময় হয়ে পড়ছে সাথীর চিঠিখানা।

সাথীই যেন তার সামনে বসে ওই কথাগুলো পাহাড়ী ঝর্ণার মত কলকলিয়ে বলে চলেছে। দুচোখে ওর খুশির ঝিলিক। ওর ফর্সা মুখ—ডাগর চোখ তার

সামনে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে।

তারও টাঙ্গাইলে ভালো লাগছেনা। এখানে তার বন্ধু বান্ধব বিশেষ কেউ নেই। সেও দিন গুনছে কবে কুচবিহারে ফিরে যাবে। আবার দেখা হবে তাদের।

আরও বার বার করে লিখেছে সাথী, বিজয় এখন তার চোখের বাইরে। ও যেন সাবধানে থাকে। হঠাৎ তার পরোপকার বৃত্তির নেশায় যেন নিজেকে বিপদে না ফেলে।

হাসে বিজয়।

চিঠিখানা তার মনে একটি নোতুন সত্বাকে জাগরিত করেছে। ভালো লাগে তার। এই বন পাহাড় এই জগৎ-সবকিছুকে ভালো লাগে। সাথী তার মনে এই ভালোলাগার চেতনাকে জাগিয়েছে।

বিজয়ের মনে হয় সে ভাগ্যবান। সাথী তাকে দিয়েছে অনেক কিছু। হয়তো এর নামই প্রেম। এই অনুভূতিতে তার শূন্য মন পূর্ণ হয়ে ওঠে।

কয়েকটা দিন হাওয়ায় ভেসে যায়।

বাবা সেদিন মালদহ থেকে এসেছেন, তিনিই জানান পরীক্ষার রেজাল্ট বের হয়েছে। বিজয় পাশ করেছে ভালো ভাবেই. তিনটে লেটারও পেয়েছে। ডিষ্ট্রিক্ট স্কলার সিপ্‌ও পেতে পারে।

বিজয় প্রণাম করে বাবাকে। মনোতোষবাবুও খুশী হয়েছেন ছেলের কৃতিত্বে। আজ তার স্বপ্ন কিছুটা সফল হয়েছে। তিনি বলেন—এর পর কি পড়বে ভাবছো?

বিজয়-এর মন পড়ে আছে কুচবিহারের দিকে। নিজের কৃতিত্বের খবরে খুশী হয়েছে সে। তবু উৎকণ্ঠা জাগে সাথীর জন্য। সাথী পড়াশোনায় ভালো, তবু কেমন রেজাল্ট করলো জানতে ইচ্ছা করে।

বাবার কথায় বিজয় জানায়।

—আই-এস সি পড়বো বাবা। তারপর—

মনোতোষবাবু বলেন—ঠিক আছে। ডাক্তারী পড়তে গেলে ওটা পাশ থাকলে ভালো হয়। তাই করো।

বিজয় এর ভয় হয়। মেজদা, সেজদারা কলকাতাতেই পড়ছে। মেজদা পাশ করে এসেছে। কিন্তু তেমন ভালো রেজাল্ট করে নি।

মনতোষবাবু বলেন—তাহলে কলকাতায় সেজ রয়েছে ওকে লিখে দিই।

বিজয় কুচবিহার ছেড়ে যাবার কথা ভাবতেই পারে না। তার সবকিছু যেন ওখানেই রয়েছে। তাই বলে বিজয়।

—কুচবিহারে ভিক্টোরিয়া কলেজেরও খুব নাম আছে বাবা। ওখানে পড়াশোনাও তালো হয়। চেনা জানাও আছে, তাই ভাবছিলাম ওই কলেজেই ভর্তি

হবো।

মনোতোষবাবুও ভাবছেন কথাটা। কুচবিহারেই বিজয় ভালো রেজাল্ট করেছে। পরিচিত পরিবেশ থেকে কলকাতার ভিড়ে যেতে হয় তো চায় না বিজয়। বলেন তিনি।

—ঠিক আছে। তাহলে আর দেরী করো না। ভর্তি হতে হবে। ওখানেই চলে যাও।

খুশি মনে বের হয়ে এল বিজয়। সাথীর কথা, আর বৌদির কথা মনে পড়ে। এ বাড়ির ঠিকানা বৌদি জানে না। তবু বিজয় আজ বৌদিকে চিঠি দেয়।

আজ তার ভালোভাবে পাশ করার খবরটা জানিয়ে চিঠি দিল তাকে। সাথীকেও জানিয়ে দিল কুচবিহার আসার কথা।

কমলা সেইবার নবাবগঞ্জ থেকে চলে এসেছিল কি নীরব অভিমান নিয়েই। ওই সংসারে যা কিছু সর্বনাশ ঘটেছে, মায় অসিতের মৃত্যুর জন্যই ওরা যেন নীরবে তাকেই দোষী সাব্যস্ত করেছিল।

পিসীমা, মেজদির কথাগুলোয় কমলার মত তেজস্বী মেয়ের মনে ঝড় উঠেছিল। ভেবেছিল তার ভবিষ্যৎ জীবনের কথা। ওই পরিবেশের বন্ধকূপে সে নিজেকে শেষ করার কথা ভাবতে পারেনি, তাই বের হয়ে এসেছিল ওই বাড়ি থেকে।

মনে পড়ে শ্বশুরমশায়ের কথা। গম্ভীর মানুষটির মনে ব্যথা দিতে তারও বেধেছিল, কিন্তু এ ছাড়া কমলার সামনে আর কোন পথই ছিল না।

আর মনে পড়ে বিজয়ের কথা। ছোট ছেলেটা তাকে কি নিবিড় মায়ার বাঁধনে বেঁধেছিল। কমলার তাকে ছেড়ে চলে আসতে সবচেয়ে বেশী দুঃখ হয়েছিল।

আসার সময় কি অভিমানে বিজয় সরে গেছল তার সামনে থেকে। দেখাই করে নি। কমলার চোখে জল নামে। কিন্তু উপায় ছিল না। কঠিন পৃথিবীর পথে তারা দুজনে দুদিকে হারিয়ে গেছল।

কুষ্টিয়াতে এসে পরীক্ষার পড়া নিয়েই ডুবে যায় কমলা। ভোলার চেষ্টা করে তার অতীতকে। কিন্তু সব ছাপিয়ে বার বার চোখের সামনে ভেসে ওঠে বিজয়ের মুখখানা। দুচোখের দুরন্ত সেই চাহনি। সারা মন হু হু করে।

তবু বাঁচার পথ তাকে করতেই হবে। এ পৃথিবী বড় নিষ্ঠুর, কঠিন। তাই সব ভুলে কাজে ডুবে যেতে হয়।

কমলার বাবা মাও মেয়ের কথায় বাধা দেয় নি।

যেখানে স্বামীই নেই সেই সংসারে আশ্রিত থেকে দয়ার পাত্র হয়ে ফিরে যেতে

চায় না কমলা।

তাই বি-এ পাশ করার পর কমলার বাবার চেষ্টাতেই এখানের গার্লস স্কুলে চাকরী পেয়ে যায় কমলা।

বাবা বলেন চাকরীটা নিয়ে এবার এম-এ পড়তে শুরু কর।

কমলাও তাই ভেবেছে। এখন নিজের পথ তার নিজেকেই করতে হবে। স্কুলের কাজ, পড়ানো—নিজের পড়ার মধ্যে ডুবে গিয়ে, সব ভুলে থাকতে চায় কমলা।

হঠাৎ একদিন তার হাতে এসে পৌছায় বিজয়ের চিঠিখানা। বিজয় পড়াশোনা করছেনা, নবাবগঞ্জে ফেল করেছে শুনে দুঃখই পেয়েছিল কমলা। মনে হয়েছিল বিজয় যেন কি অভিমানে নিজেকে এমনি ধ্বংসের পথে নিয়ে চলেছে, আর তার কারণটাও জেনেছিল কমলা।

কিন্তু তার করার কিছুই নেই। তবু রাগে দুঃখে বিজয়কে সে কড়া করে চিঠিখানা লিখেছিল। তার জবাবও আসেনি। কমলাও জোর করে বিজয়ের কথা ভোলার চেষ্টা করেছিল। যার জন্য করার কিছু নেই তার জন্য বৃথা ভেবেও লাভ নেই। তবু কমলার মনে কাঁটার মত বিঁধেছিল এই বেদনাটা।

হঠাৎ চিঠি আসে বিজয়ের। নবাবগঞ্জে সে আর নেই। ওই বাড়ি থেকে দূর কুচবিহারে গিয়ে বিজয় বৌদিকে ভোলেনি। আজ সে আবার ষ্ট্যাণ্ড করেছে, নিজেকে ফিরে পেয়েছে।

কমলা খুশী হয়েছিল।' মনে হয়েছিল তার সব কিছু হারালেও একজন তাকে মনে রেখেছে। কমলা ওবাড়ির একজনের জীবনে রেখাপাত করেছে। বিজয় তার কথা রেখেছে।

কমলাও এম এ পরীক্ষা দিয়েছে প্রাইভেটে। পড়াশোনা করেছিল। তাই হায়ার সেকেণ্ড ক্লাশই পেয়েছে। কমলা এবার বি-এড পড়ার জন্য তৈরী হচ্ছে।

কলকাতাতে যেতে হবে ওটা পড়তে। অবশ্য স্কুল থেকে ষ্টাডি লিভ পাবে সে। এমনি দিনে বিজয়ের চিঠি আসে।

স্কুল ফাইনালে সে তিনটে লেটার পেয়ে জেলার মধ্যে সেকেণ্ড হয়েছে। কমলার কাছে ও যেন হারানো জীবনের একটি সূত্র। কমলা ওকে নিজের হাতে তৈরী করতে চেয়েছিল। আজ বিজয় তার মুখ রেখেছে। বিজয় তাকে ভোলেনি।

কমলার জীবন একদিক থেকে শূন্যই রয়ে গেছে। স্কুল, নিজের পড়া-ভবিষ্যৎ-এর পথ করা ছাড়া আর কোন কথাই তার মনে আসেনি।

মা তবু ইঙ্গিত করেছিল, বয়স কিই বা এমন। যদি নোতুন করে ঘর বাঁধতে চায় সে মা বাধা দেবে না। কমলা কথাটা শুনে হেসেছিল মনে মনে। ঘর বাঁধার স্বপ্ন তার নেই।

বিজয়ের চিঠিটা যেন তার মনের সেই শূন্যতাকে অনেকাংশে পূর্ণ করেছে। বিজয় তার জীবনের অপূর্ব মাতৃত্ব, ঘরের স্বপ্নকে ভরিয়ে রেখেছে।

কমলার খুবই দেখতে ইচ্ছা করে বিজয়কে। কে জানে এখন কত বড় হয়েছে সে। কিন্তু সে এখন দূরে কুচবিহারে। ওখানে কলেজেই পড়বে।

কমলাও খুশি হয়ে তার চিঠির জবাব দেয়। তার কথাও জানায়। বলে সে বিজয়কে আরও বড় হতে হবে। আর কমলা যেখানেই থাকুক তার কথা মনে রাখবে। দেখা একদিন হবেই। বিজয়কে সেদিন আরও বড় দেখতে চায় সে।

কলেজটা বেশ পুরোনো। বিরাট বাড়িগুলো এখনও অতীতের ঐতিহ্য, বর্তমানের সংস্কৃতি নিয়ে এখানের এই জগৎ-এ বেঁচে আছে।

বিজয় ফিরে এসেই খবর নিয়েছে সাথীও ফার্ষ্ট ডিভিশনে পাশ করেছে।

ডাঃ মজুমদারের বাড়ি যেতে ওর স্ত্রী বিজয়কে দেখে বলেন - এসো বিজয়। শোনলাম ষ্ট্যান্ড করছো, বাঁইচা থাকো বাবা। সাথীটাও ফার্ষ্ট ডিভিশনে পাশ করছে।

বিজয় খুঁজছে নীরব চাহনি মেলে সাথীকে। কাকীমা বলেন—ওর চিঠি পাইছি। আজ বৈকালের ট্রেনে আসবে। বিজয়ের যেন ধড়ে প্রাণ আসে। সাথী এখানে না থাকলে কুচবিহারে থাকতে পারবেনা সে। তবু ওর আসার খবর শুনে নিশ্চিন্ত হয়। কাকীমা বলে—তুমি এসে পড়ছো ভালোই হইছে। তোমার কাকাবাবুর তো সময় নাই। তুমিই ওকে ষ্টেশন থেকে আনতে যদি যাও!

বিজয় খুশি মনে বলে—ঠিক আছে। ও নিয়ে ভাববেন না। আমিই যাবো কাকীমা।

সাথী ক'মাস পর ফিরছে আবার কুচবিহারে। টাঙ্গাইল থেকে দুতিন বার ট্রেন বদলে, ষ্টীমারে ফেরি পার হয়ে আসতে হয়। দূরত্ব যত না বেশী, পথের ধকল অনেক বেশী তার চেয়ে। তাই ক্লান্ত পরিশ্রান্ত সাথী ষ্টেশনে নেমেই বিজয়কে দেখে খুশিতে উছলে ওঠে।

বিজয়ই ট্রেন থেকে ওর বাক্স নামিয়েছে। সাথীর দিকে এবার চেয়ে দেখছে সে। ফর্সা মুখখানায় ক্লান্তির ছায়া, ওর পিঠে ঝাপানো চুলের খোপাটা ঘাড়ে আধ ভাঙ্গা হয়ে পড়েছে। ওতেই যেন ওকে আরও সুন্দর, আকর্ষণীয় দেখায়। ক'মাসে সাথীর দেহে এসেছে পূর্ণতার আভাষ।

সাথী দেখছে ওকে। বলে সে—কি হ'ল? কুলি ডেকে চলো, বাইরে যেতে হবে না?

বিজয়ের খেয়াল হয়। ওরা কুলির মাথায় মাল তুলে দিয়ে ষ্টেশনের বাইরে অপেক্ষমান একটা রিক্সায় উঠেছে।

বৈকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামছে। আকাশ কোলে দূরে দিগন্তে বনঢাকা পাহাড় সীমায় দিনের আলো মুছে আঁধার নামে। একটা রিক্সায় চলেছে তারা। বিজয়

সাথীর এত কাছে কোন দিন বসেনি।

সাথীর দু'চোখে খুশির উছলে পড়া আভাষ। ক'মাসের জমা কত কথা বলে চলেছে সে। সাথী বলে—এবার কিন্তু একদিন খাইয়ে দিতে হবে স্কলারশিপের টাকা পেলে।

বিজয় চাইল ওর দিকে। সাথী বলে।

—কলেজে ভর্তি হয়েছো তো? আমাকে কালই ভর্তি হতে হবে। তুমি কি নিলে?

—সায়েন্স! ফিজিক্স-কেমিষ্ট্রি-ম্যাথামেটিক্স।

বিজয়ের কথায় সাথী বলে—আমি বাবা ওসবে নাই। আর্টস পড়বো।

হঠাৎ পথের একটা গর্তে সাইকেল রিক্সাটা পড়েছে, ঝাঁকানির চোটে বিজয়-এর উপর ছিটকে পড়ে সাথী। চমকে ওঠে বিজয়।

সাথীর নরম কোমল দেহটায় এত উত্তাপ, এত নিবিড় কোন ঝড় আনা অনুভূতি লুকানো রয়েছে তা জানতো না। বিজয়ের সারা দেহ মনে বিচিত্র একটি ঝড় আনে।

সাথীও অবাক হয়ে চাইল বিজয়ের দিকে। ওরা দুজনে হঠাৎ যেন তাদের অজানতে কি এক নোতুন অনুভূতির তীব্রতার অতলে হারিয়ে গেছে।

সাথীর দৃষ্টি সহজ স্বাভাবিক হয়ে আসে। তার সাবধানী কুমারী মন হঠাৎ এই নোতুন চেতনার সত্বাকে যেন সঙ্গোপনে লুকিয়ে রাখতে চায়।

সাথী বলে—বৌদিকে জানিয়েছো?

তার বৌদির খবর সাথীও জানে। ওকেই বলেছে বিজয়। সাথীর কথায় জানায় সে—হ্যাঁ!

সাথী কৌতুহলী স্বরে বলে—তোমার বৌদিকে দেখতে খুব ইচ্ছা করে।

—কেন? অবাক হয় বিজয়!

সাথী বলে ওঠে—তোমার এত শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, বিশ্বাস যে পেয়েছে তাকে দেখতে চাই। কেমন সে?

বিজয় ভাবছে কথাটা। সাথীকে সেও দেখাতে চায়। তার জীবনের এই সম্পদকে বৌদির কাছেও হাজির করতে চায় সে। কিন্তু ভয় হয়। বৌদি যদি কিছু ভাবে।

সাথী দেখছে ওকে। শুধোয় সে—কি ভাবছো?

বিজয় ওই প্রশ্নটাকে এড়াবার জন্য বলে।

—না।

হাসে সাথী, ওর হাত ঢাকা বিজয়ের হাতে। আজ যেন তারা অনেক সহজ হতে চায়। সাথী বলে।

—কি ভাবছো তা জানি। বৌদি যদি শুধোয় এই হতচ্ছাড়া মেয়েটা কে?

তথন কি জবাব দেবে? তাই না?

বিজয় হাসছে ওর কথার শুরে। বলে সে।

—হতচ্ছাড়া হতে যাবে কেন তুমি?

সাথী বলে ওঠে অভিমান ভরে—থাক্! আর খোসামুদিতে কাজ নাই।

সাথীর এই মান অভিমানের আলো ছায়া পড়েছে ওর মুখে, ওকে যেন আরও সুন্দর, নোতুন এক রহস্যময়ী বলেই বোধ হয়। রিক্সাটা এবার গাছ গাছালির ছায়া আঁধার নামা পথ দিয়ে ওদের বাড়ির দিকে এগিয়ে চলে।

কলেজে ক্লাশ সুরু হয়েছে।

বিজয় সায়েন্স নিয়েছে আর সাথীর আর্টস। ইংরাজী-বাংলা ক্লাশ গুলো এক সঙ্গেই হয়। কলেজে কো-এডুকেশনই চলে। কারণ মেয়েদের জন্য আলাদা কলেজ তখনও গড়ে ওঠেনি।

শহরের অনেক মেয়েই পড়ে কলেজে। তাদের মধ্যে অনেকে সায়েন্সও নিয়েছে।

রেবা—ইরা-সোনালীরা এর মধ্যে কলেজে অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সোনালী ইরা কলেজে আসে বেশ সেজে গুজে। দামী শাড়ি পরে।

স্কুলের গণ্ডী ছাড়িয়ে ছেলেরা কলেজে এসেছে। হঠাৎ তরুণ হবার জন্য তাদের অনেকের মনে ঈষৎ রঙ্গীন ছোঁয়াও লাগে।

সোনালী, ইরা তাদের অনেকের মনে ঝড় তুলেছে।

কলেজে ইউনিয়ন নিয়ে মেতে ওঠে ওরা। বিজয় ইউনিয়ন করে না।

তবে কলেজ ফুটবল টিমের সে অন্যতম নেতা। ক্রিকেটও খেলে শীতকালে।

সোনালী-ইরার দল যেন ক্রিকেটেরও ভক্ত হয়ে উঠেছে।

কমনরুমের মিটিং সোনালী তার রং চং করা মুখ দেখিয়েই ভোট পেয়ে যায়।

সাথী দেখেছে ওদের।

বরাবরই সে একটু সংযত চাপা ধরণের মেয়ে। তার বহিঃপ্রকাশ নেই। নিজের রূপ যৌবন সম্বন্ধে সে তেমন সচেতন হতে চায় না। এটাকে মেনে নিতে পারে না সাথী। সোনালী, ইরার দলকে সে এড়িয়ে চলে।

দেখেছে বিজয়কে। পড়াশোনা—খেলা ধুলোয় সে ভালো। সোনালী কমনরুমে-এর সেক্রেটারী হয়েছে। বিজয়কে বলে।

—এবার কলেজ টিম দারুন করতে হবে। মিটিং আছে বৈকালে।

সাথী আর বিজয় ফেরে একসঙ্গে।

কদিন সাথী দেখছে বিজয় সোনালী, ইরাদের সঙ্গে একটু বেশী জড়িয়ে পড়েছে। আজও দাঁড়িয়ে আছে সাথী, বিজয়ের দেখা নেই।

কলেজের অন্য মেয়েরা বলে—বাড়ি যাবি না সাথী?

তাদের পাড়ার বানীদির বোন রেবা বলে—একা যাবে সাথী ? বিজুদার জন্য দাঁড়িয়ে আছে।

সাথীর মনটা ভালো নেই বিজয় তখনও আসেনি। সাথী বলে—বয়ে গেছে কারোও জন্যে দাঁড়াতে। চল—

সাথী জোর করেই চলে এলো।

বিজয় জানে সাথী তার জন্য অপেক্ষা করবে তাই ছটফট করছে সে। টিম সিলেকশন-এর কথা উঠতে বিজয় বলে।

—কাল নামগুলো দেব। আজ চলি—

ইরা বলে—এত তাড়া কিসের ?

কিন্তু বিজয়ের সময় নেই। কোন রকমে বের হয়ে এসেছে। খুঁজছে চারিদিক। ওপাশের বটগাছের নীচে অন্যদিন সাথী তার জন্য দাঁড়িয়ে থাকে। আজ সেখানে কেউ নেই। বিজয় বের হয়ে এল। একটু অবাক হয়েছে সে।

বৈকালে সাথী বের হয়েছে বেড়াতে। বিজয়ের সঙ্গে দেখা করে নি। একাই ফিরে এসেছে কলেজ থেকে। বিজয় তখন সোনালী—অন্যদের সঙ্গে হয়তো নিবিড় আলোচনায় ব্যস্ত।

হঠাৎ বিজয়কে দেখে চাইল সাথী।

একটু তাড়াতাড়ি সে বাড়ি ফিরতে চায় বিজয়কে এড়িয়ে। কিন্তু বিজয় এসে তার সামনে দাঁড়িয়েছে। শুধোয় সে।

—আগে চলে এলে যে ?

সাথী ওকথার জবাব না দিয়ে বলে—পথ ছাড়ো।

বিজয় বলে—কথার জবাব দিলে না যে ?

সাথীর মনের অতলের রুদ্ধ অভিমানটা এবার ফেটে পড়ে। বলে সে।

—ইরা সোনালীদের কাছে জবাব চেয়ো, আমি জবাব দিতে বাধ্য নই।

বিজয় এবার ব্যাপারটা যেন বুঝতে পারে।

বলে সে—সত্যি, মিটিং এ আটকে পড়েছিলাম ? ফুটবল টিম নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল।

বিজয় নিজেই যেন সাথীর কাছে দোষী বলে মনে করে নিজেকে। বলে সে—আর দেরী হবে না। কথা দিচ্ছি।

সাথী চাইল ওর দিকে। ওর মুখের সেই মেঘটা যেন হাল্কা হয়ে আসে। সাথী শুধোয়—ঠিক তো ?

বিজয় বলল—হ্যাঁ ! দেখে নিও।

সাথী এবার সহজ হয়ে আসে। দুজনে ফিরছে বৈরাগী দিঘীর পাড় ধরে। সন্ধ্যার অন্ধকার নামছে। দিঘীর জলে আকাশের তারার ঝিকিমিকি। শান্ত

স্তব্ধ পারিবেশ। বাতাসে ঝরা বকুলের মিষ্টি সুবাস জাগে।

সাথী বলে—ওরা বাজে টাইপের মেয়ে বিজয়। আমি পছন্দ করি না ওদের সঙ্গে বেশী মেলামেশি করো। ওরা চায় না কেউ এগিয়ে যাক, বড় হোক। ওদের কাছে এই মেলামেশাটা নিছক খেলাই। তাই ভয় হয় তোমার জন্য!

সাথী চাইল ওর দিকে।

ওর কালো চোখে দিঘীর টলমল গহিণ কি মায়া। বিজয় দেখছে সাথীকে। ওর হাতখানা ওর হাতে। ওই নিবিড় স্পর্শ বিজয়ের মনে কি আশ্বাস এনেছে।

বিজয় বলে—তোমার কথা মনে থাকবে সাথী। কেউ অন্য কোন মেয়েরাই আমাকে আমার পথ থেকে টলাতে পারবে না। তোমাকে কথা দিচ্ছি।

সাথী বলে—গা ছুঁয়ে কথাটা বলছো কিন্তু!

আর সে কথা না রাখলে কি হয় জানো?

বিজয় শুধোয়—কি হয়?

সাথী নিবিড় স্বরে বলে—মরে যাবো তাহলে?

বিজয় চমকে ওঠে। তার সারা মন কি চকিত শূন্যতার হাহাকারে ভরে ওঠে।

সাথীকে যেন সে হারাতে পারবে না, কোনদিনই সেই কথা ভাবতেও পারে না সে।

কি নিবিড় একটা বেদনায় সাথীকে কাছে টেনে নেয়। ওর কবোষ্ণ দেহের উত্তাপ বিজয়ের মনে একটি আশ্বাস আনে, নির্ভর আনে।

বলে বিজয়—না—না সাথী। তোমাকে হারাতে পারবো না কোনদিন। আর কেউ কোনদিন আমার জীবনে আসবে না তুমি ছাড়া।

সাথীও যেন কি নিবিড় আশ্বাসের আবেশে নিজেকে হারাতে চায়। দুটি মন এই তারাকিনী রাত্রির তমসার মাঝে নিজেদের অন্তরের অনির্বাণ প্রেমের প্রদীপ জেবলে আরতি করে তাদের নব চেতন সত্বাকে।

খেয়াল হয় সাথীর।

বলে সে—চল, দেরী হয়ে গেছে। বাড়ি ফিরতে হবে।

দুজনে ফিরছে বাড়ির দিকে।

সাথী আর বিজয় কি নিশ্চিন্ত খুশী ভরা মন নিয়ে ফিরল।

ডাঃ দত্ত সরকারী চাকরী নিয়ে কুচবিহারে এসেছিলেন প্রায় বছর ছয়েক আগে। এখানের পরিবেশটাকে তাঁর ভালো লেগেছিল। আর কাজ পাগল লোক তিনি।

হাসপাতালে ঢুকলে আর সময়ের হিসাব থাকতো না। আউটডোরেও রোগীদের ভিড় জমে, আরও দুতিন জন ডাক্তার আছেন।

কিন্তু রোগীরা ডাঃ দত্তকে দেখে যেন বেশী ভরসা পেতো। সারা শহরে

ক'বছরেই তিনি সুনাম পেয়েছেন, শ্রদ্ধা সম্মানও পেয়েছেন।

ডাঃ দত্তও ভেবেছেন কথাটা। স্ত্রীকেও বলতেন প্রায়।

—আর সাত আট বছর চাকরী আছে। এখানেই থেকে গেলে রিটায়ার করে, একটা বাড়ি ঘর করবো এখানেই। টুক টাক প্র্যাকটিস করে চলে যাবে। পার্টিশানের পর আর দেশে ফেরার ইচ্ছা আমার নেই।

ডাঃ দত্তের স্ত্রীও সেই কথাটা ভাবে।

অতসীও এখানের পাড়ায় বেশ মানিয়ে নিয়েছে। ভদ্র পরিবেশ। তাদের একটি মাত্র ছেলে সে ডাক্তারী পড়ছে কলকাতায়। অতসী বলে—বেশ তো। এই দিকেই একটু জায়গা দ্যাখো গিয়া। এইখানেই বাড়ি ঘর করুম!

দূর প্রবাসে এসে এখানের মাটির সঙ্গেই মিশে গেছলেন তাঁরা।

কিন্তু সরকারী চাকরীর নিয়ম কানুন কিছু আছে।

কলকাতার সদর দপ্তরের কাছে কুচবিহার জলপাইগুড়ি—বর্ধমান, সবই এক গোত্রের। বদলির চাকরী।

তাই হঠাৎ যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত ঘটেছে।

কলকাতা থেকে হুকুম এসেছে ডাঃ দত্তের এখানের চাকরীর মেয়াদ আগেই উত্তীর্ণ হয়েছে, তাই তাঁকে বদলি করা হচ্ছে। সাতদিনের মধ্যে তাঁকে গিয়ে হুগলী জেলার আরামবাগ সাবডিভিসন্যাল হাসপাতালের চার্জ নিতে হবে।

অর্ডারটা হাতে পেয়ে চমকে ওঠেন ডাঃ দত্ত। চিফ মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ করও ডাঃ দত্তকে পেয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন। ওর ট্রান্সফার অর্ডার পেয়ে তিনিও অবাক হন। বলেন তিনি—আমি কলকাতায় ট্রাঙ্ককল করছি। যেভাবে হোক এ অর্ডার রদ করার চেষ্টাই করছি।

সারা হাসপাতালে খবরটা ছড়িয়ে পড়ে। সহরের অনেকেই শুনেছে। এখানের এম-এল এ বলেন।

—সে কি! দেখছি কি করা যায়।

ডাঃ দত্তকে ছাড়তে ওঁরা নারাজ। কিন্তু কলকাতা থেকে বলা হয়—স্বয়ং মিনিষ্টার-এর অর্ডারে হেলথ ডিপার্টমেণ্টে বেশ কিছু ট্রান্সফার করা হয়েছে। ওকে রিলিভ করা হোক যাতে সাতদিনের মধ্যে ডাঃ দত্ত আরামবাগে জয়েন করতে পারেন।

সেখানের মেডিক্যাল অফিসারকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, তিনি কুচবিহারে জয়েন করতে চলে গেছেন।

অর্থাৎ ডাঃ দত্তকে চলে যেতে হবে এখান থেকে।

এতদিনের গড়ে ওঠা পরিচয়, এখানের মাটির প্রতি, মানুষের প্রতি ভালোবাসার কোন দামই নেই। এখানের মাটিতে যে মহীরুহ শিকড় প্রবিষ্ট করিয়ে জীবন রস আহরণ করেছে এতদিন, এক কলমের আচড়ে তাকে এ মাটি

থেকে তুলে দূর কোথায় এক দুর্গম অপরিচিত পরিবেশে চলে যেতে হবে।

ডাঃ দত্ত আজ বৈকালেই হাসপাতাল থেকে চলে এসেছেন। অতসী অবাক হয় ওকে এই অসময়ে ফিরতে দেখে, মুখ চোখ শুকনো। রিক্সা থেকে নেমে কোন মতে বাড়ি এসে ঢুকলেন। অতসী এগিয়ে আসে। শুধোয় সে।

—এ সময় আইলা? শরীর খারাপ করছে নাকি? কত বলি এত পরিশ্রম করবা না তা কথা তো শোনবা না!

ডাঃ দত্ত ক্লান্ত বিষণ্ণ স্বরে বলেন।

—শরীর খারাপ হয় নি। এখান থেকে বদলির অর্ডার এসেছে অতসী। সাতদিনের মধ্যে গিয়ে হুগলী জেলার আরামবাগ সাবডিভিশন্যাল হাসপাতালের চার্জ নিতে হবে।

চমকে ওঠে অতসী। সেও ভাবেনি এখানের এই ঘর-বাড়ি, এই পরিবেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে তাদের। এমনি করে তার যত্নে গড়া ঘর ভেঙ্গে যাবে তাও জানতোনা। তাই আর্তকণ্ঠে বলে সে।

—সে কি! চলে যাবার লাগবো এখান থনে?

ডাঃ দত্ত বলেন—হ্যাঁ! সি-এম-ও কলকাতায় ট্রাঙ্ককল করেছিলেন এ হুকুম রদ করার জন্য। কিন্তু হয়নি। গোছ করে ফেলো, পরশুর ট্রেনেই চলে যেতে হবে এখান থেকে।

অতসী বজ্রাহতের মত দাঁড়িয়ে থাকে। তার সাধের ঘর, এই জগৎ সব কিছু থেকে নির্বাসন দণ্ডের আদেশে চমকে উঠেছে সে।

সাথী আর বিজয় এসেছে, সাথীদের বাড়ির বাইরের ঘরে আলো জ্বলেনি। আবছা অন্ধকারে বাড়িটা থম থম করছে।

ওরা ভিতরে ঢুকে ডাঃ দত্তকে এসময় দেখে অবাক হয়।

—কাকাবাবু?

কাকিমার বিবর্ণ মুখের দিকে চেয়ে সাথী অবাক হয়। শুধোয় সে—কি ব্যাপার কাকীমা?

অতসী এবার বেদনার্ত স্বরে বলে,

—আমাগোর এখান থেকে বদলি কইরা দিছে বিজয়। হুগলী জেলায় কোন আরামবাগে যাবার লাগবো।

চমকে ওঠে বিজয়।

সাথী অস্ফুট স্বরে বলে—সে কি?

ডাঃ দত্ত বলেন—হ্যাঁ রে! পরশুই চলে যেতে হবে আমাদের এখান থেকে। কাল কলেজে গিয়ে তোর ট্রান্সফার সার্টিফিকেট নিয়ে আসবি সাথী।

বিজয়ের পায়ের নীচে থেকে যেন মাটি সরে যাচ্ছে। সাথীর বিবর্ণমুখের দিকে চেয়ে থাকে সে। তাদের অজানতেই তাদের এতদিনের স্মৃতি স্বপ্নর

অবাস্তবতায় পরিণত হবে এটা ভাবতেই পারে নি।

কি যেন নিবিড় বেদনায় বিজয়ের সারা মন বিবর্ণ হয়ে ওঠে।

ফিরছে সে বাড়ির দিকে। আজ খেলার মাঠ, বৈরাগীদিঘীর ছায়াঘন তীর ভূমি, এই আলো আঁধার ঢাকা পথ সব কিছুর রূপ বিজয়ের চোখের সামনে সব আকর্ষণ হারিয়েছে।

সাথীরা চলে যাবে এখান থেকে। কথাটা ভাবতে সারা মন কি দুঃসহ বেদনায় বিবর্ণ হয়ে ওঠে।

বড়দি ওর পথ চেয়ে ছিল। বিজয়ের ফিরতে দেরী হয় না।

আজ ওর দেরী দেখে ভাবনায় পড়েছিল সে। ওকে ফিরতে দেখে চাইল। বিজয়ের মুখটা বিবর্ণ, চুলগুলো উস্কোখুস্কো হয়ে গেছে। দিদি শুধোর।

—কোথায় ছিলি এতক্ষণ? ভাবছি। এ কি রে?

শরীর খারাপ নাকি তোর?

বিজয়-এর মনের ঝড়টা মুখে ফুটে উঠেছে। ওই সব কথা জানাতেও চায় না সে। তাই দিদির কথায় বলে বিজয়।

—না, না। শরীর ভালোই আছে। কলেজের মিটিং ছিল। দেরী হয়ে গেছে।

কোন রকমে কথাগুলো বলে পড়ার ঘরে ঢুকলো বিজয়।

তার জামাইবাবুই খবরটা আনেন। ডাঃ দত্তরা বদলি হয়ে চলে যাচ্ছেন এখান থেকে।

খেতে বসেছে ওরা। রাত্রে জামাইবাবুর সঙ্গে একত্রে খেতে বসে। সুশীল মামাও পাশ করে চলে গেছে। বিজয়ই রয়েছে এখানে। বড়দি বদলির খবর পেয়ে বলে।

—তাই নাকি? পাড়াতে তবু একজন ভালো ডাক্তার ছিল, এবার কে আসবে কে জানে?

বিজয় চুপ করে নাড়াচাড়া করে খাবারটা। বড়দি বলে।

—কই খা বিজু? একটু মাছ নে!

—না। না। বিজয়ের আজ খাবার ইচ্ছাও নেই। কি এক দুঃসহ বেদনায় তার সারা মন ভরে উঠেছে।

সাথী কলেজে গেছে।

এ কলেজে তার আজ শেষ দিন। সবুজ মাঠ—ওই গাছগুলো, কনক-চাঁপার হলুদ ফুল ভরা গাছটাকে আর সে দেখতে আসবে না। বটগাছের নীচে আর কোনদিন ধানী রং শাড়ি পরা কেউ বিজয়ের পথ চেয়ে থাকবে না।

রেবা-সুবর্ণা, কেতকী শুনে অবাক হয়।

—সে কি রে চলে যাচ্ছিস তোরা?

সাথী বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসছে, বিজয়েরও আজ ক্লাশ করার মত মানসিক অবস্থা নেই। সেও বের হয়ে এসেছে।

ফিরছে দুজনে।

ক্লান্ত দুপুর। দূরে পাহাড় বনে ছায়া নেমেছে। বিজয় আর সাথী সহর ছাড়িয়ে এসেছে এরোড্রামের কাছাকাছি। দু একটা প্লেন এখানে নামে, আবার চলে যায়। বিস্তীর্ণ প্রান্তরে স্তব্ধতা নামে।

খয়ের সেগুণ গাছে এসেছে পাতা ঝরার দিন। শীতের নিস্তব্ধতা জাগবে এবার। কঠিন শাসনে যেন তাই এসেছে হারিয়ে যাবার পালা। বিজয় বলে।

—তুমি চলে গেলে এখানে থাকা যাবে না সাথী!

সেকেন্ড ইয়ারের পরীক্ষা দিয়ে আমিও চলে যাবো কলকাতায়।

ওখানেই পড়বো।

সাথী বলে—আমাকে আরামবাগ কলেজেই পড়তে হবে।

বিজয় বলে ওঠে—আরামবাগ ওখান থেকে দূরে নয়। দেখবে ঠিক চলে যাবো ওখানে।

—সত্যি! সাথী যেন ওর কথা বিশ্বাস করতে পারে না।

বিজয় বলে—সত্যি যাবো সাথী। যেখানেই থাকো তুমি আমি ঠিক যাবো। কোনদিনই তোমাকে ভুলবো না।

সাথীর দীঘল চোখে অশ্রুর ধারা নামে।

বিজয় বলে—তোমার সব কথা আমার মনে থাকবে সাথী।

আমার জীবনে তুমি ছাড়া আর কেউ কোনদিনই আসবে না।

আজ আবার তোমার গা ছুঁয়ে সেই কথাটাই জানাতে চাই সাথী!

ছায়া নামা বনভূমিতে ওরা দুজনে হারিয়ে গেছে। ছোট্ট নদীর জলে কলকল শব্দ ওঠে। বাতাসে এক একটা বিবর্ণ পাতা উড়ে উড়ে পড়ছে নদীর জলে, স্রোতে তারা ভেসে ভেসে হারিয়ে যায় কোন অজানা জগতে।

সাথীর হাতখানা ওর হাতে। সাথী এতদিন নিজেকে প্রকাশ করতে চায় নি। তার মনের সব বাঁধন আজ হারিয়ে গেছে সব হারাবার বেদনায়। বলে সে।

—আমিও যেখানেই থাকি তোমার পথ চেয়ে থাকবো বিজয়।

জানি তুমি একদিন আসবেই।

বিজয়ের সারা মনে ঝড় ওঠে। আজ সাথীকে কাছে টেনে নেয় সে। হঠাৎ যেন তার মনের অতলে নোতুন কি এক সত্ত্বা জেগে ওঠে, সে সাথীকে আরও কাছে পেতে চায়।

চমকে ওঠে সাথী। অস্ফুট স্বরে বলে।

—যাবার দিনটাতে আজ তোমার জন্য ভালোবাসা নিয়ে যেতে দাও বিজয়। আমাদের এ ভালোবাসা চাওয়া পাওয়া কালিমায় বিবর্ণ করতে চাই না।

তার জন্য দুজনেই দুজনের পথ চেয়ে থাকবো।'

বিজয় দেখছে নোতুন সাথীকে। আজ হারাবার বেদনাটা দুজনকে দুজনের অনেক কাছে এনেছে। মনে হয় যেখানেই থাকুক তারা কেউ কাউকে হারাবে না। সাথী বলে।

—কথা দাও সাবধানে থাকবে।

বিজয় আজ নোতুন করে শপথ করে, দুজনে দুজনকে নিবিড়তম করে ভালোবাসার শপথ।

সাথীরা চলে যাচ্ছে।

বিজয়ও সারাদিন ওদের বাড়িতে থেকে গোছগাছ করেছে। গাড়ি ডেকে মালপত্র ষ্টেশনে এনে লগেজ করিয়েছে। ষ্টেশনে সহরের অনেকেই এসেছেন ডাঃ দত্তকে বিদায় জানাতে।

অতসীর চোখে জল। বিজয় প্রণাম করতে অতসী বলে—দূরে যাইত্যাছি বিজয়। আর দেখা হইব কিনা জানি না। কলকাতা যদি যাও—আরামবাগ যাইবা কিন্তু।

সাথী চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। ওর দুচোখে জল টলমল করছে। কোন রকমে ট্রেনে উঠলো।

বিজয় সারাদিন ব্যস্ত ছিল। এবার ট্রেনটা চলে যেতে চমকে ওঠে। ষ্টেশন ফাঁকা হয়ে আসছে। তার সারা জীবনও যেন এমনি শূন্য হয়ে গেছে। সাথী দূরে কোথায় হারিয়ে গেল।

বের হয়ে এল সে প্লাটফর্ম থেকে।

পথে তখন রাত্রি নেমেছে। ট্রেনটাকে আর দেখা যায় না। সাথীও হারিয়ে গেল।

মনে হয় বিজয়ের তার জীবনে হারানোটাই সত্যি।

বৌদিও এমনি করে একদিন হারিয়ে গেছে। তবু সাথী তার জীবনে আসতে বিজয় সেই দুঃখও ভুলেছিল।

আজ সাথীও চলে গেল। কে জানে আবার কবে দেখা হবে।

হঠাৎ আকাশের দিকে চেয়ে কথাটা মনে হয়। কি যেন সান্তনা খুঁজে পায় মনে মনে?

দিনের উজ্জ্বল রোদে তারাগুলোকে দেখা যায় না। তবু আকাশের বুকে থাকে সেই তারাপুঞ্জ। দেখা যায় রাতের অন্ধকারে। অন্ধকার যত নিবিড়তর হয় তত উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে ওদের অস্তিত্ব। বিজয়ের জীবনেও বৌদি—সাথী কেউ হারিয়ে যায় নি। ওরা জেগে থাকবে। আর তার জীবনের হতাশার তমসা ভেদ করে ওরা উজ্জ্বলতর হয়েই জেগে থাকবে।

বিজয় বাড়ি ফিরলো তখন রাত্রি হয়ে গেছে।

বিজয়ের মনে হয় না সাথীরা চলে গেছে। মনে হয় এসব স্বপ্নই। হয়তো কাল সকালে দেখবে আবার তাকে। খেলার মাঠে আসবে বৈকালে। ওর চোখের তারায় ফুটে উঠছে কৌতুকের হাসি।

—কি ব্যাপার? হিরোর দেখা নেই?

কিন্তু কঠিন বাস্তবের সঙ্গে স্বপ্নের মিল হয় না কোনদিনই।

বিজয় বৈকালে খেলার মাঠে এসে চেয়ে থাকে ওই বাড়িটার দিকে। সাথীরা আর ওখানে কোনদিনই আসবে না। ও বাড়িতে এসেছে নোতুন ডাক্তার ভদ্রলোক। একপাল কাচ্চা বাচ্চা কলরব করে। আর ডাক্তারের মোটকা গিন্নীর কর্কশ গলার হুংকার শোনা যায়।

সেই শান্ত সুন্দর পরিবেশ মুছে গেছে।

কলেজে আসে বিজয়। পড়াশোনার মধ্যে ডুবে যেতে চায়। হঠাৎ সেদিন প্রাকটিক্যাল ক্লাশ করতে করতে বাইরের দিকে চেয়ে চমকে ওঠে।

এর আগে ওই সবুজ ঘাস ঢাকা মাঠে ঠিক প্রাকটিক্যাল ক্লাসের দরজার সামনে রোদে পিঠ করে বসে থাকতো সাথী। পরণে বাসন্তী রং শাড়ি—লাল ব্লাউজ। ওখানে বসে সে মাঝে মাঝে চেয়ে দেখতো ক্লাশের মধ্যে বিজয়কে। বিজয়ও খুশি হতো। বেশ বুঝেছিল বিজয় সাথী নজর রেখেছে তার দিকে।

ওর সাবধানী দৃষ্টির সামনে বিজয় নিজেকে নিরাপদই ভাবতো।

আজও সাথী এসেছে। বাসন্তী রং শাড়ি পরে বসে আছে রোদপিঠ করে তারই প্রতীক্ষায়। বিজয় বুনসেনবার্ণারটা নিভিয়ে টেষ্ট টিউবটা রেখে বের হয়ে আসছে।

তার সহপাঠী বসন্ত বলে—চললি যে, হয়ে গেল তোর?

বিজয় কথা না বলে বের হয়ে এসেছে। কতদিন পর সাথীকে দেখছে সে। এগিয়ে এসে চমকে ওঠে।

সাথী নয়। সাথীর মত অন্য কোন মেয়ে ওই বাসন্তী রং শাড়ি পরে বসে আছে। বিজয় থমকে দাঁড়ালো।

সোনালীও বসেছিল ওই দলে। বিজয়কে এখানে মেয়েদের মধ্যে এসে পড়তে দেখে অবাক হয়েছে সে।

শুধোয়—তুমি? কি ব্যাপার?

বিজয় সরে এল যা হয় একটা জবাব দিয়ে।

মেয়েদের চাপা হাসির শব্দ ওঠে। ইরা বুঝেছে ব্যাপারটা। বলে সে।

—বেচারা সাথীর জন্যে পাগল না হয়ে যায় রে? বাসন্তী রং শাড়ি দেখে ও ভেবেছিল বোধ হয় সাথীই রয়েছে।

হাসির সাড়া পড়ে।

বিজয় হতাশায় বিবর্ণ মুখ নিয়ে প্রাকটিক্যাল ক্লাসে ফিরে এল। মাঝে মাঝে তার সব যেন কেমন ঘুলিয়ে যায়! মনে হয় সাথী তার জীবনের অনেক আনন্দ আশাকে সঙ্গে নিয়ে কোন দূর আজানায় হারিয়ে গেছে।

চিঠিখানা এমনি দিনে পেয়েছিল বিজয়।

সাথীর চিঠি। কোন দূরে নির্জন জনপদে আজও তার পথ চেয়ে আছে একটি নিঃসঙ্গ সাথী। বিজয় একদিন সেখানে যাবেই।

তাই আই-এস-সি পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি গিয়ে বাবাকেই কথাটা বলে। মনোতোষবাবু বিজয়ের ইচ্ছায় বাধা দেননি।

বিজয় বলে—বি-এস সিতে অনার্স নিয়ে কলকাতার কলেজেই পড়বো বাবা। কুচবিহার কলেজে অনার্স তেমন ভালো হবে না। আর অনার্স-এ ফাষ্ট ক্লাস পেলে কলকাতার ইউনিভার্সিটিতে এম-এস্ সি ও পড়বো।

মনোতোষবাবুও চান বিজয় পড়াশোনা করুক। আর কলকাতায় এলে ভালোই হবে।

তার জামাই-এর ওখানে এতদিন ছিল, মেয়ে জামাই অবশ্য এ নিয়ে কোন দিন কিছু বলেনি, নিজের তবু মনে হয়েছিল কথাটা। বিজয়কে ওখানে রেখে ওদের আর বিব্রত করতে তিনিও চান না!

তাই বিজয়ের কথায় মনোতোষবাবু বলেন।

—তাই করো। পড়াশোনা ভালো করতে গেলে কলকাতাতেই যেতে হবে। আমি সেজোকে লিখে দিচ্ছি ওখানে থাকার ব্যবস্থা, কলেজে ভর্ত্তির ব্যাপারে ও যা দরকার করবে।

বিজয় আজ যেন নিশ্চিন্ত হয়। কুচবিহারে আর থাকতে পারবে না সে। তাই খুশী হয়েছে সেও। কুচবিহারের ক'টা বছর তবু তার জীবনে একটা গভীর রেখাপাত করেছে।

কিন্তু এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকার স্বভাব তার নয়? জীবনের ধর্ম এগিয়ে চলা। তাই বিজয় আজ আবার কুচবিহার ছেড়ে অন্য এক বৃহত্তর জগতের পথে পা বাড়ালো।

যে পথের শুরু হয়েছিল নবাবগঞ্জের জনপদ থেকে, সেই পথ একদিন তাকে নিয়ে গেছল দূর উত্তরে, আজ আবার চলেছে সে দূর দক্ষিণে। এ পথের বাধা নিষেধ নেই—এ শুধু চলেছে আর চলেছে। বিজয় জানে না এ পথের শেষ কোথায়! তবু চলতে হবে তাকে—তার চলার জগতের দূর আকাশে কোন তারার মত চাহনি নিয়ে জেগে আছে দুজন! বৌদি আর সাথী!

ট্রেনটা দীর্ঘ ব্রিজে উৎকট একটা শব্দের ঝড় তুলে চলেছে। বিজয়ের ঘুম ভেঙ্গে যায়। সারা ব্রিজ পার হচ্ছে, পদ্মার উপর দীর্ঘ সেতুর নীচে ভোরের

আলো জাগা পদ্মার বিস্তার দেখা যায়।

এবার দার্জিলিং মেল থামবে কুষ্টিয়ায়।

কুষ্টিয়ার নামটা তার খুব চেনা। আজ কুচবিহার থেকে সে চলেছে কলকাতার দিকে। হঠাৎ কুষ্টিয়ার নাম শুনে উদ্বেল হয়ে ওঠে সে। এত কাছ দিয়ে চলেছে, বৌদির কথা মনে পড়ে। ওদের ঠিকানাও জানে সে। বৌদিকে একবার দেখে যাবে। কতদিন দেখেনি? কতো বছর।

কত-কথা বলার আছে তার।

ট্রেনটা ষ্টেশনে ইন্ করতে বিজয় তার সুটকেশ বিছানা নিয়ে নেমে পড়ে।

নোতুন জায়গা। সকালের আলো ছড়িয়ে পড়েছে সহরের পথে।

রিক্সাওয়ালাকে ঠিকানা বলতে সে জানায়।

— হাইস্কুলের কাছে মাষ্টারবাবুর বাড়ি যাবেন তো? চলুন।

বৌদির বাবা ললিতবাবু এখানের পুরোনো মানুষ। অনেকেই চেনে তাকে।

ওপাশে দেখা যায় গরাই নদীর বালুচর। তার ধারে বড় বড় গুদাম, নদীতে দুচারটে নৌকা চলেছে। এ যেন তাদের নবাবগঞ্জের মতই।

বিজয়ের বুক কাঁপে কি উত্তেজনায়। বৌদি তাকে দেখে চমকে উঠবে।

ওদিকে গাছ গাছালি ঘেরা টিনের চৌবন্দী বাড়ির সামনে এসে নামল বিজয়। ভাড়া মিটিয়ে এগিয়ে যায়। মনে হয় এখুনিই বৌদি বের হয়ে আসবে। তাকে চিনতে পারবে কিনা কে জানে।

সামনে ললিতবাবুকে দেখে প্রণাম করে বিজয়। ললিতবাবুকে অনেক আগে বিয়ের সময় দেখেছিল মাত্র। ললিতবাবু এই যুবককে চিনতে পারেন নি। চেনার কথাও নয়।

তাছাড়া বিজয় তখন ছিল ছোট্ট। হাফ প্যাণ্ট পরতো।

বিজয়ই পরিচয় দেয়—আমি নবাবগঞ্জের মনোতোষবাবুর ছেলে বিজয়! বৌদির সঙ্গে দেখা করতে এলাম।

ললিতবাবুর জীর্ণ বুকে একটা বেদনার সুর বাজে। নবাবগঞ্জের স্মৃতি তাঁর কাছে বেদনারই। তবু সেটাকে চেপে রেখে আত্মীয়তার সুরে বলেন।

—বিজয়! কত বড় হয়েছো বাবা চিনতেই পারি নি! তুমি তো স্কুল ফাইন্যালে ষ্ট্যাণ্ড করেছিলে? বাঃ—

স্কুল মাষ্টার, আজ অবসর নিলেও বিদ্যার স্বীকৃতি দিতে ভোলেননি। বলেন তিনি—এসো বাবা।

বিজয়ের দুচোখ খুঁজছে বৌদিকে। তার জন্যই এখানে আসা।

তাই শুধোয় বিজয়—বৌদিকে দেখছি না?

ললিতবাবু বলেন—বসো। জিরোও। কমলা তো এখানে নেই।

চাইল বিজয়।

ললিতবাবু বলেন—বি-এড পড়তে কলকাতায় গেছে। সেখানেই আছে হোস্টেলে।

বিজয় কিছুটা আশ্বস্ত হয়। কলকাতায় সেও চলেছে। তাহলে সেখানেই দেখা হবে। তবু এখানে দেখা হল না মনে করে একটু ক্ষুণ্ণই হয়।

বলে বিজয়—আমি কলকাতাতেই পড়তে যাচ্ছি। ওখানের কলেজে। ললিত-বাবু বলেন-বেশতো। ঠিকানা দিয়ে দেব। দেখা করো। খুব খুশী হবে কমলা। প্রায়ই তোমার নাম করে সে।

বিজয়ও নিশ্চিন্ত হয়। বৌদি তাকে ভোলেনি, বিজয়ের কথায় ললিতবাবু বলেন—রাত জেগে ট্রেনে এসেছ। খাওয়া দাওয়া করে দুপুরে ঘুমোও। সন্ধ্যার ট্রেনে তুলে দেব সকালে কলকাতায় নামবে।

বিজয়ও ওর কথাটা মেনে নেয়। একটু বিশ্রাম তারও দরকার।

পরদিন সকালের প্রথম আলোয় বিজয় কলকাতায় এসে পৌছালো। শিয়ালদহ ষ্টেশনে এসেছিল তার সেজদা। ললিতবাবুই ওকে টেলিগ্রাম করেছিলেন।

সেজদা বলে—কুষ্টিয়ায় কেন গেছলি ?

অর্থাৎ ওখানে যেতে দেখে সেও খুশি হয় নি। বিজয় জবাব দিল না। সে তখন মুগ্ধ দৃষ্টি মেলে মহানগরীকে দেখছে। সবে ঘুম ভাঙছে যেন মহানগরীর।

বিরাট ষ্টেশন-এর বাইরে অসংখ্য গাড়ি-ট্যাক্সি রিক্সার ভিড়। ট্রেন থেকে জলস্রোতের মত মানুষ নেমে চলেছে সহরের মধ্যে। দোতলা বড় বড় বাসগুলো গর্জন করে চলেছে, দোতলা বাস সে এর আগে দেখেনি। ট্রামের নাম শুনেছিল, আজ দেখছে উপরের তারে একটা চাকা লাগানো বড় বড় দুটো গাড়ি ছুটে চলেছে। বড় বড় সারবন্দী বাড়িগুলোকে দেখে চেয়ে থাকে বিজয়। নবাবগঞ্জ, মালদহ তার দেখা কুচবিহার সহরের সঙ্গে এর তুলনাই হয় না। এ আরও বিরাট, বিশাল।

হাওড়ার ব্রিজের নাম শুনেছিল বিজয়। সেজদাকে সেই ব্রিজের কথা বলতে সেজদা বলে।

—সে তো হাওড়ায় গঙ্গার উপর। এতো শিয়ালদা ষ্টেশন। ও ব্রিজ পরে দেখবি।

এক সহরে দুটো পেল্লায় রেল ষ্টেশনও রয়েছে। এসব দেখে এ সহর সম্বন্ধে তার শ্রদ্ধা আরও বেড়ে যায়।

ওদের হোস্টেল কাছেই। বড় চারতলা বাড়িটা কলেজের কাছেই। নীচে ট্রাম-দোতলা বাস চলেছে রাস্তা দিয়ে।

বিজয় কলেজে ভর্তি হয়ে গেল, হোস্টেলেই থাকে। বন্ধু-বান্ধবও জুটে

গেছে। ক্রমশঃ এই বিচিত্র সহরের ভিড়ে সেও মিশে গেছে। সেজদা এবার ফাইন্যাল পরীক্ষা দিয়ে দেশে চলে যাবে। তা যাক, বিজয়ও ততদিনে এই নগরের রীতি নীতি কিছুটা চিনেছে। এখানের একজন হয়ে গেছে।

ক'টা মাস তাই এই জীবনকে মানিয়ে নিতে সময় লেগেছে বিজয়ের। ক্রমশঃ এখন কলেজ, পড়াশোনা এখানের জীবনে কিছুটা অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। এবার মনে করতে পারে বৌদির কথা। এই সহরের অন্য প্রান্তে রয়েছে সে, এত কাছে। তবু বিজয় দেখা করতে পারে নি। মনে পড়ে সাথীর কথা।

হোস্টেলে অনেক দূর দূরান্তরের ছেলেরা থাকে। এদের মধ্যে আরামবাগের ওদিকের দু'একজন ছাত্রও আছে। তাদের কাছেই শুনেছে বিজয় আরামবাগ-এর কথা। বেশী দূর নয় এখান থেকে। তারকেশ্বর অবধি ট্রেনে গিয়ে ওখান থেকে বাসে যাওয়া যায় আরামবাগ। তবে বর্ষাকালে খুবই দুর্গম হয়ে ওঠে। পথে একটা বড় নদীতে ব্রিজ নেই, খেয়া পার হয়ে আবার ওপারের বাসে উঠে যেতে হয় আরামবাগ। অন্য সময় তত সমস্যা থাকে না।

বিজয় কথাগুলো ভাবছে। ক্লাস—পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে তার নিঃসঙ্গ মন আজও হারানো দিনগুলোর কথা ভাবে। সেই দিনগুলোকে বৌদি, সাথীকে সে কখনও ভুলবে না। তার জীবনের পথ চলার সাথী তারা।

সাথীর দুচোখের চাহনি আজও তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। তার জীবনে সে এনেছে কি এক পূর্ণতার আভাস।

তার জন্য বিজয় কুচবিহারের নিশ্চিন্ত জীবন ছেড়ে এই পরিবেশে এসেছে।

কমলা এসেছে কলকাতায় বি-এড পড়তে।

ক্রমশঃ ভেবেছে সে কথাগুলো। বাবাও বুঝেছেন। ইতিহাসের বিচিত্র গতিপথ, একটা দেশ ভেঙ্গে দুটুকরো হবার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনের উদারতা, প্রসারতা কমে গেছে। তাই সামান্য স্বার্থ নিয়ে হানাহানি, খুনোখুনির বিরাম নেই। এতদিন ললিতবাবু ছিলেন কুষ্টিয়ার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক। সারা সহরের মানুষ তাকে শ্রদ্ধা করতো। শান্তিতে বাস করেছেন তারা।

কিন্তু প্রীতির সেই পরিবেশ বিষিয়ে উঠেছে। অনেকে দেশ ছেড়ে চলে এসেছে ভারতে। বহু মানুষের ভিড় শুরু হয়েছে এদিকেও। আরও যারা ওদেশে রয়ে গেছে তারাও চলে আসার কথা ভাবছে।

কমলাও দেখেছে পরিস্থিতিটা। তাই এখানে পড়তে এসে সে চেষ্টা করছে যদি এদিকেই কোথাও কাজ পায়। এখানের অধ্যক্ষাও কমলার উপর খুব খুশী। তার জীবনের বেদনাময় কাহিনীও শুনেছেন তিনি। তিনিই বলেন দেখছি আমিও, যদি তোমার কোন ব্যবস্থা করতে পারি।

আজ কমলার মনে একটা ভয়ও হয়। এতবড় পৃথিবীতে সে আজ একা। তার নিজের ঘর ও ছেড়ে এসেছে, স্বামীও নেই। তবু কঠিন মেয়েটি মনে মনে

সাহস খুঁজে পাবার চেষ্টা করে।

সহরের এই অঞ্চলটা বেশ নিরিবিলি, অভিজাত এলাকা। দূরে ট্রামলাইন। আশপাশে কিছু শিল্পপতিদের উচু প্রাচীর ঘেরা বাড়ি। গেটে দ্বারোয়ান —ভিতরে প্রশস্ত সাজানো বাগানও রয়েছে। আদি কলকাতার আমলের কিছু পুরোনো গাছও রয়েছে।

তাদের কলেজ হোস্টেল-এর এলাকাও বিরাট। ব্রিটিশের আমলে এটা কোন ছোট খাটো লাট বেলাটের বাড়িই ছিল। দূরে গেট, ভিতরে বাগান—একটা ঝিল রয়েছে। জল নেই সব জায়গায়, তবে এককালে সাজানো গোছানো ছিল তা বোঝা যায়।

কমলার আজ ছুটি।

কাছাকাছি জায়গার অনেক মেয়েরা পর পর দু তিন দিন ছুটিতে বাড়ি চলে যায়। ওদের বাড়িঘর মা বাবা কারোও স্বামী সবই আছে। কমলার মত কয়েকজন যাদের কোথাও যাবার ঠাই নেই তারাই রয়ে গেছে হোস্টেলে।

ফাইন্যাল পরীক্ষাও হয়ে যাবে কয়েক মাসের মধ্যে। তার মধ্যে কমলা এদিকে কোন কাজ না পেলে বাধ্য হয়েই কুষ্টিয়ায় ফিরে যাবে। কিন্তু অধ্যক্ষার চেষ্টাতেই কমলার সেই সমস্যার সমাধান হয়েছে।

তিনিই চেষ্টা করে দু একজন মাতব্বরকে ধরে কমলার এদিকেই একটা চাকরীর ব্যবস্থা করেছেন।

কলকাতা থেকে কিছু দূর মফঃস্বল সহরের স্কুলে সহকারী প্রধান শিক্ষিকার কাজই পাবে।

অধ্যক্ষা বলেন—একটু বাইরে হচ্ছে, আমি বলবো এইটাই এখন নাও। এখানে থাকতে থাকতে সুবিধামত অন্যত্র কাজ পেয়ে যাবে। আরামবাগ এমন কিছু দূরে নয়। তাহলে ওদের জানিয়ে দিই। পরীক্ষার পরই ওখানে গিয়ে জয়েন করবে।

কমলাও ভেবেছে কথাটা।

এ চাকরীটা নেবার মনস্থ করে সে। তবু এদেশে থাকার মত একটা জায়গা পাবে, বাবা মাকেও আনতে পারবে।

পরীক্ষা হয়ে গেছে। ভালোই পরীক্ষা দিয়েছে কমলা।

এবার ওখান থেকে চলে যাবার পালা। আরামবাগের স্কুলের চাকরীটা নিয়েছে। যেতে হবে সেখানে।

অজানা অচেনা জায়গা, একাই যেতে হবে তাকে। আর এ জীবনের কঠিন সংগ্রামকে সে নিজে জেনে নিয়েছে। শ্বশুর বাড়ির কথা মনে পড়ে। সেখানে মাথা উচু করে বাঁচতে পারতো না, তাই এই পথ নিয়েছে। তাকে এইভাবে বাঁচার লড়াই করতেই হবে।

কমলা দমেনি।

তবু মনে পড়ে সেই বাড়ির কথা। সেইখানের অনেকের কথা। বিজয়, ছোট্ট দামাল ছেলেটার কথা আজও মনে পড়ে। ম্যাট্রিকে ষ্ট্যাণ্ড করে চিঠি দিয়েছিল, তারপর আর খবর জানে না কমলা।

নবাবগঞ্জের বাড়ি থেকে শ্বশুরমশায়রাও চলে গেছেন ভারতের কোথায়। একটা ঝড়ে যেন বহু ঘর বাড়ি গাছ গাছালি ভেঙ্গে গেছে।

হারিয়ে গেছে কত মানুষ—শাখাচ্যুত পাখীদের মত।

মানুষের কোন দামই আজকের দিন দেয় নি। তাই সংগ্রাম এখানে কঠিন, কঠোর।

সেই কাঠিন্যের মাঝে বিজয়—সেই ছোট ছেলেটাও বোধ হয় হারিয়ে গেছে।

দারোয়ানকে দেখে চাইল কমলা।

ছুটির দিন। হোষ্টেল প্রায় ফাঁকাই। দারোয়ান বলে।

—একজন বাবু আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।

কমলা অবাক হয়। তার সঙ্গে এখানে কোনদিন কেউ দেখা করতে আসেনি। তাই আজ তার সঙ্গে কে একজন দেখা করতে এসেছে শুনে একটু ভাবনাতে পড়ে। মনে হয় আরামবাগ থেকে কেউ এসেছেন বোধ হয়। এছাড়া আর কেউ আসবে তা ভাবতেও পারে নি সে।

ভিজিটার্স রুমে ঢুকে চাইল কমলা।

প্যাণ্ট সোয়েটার পরা দীর্ঘ দেহী একটি তরুণ। গোফের রেখা সবে দেখা দিয়েছে। কমলা দেখছে ওকে।

বিজয় প্রণাম করে বলে—চিনতে পারলে না বৌদি? আমি বিজয়।

চমকে ওঠে কমলা। দুচোখে তার বিস্ময়, অজানা একটা তৃপ্তির আবেশ জাগে।

—তুমি! বিজু! ওমা কতবড় হয়ে গেছো!

কমলার চোখমুখে খুশীর ঝলমল আভাষ জাগে।

—কেমন আছো? বাবা-মা কেমন আছেন? কোথায় নোতুন বাড়ি করে চলে গেছো? তা এখানে?

বিজয় বলে—ওরে বাবা, একসঙ্গে এতগুলো প্রশ্ন করলে কোনটার জবাব দেব? সব একে একে বলছি!

কমলা এর মধ্যে চা আনিয়েছে। বহুদিন পর আজ আবার তার মুখে হাসির আভা জাগে। বিজয় তাকে ভোলেনি, আজ তার বিজয় কলকাতায় পড়তে এসেছে।

কমলা বলে—বি-এস সি পড়ে এম এস সি না হয় ডাক্তারীই পড়ো বিজয়। তুমি খুব নামকরা ডাক্তার না হয় ইনজিনিয়ার হবে। বিরাট কারখানা করবে।

দেখছো কত লোকের কাজ নেই—আশ্রয় নেই। ওদের মধ্যে একটা বিরাট কিছু করবে। স্বাধীন দেশের জন্য আজ এমনি কিছু করা দরকার।

বিজয় এখন বড় হয়েছে। কিছুটা বুঝতে পারে দেশের অবস্থা। বৌদির কথায় বলে সে—এখনও তেমনিই রয়ে গেছো বৌদি।

কমলা দেখছে ওকে। বিজয় বলে—কুষ্টিয়ার ফিরে যাবে নাকি? ওদিকের আবহাওয়া তেমন ভালো নয়।

কমলা এতক্ষণ নিজের কোন কথা বলার সময়ও পাই নি। বিজয়কে দেখে ওসব ভুলে গেছলো সে। এবার তার নিজের কথা, নিজের সমস্যার কথাও মনে হয়।

কমলা বলে—এখানে আরামবাগ সহরের গার্লসস্কুলে এ্যাসিস্টাণ্ট হেড-মিস্‌ট্রেসের চাকরী পেয়েছি বিজয়।

—আরামবাগ। নামটা শুনে চমকে ওঠে বিজয়।

ওই ছোট্ট সহরে সে যায় নি কোন দিন। তবু তার পরমপ্রিয়জন রয়েছে সেখানে। সাথীর চিঠিতে সেই সহরের একটা ছবিও তার মনে আঁকা হয়ে গেছে। দ্বারকেশ্বর নদীর রূপ নাকি ওখানে সুন্দর। তাদের মহানন্দার কথাই মনে পড়ে। বার বার যেতে মন চায় বিজয়ের।

কমলা ওর মুখেও নামটা শুনে বলে—চেন নাকি আরামবাগ?

বিজয় বলে—ওখানে আমার খুব জানাশোনা ডাঃ দত্ত যার বাড়িতে চিঠি দিতে, তিনিই বদলি হয়ে গেছেন। কাকীমাও যেতে বলেছিলেন বারবার করে কিন্তু যাওয়া আর হয় নি।

কমলা যেন কি নির্ভর খুঁজে পায়। সে বলে।

—তাহলে তুমিও চলো আমার সঙ্গে আরামবাগে আমাকে পৌঁছে দিয়ে ওদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে আসবে। তবু জানাশোনা একজন থাকলেন ওখানে।

বিজয় ঝোঁকের মাথায় কথাটা বলে এখন যেন বিপদে পড়ে।

সাথীর ব্যাপারটা বৌদির কাছে জানাতে পারে নি সে। সেই সত্যটা বৌদির কাছে পরিষ্কার হলে লজ্জাতেই পড়বে সে।

ওকে কি ভাবতে দেখে কমলা চাইল। বলে সে।

—কি হল? এত কি ভাবছো? ওখানে আমার সঙ্গে যেতে অবশ্য যদি আপত্তি থাকে তাহলে একাই যাবো।

বিজয় চমকে ওঠে। বাড়ির ব্যাপার নিয়েই বোধ হয় তার সঙ্গে বিজয়ের না যাওয়ার কথাটাই ভেবেছে। বিজয় এটা মানে না। বলে সে।—না বৌদি! আপত্তি কেন থাকবে? একা একা যাবে নোতুন জায়গায় এ হতে পারে না। আমিই নিয়ে যাবো তোমায়। ভাবছিলাম কলেজের ছুটির কথা, ক'দিন ঠিক ম্যানেজ হয়ে যাবে। প্রক্সিও দিয়ে দেবে কেউ।

তারকেশ্বর স্টেশনে নেমেছে ওরা।

ওদিকে বাস ষ্ট্যান্ড। অনেক বাসই এখান থেকে নানা জায়গায় যায়।

কমলা বলে—এখানে যখন এসেছি বাবার মন্দিরে পুজো দিয়ে যাই বিজয়।

বিজয় বলে—ওই তোমাদের স্বভাব। ঠাকুর দেখলেই দাও পুজো!

হাসে কমলা—এই বিশ্বাসটুকু নিয়ে বেঁচে আছি বিজয়। দেবতার উপর বিশ্বাস না থাকলে রক্ত মাংসের মানুষকেই বা বিশ্বাস করবো কেমন করে?

যাত্রীদের ভিড় সুরু হয়েছে। আশপাশে দোকান পসার চলার সরু পথ। বিজয়ের ভালো লাগে না। বলে সে।

—বিশ্বাস করে কি পেয়েছো বৌদি? ঠকেছো আর পেয়েছো শুধু হতাশার জ্বালাই।

কমলার মুখখানা তবু বিচিত্র হাসিতে ভরে ওঠে। বলে সে।

—কিন্তু জানি অন্ততঃ একজন আমাকে ঠকাবে না, হতাশ করবে না। এইটুকু আশ্বাস নিয়েই আমি খুশী থাকবো বিজয়। আজ দেবতার কাছে সেইটুকুই চাইব—তুমি বড় হও। আর মানুষ হও।

বিজয়ের চোখে জল আসে। তার মাকে ঠিক এমনি করে মনে পড়ে না। ছেলেবেলায় মাকে দেখেছে দূর থেকেই। মা সংসারের যোয়াল টানতে ব্যস্ত। মায়ের এই অনিচ্ছাকৃত অবহেলা বিজয়ের শিশুমনে এনেছিল দুরন্ত অভিমান। তাই সে আজও জেদী গোঁয়ার রয়ে গেছে কোথায়।

কিন্তু বৌদি সেদিন বিজয়ের শূন্য মনকে কি প্রীতিতে ভরে তুলেছিল। আজও বিজয় সেই প্রীতির সঞ্চয়কে হারায় নি, নোতুন করে আবিষ্কার করেছে তার গভীরতা। বৌদির প্রতি নীরব শ্রদ্ধায় তার মন ভরে ওঠে।

মন্দিরে ঘন্টা বাজছে, স্তোত্র পাঠের সুর ওঠে। বিচিত্র এক সৌম্য প্রশান্ত পরিবেশে বিজয়ের মন কি শ্রদ্ধায় নুইয়ে আসে। বৌদির ডাকে খেয়াল হয়। পুজো দিয়ে বের হয়ে এসেছে কমলা। হাতে দেবতার প্রসাদী ফুল বিজয়ের মাথায় স্পর্শ করায়।

বৈকাল নামছে। বাসটা ধুলো উড়িয়ে চলেছে আরামবাগের দিকে। দুদিকে দিগন্ত প্রসারী শস্যরিক্ত মাঠ। এর মধ্যে বাসটা মুণ্ডেশ্বরী নদীর উপরে নড়বড়ে কাঠের পুল পার হয়ে এসেছে। বর্ষায় এই পুলও থাকে না। আর মুণ্ডেশ্বরীর রূপও তখন ভীষণা। তার শাখা প্রশাখার জলও ডুবিয়ে দেয় পথ ঘাট, তাই আরামবাগ তখন দুর্গম হয়ে ওঠে।

এখন ততটা নয়। তবু এ পথের যেন শেষ নেই।

মাঝে মাঝে দু'একটা ছোট জনবসতি—আবার ধু ধু মাঠ। ওরা আরামবাগ পৌছলো তখন বৈকাল-এর আলো ম্লান হয়ে আসছে।

ছোট্ট শহর!

বাস ষ্ট্যাণ্ড-এ কিছু দোকান পশার রয়েছে, ওদিকে সাইকেল রিক্সার ভিড়। ওইটাই এখানের প্রধান যানবাহন।

স্কুলের কেরানীবাবু ছিল, সেইই দুটো রিক্সায় মালপত্র তুলে বিজয় আর কমলাকে নিয়ে বাসায় নিয়ে আসে। বৃদ্ধ ভদ্রালোক বলে—আজ বিশ্রাম করুন। মায়ের জন্য একটি মেয়েকেও এনেছি। ওকে সব দেখিয়ে দেন, করে দেবে। কাল সকালে এসে স্কুলে নিয়ে যাবো সকলের সঙ্গে পরিচয় হবে।

কাজের মেয়েটি এর মধ্যে রান্না ঘরে জল তুলে উনুনে আঁচ দিয়ে চা বিস্কুট এনেছে।

কমলা দেখছে তার নোতুন সংসারকে।

দুখানা বেডরুম, ভিতরে বেশ খানিকটা বারান্দা, ওদিকে বাথরুম—রান্নাঘর। একপাশে টিউবয়েলও রয়েছে। পাচীল ঘেরা ছোট্ট বাড়িটা—বাইরে একটু গাছগাছালির জায়গাও আছে।

ভালো লাগে কমলারও। ও বলে কাজের মেয়েটিকে।

—আঁচ ধরলে বলো ভাতে ভাত চাপিয়ে দেব।

কুসুম বলে—আপনি কেন কষ্ট করবেন, আমিই সব করে দেব। পথের ধকল গেছে, আপনি গোছগাছ করে জিরোন।

সকালের আলোয় বের হয়েছে বিজয়। ওদের বাসার কাছেই দ্বারকেশ্বর নদী। অনেক নীচ দিয়ে বয়ে চলেছে নদীটা।

তবে মহানন্দার মত গভীর নয়, জলও নেই। মহানন্দা হিমালয় থেকে আসছে বরফগলা জল নিয়ে। এ নদী আসছে পুরুলিয়ার পাহাড় অঞ্চল থেকে। বৃষ্টি নির্ভর। তাই বর্ষাকালে এর বিস্তীর্ণ বালুচর ভরে ওঠে। এখন সে মৃত—একটু জলধারা বয়ে চলেছে মাত্র।

ছোট সহরটা গড়ে উঠেছে এর ধারে ধারে। ওপারে আখ-গমের খেতে সবুজের আভা জাগে। বিজয় চলেছে এদিকের তীর ধরে সামনের দিকে। এখন তার অবসর। বৌদি স্কুলে গেছে। সেও বের হয়েছে।

আরামবাগে নোতুন এক পরিবেশে এসে সাথী হাঁপিয়ে উঠেছে। ডাঃ দত্তের সময় নেই। তার নেশা কাজ আর কাজ। এখানের হাসপাতাল নিয়েই তার সময় কেটে যায়। সাথী আর কাকীমা দুজনে বাসায় থাকে।

সাথী এখানের কলেজে ভর্তি হয়েছে। কিন্তু কুচবিহারের মত মুক্ত আন্তরিক পরিবেশ এখানে ঠিক পায় নি।

এখানের ছেলে মেয়েরা একটু কম উচ্ছল। অনেকেই গ্রামের দিক থেকে আসে। তারা একটু সংকুচিত হয়েই থাকে।

কুচবিহারের মত দলবেধে হৈ-চৈ এখানে নেই। সাথীর মনে পড়ে বিজয়ের কথা। আজ কুচবিহার থেকে সেও চলে এসেছে বোধ হয় কলকাতায়।

কলকাতায় এত কাছে এসেও চিঠি দেয় নি। সাথীর মনে হয় বিজয় তাকে ভুলে গেছে। সারা মন তাই নিবিড় বেদনায় ভরে ওঠে। সাথীর যেন কি একটা পরম সম্পদ হারিয়ে গেছে।

একা একাই দ্বারকেশ্বরের তীরে এসে দাঁড়িয়ে থাকে। মনে হয় তার জীবনটাও ওই নদীর বালিয়াড়ির মত বিবর্ণ। কি শূন্যতায় ভরে উঠেছে।

এমনি দিনে চিঠিখানা আসে। বিজয়ের চিঠি।

সে আসছে এখানে। হঠাৎ যে কোনদিনই এসে পড়বে।

চমকে ওঠে সাথী। দিন গুনছে সে। বাস স্ট্যাণ্ড থেকে রিক্সাকে তার কাকার নাম করলেই বাসায় নিয়ে আসবে।

সাথীর মনে জাগে কি তৃপ্তির সুর। বিজয় তাকে ভোলেনি তাই সে পথ চেয়ে আছে।

হঠাৎ কাকে দেখে চাইল সাথী।

তাদের বাড়ির কাছে এসে বিজয় খুঁজছে বাড়িটা।

সাথীই বের হয়ে আসে—তুমি! এলে তাহলে?

বিজয় দেখছে সাথীকে। দীর্ঘ কত দিন পর আজ তার চোখের সামনে সাথীকে দেখে বিজয়ও অবাক হয়।

বদলায়নি সাথী। বরং আরও পূর্ণতা এসেছে ওর দেহে। সুন্দর মুখ ডাগর চোখে ওর খুশীর আভাষ।

সাথী বলে—কাকীমা বিজয় এসেছে।

অতসীও বের হয়ে আসে। এখানে এসেও ওঁর বাঙ্গাল কথার সুর যায় নি। অতসী বলে—আইস বাবা! কতদিন দেখিনি। কুচবিহারের খবর সব ভালো তো? বলে—

সাথী শুধোয়—এ কি! তোমার সুটকেশ—ব্যাগ কিছুই আনোনি? আর এই সাত সকালেই বা এলে কোথা থেকে?

সাথীর কাছে এটা বিচিত্র ঠেকে। বিজয় বলে।

—চলো। সব বলছি।

অতসী কাকীমা ভিতরে গেছে বিজয়ের জন্য চা আনতে।

সাথী আর বিজয় বাইরের ঘরে রয়েছে। বিজয়ের কাছে বৌদির খবর শুনে সাথী খুশি হয়—ও মা! এসব তো লেখনি। চলো বৌদির সঙ্গে পরিচয় করে আসি। এতো মেঘ না চাইতেই জল এসে গেছে। কত দিন ধরে আশা করে ছিলাম বৌদিকে দেখবো—

বিজয় সাথীর খুশিতে ঠিক খুশি হতে পারে নি।

তার মনের কোনে একটা ভয় রয়ে গেছে। বৌদিকে সে চেনে। একাদকে যেমন স্নেহময়ী অন্যদিকে তেমনি কঠিন।

বিজয় বলে—কিন্তু বৌদি যদি জানতে পারে।

সাথী শুধোয়—কি জানতে পারে?

তার মনের কোনে কোন কলুষের ছোঁয়াই নেই। তার প্রেমকে সাথী পবিত্র বলেই জানে। বিজয় বলে।

—আমাদের ইয়ে—মানে।

ঠিক যেন বলতে পারে না সে। সাথী হেসে ওঠে। বিজয় চাইল ওর দিকে।

সাথী বলে—বোকারাম কোথাকার!

সে আশ্বাস দেয়—ঠিক আছে ওর জন্য তোমাকে ভাবতে হবে না।

বিজয় সাথীর সাহসে একটু আশ্চর্য হয়েছে।

মনে হয় বিজয়ের, ছেলেরা ভালবাসলে বোকাই হয়ে যায়, আর মেয়েরা অনেক সাহসী, সাবধানী হয়ে ওঠে।

অতসী কাকিমাও চা খাবার এনে বলে।

—তোমার বৌদি তো এখানে থাকছেন, একদিন এনে পরিচয় করিয়ে দাও।

সাথী বলে—আমিই আনছি আজ বৈকালে কাকীমা।

কমলা স্কুল থেকে বাসায় ফিরেছে। সকালে স্কুল-তাই দুপুর থেকেই তার অবকাশ। আর এখানের স্কুলের পরিবেশটাও ভালো লেগেছে। সুন্দর স্কুল বাড়ি। হেড মিসট্রেস প্রবীনা মহিলা, কমলাকেও ভালো লেগেছে তার। সেক্রেটারী ভদ্রলোক এখানের নামকরা উকিল? বয়স্ক প্রবীন বিভূতিবাবুকে সহরের সকলেই চেনে।

বিভূতিবাবু বলেন—এখানে রইলে মা কোন অসুবিধা হলে বুড়োকে জানাবে। দ্বিধা করো না।

কমলা এখানে থাকার আশাও পেয়েছে মনে মনে।

বৈকাল নামছে। বিজয়-এর মনে ভয়টা জমে ওঠে। হঠাৎ দরজার কড়া নাড়তে দেখে এগিয়ে যায়। কমলাও দেখছে মেয়েটিকে।

ফর্সা ছিমছাম পোষাক পরা সুন্দরী মেয়েটি এসে প্রণাম করে। পরনে তাতের হাল্কা রং এর শাড়ি। নিটোল হাতে দুগাছি বালা—সুন্দর ফর্সা গলায় চিক চিক করছে সোনার হার।

বিজয় চুপ করে আছে। সাথীই বলে।

—আমি সাথী বৌদি! কুচবিহারে ছিলেন ডাঃ দত্তর ভাইঝি।

এখানেই এখন এসেছেন কাকা। আপনি এসেছেন শুনে কাকীমা বললেন নিয়ে আয়। আলাপ পরিচয় হবে।

সাথীকে দেখছে কমলা। মনে পড়ে কমলার ডাঃ দত্তর ঠিকানাতেই বিজয়কে কুচবিহারে চিঠি দিত সে। কিন্তু সেখানের এত কথা জানিয়েছে বিজয় সাথীর কথা একবারও জানায় নি।

আর ওখানে আসার ব্যাপারে প্রথমে বিজয়ের সেই অমতের কথাটাও মনে পড়ে।

সাথী বলে—বিজয়দার মুখে আপনার কত কথা শুনেছি তখন থেকেই দেখার ইচ্ছা ছিল। আজ সে সুযোগ হায় গেল। চলুন।

বিজয় চুপ করে বসে আছে। সাথী বলে।

—তুমিই বা বাড়িতে বসে কি করবে? চলো একটু বেড়িয়ে আসবে।

কমলা দেখছে বিজয়কে। ওর মুখে চোখে নীরব ভাব। বিজয়ও দেখেছে বৌদির চোখে কি একটা প্রশ্ন জেগে উঠেছে। বৌদিকে চেনে সে। এখন না হোক পরে এর জবাব দিহি করতে হবে তাকে।

অতসী কাকিমা কমলাকে দেখে খুশী হয়। বলে সে।

—এখানে তো থাকলে সাথী যাবে খোঁজ খবর নিতে, তুমিও চলে এসো মা। আমার দেখছো তো সংসার-এর কাজ নে ডুবতাছি!

সাথী কমলাকে নিয়ে ওঘরে বসে কি কথা বলছে। এসব কথার যেন শেষ নেই। বিজয়কে এখন যেন চেনে না সে। কি নীরব অবহেলায় বিজয়কে এঘরে বসিয়ে রেখে ওঘরে হাসি গল্পের পশরা মেলেছে।

সন্ধ্যা নামছে কমলা-সাথী-কাকীমা বের হয়ে আসে। ঘরে ফিরতে হবে। বিজয়ও ওদের পিছু পিছু এসেছে। সাথী বলে।

—বৌদি। তোমার মর্নিং স্কুল, আমার কলেজও সকালে। দুপুরে বই নিয়ে চলে যাবো, পড়াশোনাও হবে আর আড্ডাও!

হাসে কমলা—বেশতো! এসো—তবে মাস্টার হিসাবে আমি কিন্তু খুব কড়া। আড্ডাটা ঠিক হবে না।

হাসছে সাথী। কাকীমা বলে।

—তাই কও বাছা মাইয়ারে। আমি কই তোর নিজের পায়ে দাঁড়ানো লাগবো। ভালো কইরা পড়—কে যে শোনে আমার কথা!

কমলা বলে—এবার আমি দেখছি ওকে। চলি আজ।

বিজয় আর কমলা ফিরছে ওদের বাসার দিকে। কমলা বলে।—মেয়েটি বেশ হাসি খুশি প্রাণ খোলা!

অর্থাৎ ভালো লেগেছে সাথীকে কমলার। বিজয় কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়। বৌদি তেমন কিছু সন্দেহ করে নি।

ওরা বাসার দিকে এগিয়ে চলেছে, নদীর বালুচরে তখন চাঁদের আলোর

জোয়ার নেমেছে। বিজয়ের মনে তবু একটা বেদনার ক্ষীণ সুর জাগে। সাথী যেন তাকে এড়িয়ে গেছে।

বিজয় বলে—কাল ফিরতে হবে বৌদি!

কমলা চাইল ওর দিকে। ওকে আটকাতে চায় না। ক্লাস কামাই হচ্ছে।

বলে কমলা—কাল খেয়ে দেয়ে দুপুরে যাবে। আর ছুটি ছাটা থাকলে চলে আসবে কিন্তু!

বিজয় কি ভাবছে।

সকালেই বৌদি বের হয়ে যাবার পর বিজয়ও এসেছে এ বাড়িতে।

সাথী পড়ায় ব্যস্ত। ওকে দেখে চাইল।

বিজয় কালকে ওর অবহেলাটার কথা ভোলেনি। ইচ্ছা করেই সাথী তাকে এড়িয়ে গেছে।

বিজয় কি অভিমান করে বলে—আজ বিকেলেই কলকাতা ফিরছি।

সাথী দেখছে ওকে। বিজয়ের মুখে কালো ছায়াটা দেখে হেসে ফেলে সাথী। বলে সে—আমার উপর খুব রাগ করেছ না?

অর্থাৎ বিজয়ের রাগ করার কারণ কিছু ঘটিয়েছে সে এটা সাথীও জানে। বিজয় বলে।

—চিনতেই পারছো না কাল থেকে। কি এমন অপরাধ করলাম!

সাথী হঠাৎ ওর কাছে এগিয়ে আসে। ওর দুটো হাত দিয়ে বিজয়ের অভিমান ভরা মুখখানা তুলে চাইল। ওর দুচোখের চাহনি দিয়ে সাথী যেন নিজেকে মেলে ধরেছে বিজয়ের কাছে। ওর উষ্ণ নিঃশ্বাস পড়ে বিজয়ের গালে মুখে। ওই নিবিড় স্পর্শটুকু বিজয়কে কি আশ্বাস এনে দেয়।

সাথী বলে—ওটা না করলে বৌদি কি ভাবতো বলোতো? বোকার মত ধরা দিয়ে কি লাভ হতো?

বিজয় এটা ভাবেনি। দুজনের মধুর এই সম্পর্কটা তাদের দুজনের মনেই সীমিত রয়েছে। এ তাদের কাছে অপূর্ব একটি অনুভূতি। অন্যকে এই গোপনতম সংবাদটুকু তারা জানাতে চায় না।

আজ সাথীকে দীর্ঘদিন পর আবার আপন করে কাছে পেয়েছে বিজয়। সাথী তার জীবনের পথে হারিয়ে যায় নি। এত দূরে নির্জনেও সাথী তার পথ চেয়ে ছিল। থাকবেও।

সাথী বলে—আবার এসো কিন্তু!

বিজয়-এর সারা মন কি তৃপ্তিতে ভরে গেছে। বলে সে।

—আসবো সাথী। তোমার জন্যই আরও এসেছিলাম এখানে। হাসে সাথী। বলে সে—তা জানি।

বিজয় বের হয়ে এল। আরামবাগের বালুচর-গাছ গাছালি তার চোখে কি

অপরূপ রূপে ধরা পড়েছে।

কলকাতায় ফিরেছে বিজয় অন্যমন নিয়ে। আজ তার একটা সত্বাকে যেন আরামবাগের সবুজ গ্রামসীমায় রেখে এসেছে।

বৌদির কথা মনে পড়ে। ভালো করে পড়াশোনা করতে হবে বিজয়। ফাষ্ট ক্লাস অনার্স না থাকলে এম-এস্ সিতে চান্স পাবে না। ডাক্তারী ইংজিনিয়ারিং এ ভালো হবে না।

বৌদি তাকে এগিয়ে যেতে দেখতে চায়। সেই গতিময়তার মাঝে দাঁড়াবার কোন অবকাশ নেই।

আর সাথী তার জীবনে এনেছে একটি স্নিগ্ধ অবকাশ মুহূর্তের স্বাদ। জীবনকে অনুভব করার—তার থেকে রূপ রস আহরণ করার ইঙ্গিত। দুটি নারীকে আজ বিজয় দেখেছে দুইরূপে।

বৌদি—আর সাথী যেন জীবনের দুটি দিক। একজন ভালোবেসে বাধন হারা হয়ে উধাও মুক্তির আশ্বাস আনে বৃহত্তর জগতে। আর সাথী চায় তার সীমিত পরিবারে নিবিড় প্রেমের বাধনে দুজনে একটি ছোট নীড়ের স্বপ্ন রচনা করতে।

বিজয় ভাবছে কথাটা। দুটি বিপরীত ধর্মী নারীর মাঝে সে যেন তার পথ ঠিক করে নিতে চায়।

কলেজের ছুটির অবসরে এর মধ্যে দু তিন বার গেছে আরামবাগে। দুএক দিন থেকেছে। সাথীকে আরও কাছে পেয়েছে। সাথীর দু চোখে দেখেছে কি একটি স্বপ্ন।

বলে সে—পাশ করে এম-এস সি পড়ে নাও। একটা প্রফেসারি পেয়ে যাবে। শহর থেকে দূরে কোথাও ছোট্ট একটা ঘর বাঁধবে।

হাসে বিজয়—সেই ঘরে কি হবে? একা-একা ঘরে থাকা যায়?

সাথী বলে—কাউকে সঙ্গী করে নিও।

—কাকে?

সাথী যেন বিজয়ের এই কথায় হতাশই হয়। বলে সে।

—জানি না!

দুজনে চাদনীরাতে বালুচর থেকে ফেরে বাসার দিকে। ওদের মনে জাগে বিচিত্র একটি সুর।

কমলা দেখেছে বিজয়কে এখানে আসতে।

সাথী অন্য সময় তার বাসাতে প্রায়ই আসে। কিন্তু লক্ষ্য করেছে কমলা বিজয় এলে সাথী এখানে আসে না।

এড়িয়ে যায়।

প্রথম প্রথম কমলার এটা ভালোই ঠেকতো। মেয়েটি যেন বিজয়কে পাত্তা

দিতে চায় না।

কমলা মনে মনে এইটাই চেয়েছিল। ও জানে অপরিণত প্রেমের সার্থকতা নেই। বিজয়কে চেনে সে। তার মত জেদী ছেলে যদি কোন প্রেমের জালে জড়িয়ে পড়ে সে নিজেকে হয়তো শেষ করে দেবে।

কিন্তু কমলা তা চায় না। বিজয়ের উপর তার অনেক আশা। তুচ্ছ কোণে আটকে থেকে বিজয়কে ফুরিয়ে যেতে সে দেবে না। তাই তার উপর তার নজরও রয়েছে।

বিজয় এলে কমলার শূন্য দিন গুলো ভরে ওঠে। নিজে রান্না করে। গল্পগাছা—পড়াশোনার কথায় দিন কেটে যায়। সাথীর না আসার অভাবটা বুঝতে পারে না।

তবু কমলার সাবধানী মন কোথায় যেন কিছু টের পেয়েছিল। ভেবেছিল এ হয় তো বিজয়ের ক্ষণিকের দুর্বলতাই। মনে মনে কিছুটা কৌতুকও বোধ করেছিল।

সাথীকেও দেখেছে কমলা। বিজয় সম্বন্ধে তার মনে কিছুটা শ্রদ্ধার আভাষই পেয়েছিল মাত্র।

সেদিন রাত্রি হয়ে গেছে। বিজয় বেড়াতে বের হয়েছে বিকেলে তখনও ফেরে নি। কমলা কিছুটা ভাবনায় পড়ে। কুসুমকেও পাঠিয়েছিল ডাক্তারবাবুর বাড়িতে, বিজয় হয়তো ওখানে গল্প করছে তাই ডেকে আনতে।

কুসুম বলে—দাদাবাবুকে ওখানে দেখলাম না। আগেই বের হয়ে গেছে ওখান থেকে।

একটু অবাক হয় কমলা। মনে হয় শুধুবে সাথীর কথা। কিন্তু কুসুমকে ওর খবর জিজ্ঞাসা করতে তার বাধে। একাই ভাবছে কমলা।

কি ভেবে নিজেই বের হয়ে আসে। বাড়ির এদিকেই নদীর রূপালি বালুচর আবছা চাঁদের আলো পড়েছে মুক্ত নদীর বুকে। নদীর নির্জন তীরভূমিতে একটা বড় গাছের ছায়া। আঁধার নেমেছে। জায়গাটা বাঁধানো। বিকেলে অনেকে বসে এখানে।

এখন নির্জনই।

কমলা আনমনে আসতে আসতে ওই ছায়া অন্ধকার গাছের নীচে দুজনকে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে কি নিভৃত আলাপ করতে দেখে থমকে দাঁড়ালো।

চাঁদের আলো ওখানে অনেক কম। পত্রাবরণে আটকে গেছে আলোটুকু এই আলো আঁধার নির্জনে বিজয় আর সাথীকে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে আলাপ করতে দেখে চমকে ওঠে কমলা।

দুজনে যে এতখানি এগিয়েছে সেটা আজ আবিষ্কার করেছে সে। আর সাথী—বিজয় দুজনেই তাকে এত বড় ব্যাপারটা গোপন রেখেছিল।

কমলার সারা মনে ঝড় ওঠে।

এগোতে পারে না সে। কোন রকমে সরে এসে নিজের বাসায় ঢুকলো।

নীরব রাগে কমলার সারা মন ভরে উঠেছে। বিজয়ও যে এতবড় খবরটা তার কাছে লুকিয়ে রেখেছিল প্রথম থেকেই-ইচ্ছা করেই এটাও বুঝেছে কমলা।

সাথীকেও আজ নোতুন করে চিনেছে সে। মনে হয় কমলার, সাথীর জন্যই বিজয় এখানে আসে।

রাত্রি নেমেছে। বিজয় বাসায় ঢুকে কমলাকে গম্ভীর হয়ে বসে থাকতে দেখে বলে—তুমি খেয়ে নাও নি কেন বৌদি। সহরের দিকে গিয়েছিলাম দেরী হয়ে গেল—

কমলা দেখছে ওকে।

বিজয় যেন বদলে গেছে। কমলা বলে।

—হাত মুখ ধুয়ে খেয়ে নাও।

বিজয় অবাক হয়—তুমি খাবে না?

কমলার মনে ঝড় উঠেছে। সেই ঝড়টাকে চেপে রেখে বলে সে।

—না! শরীর ভালো নেই।

বিজয় খেয়ে দেয়ে শুতে যাবে বৌদিকে দেখে চাইল। কমলার মুখ চোখ থমথমে। কমলা বলে।

—সামনে ফাইন্যাল পরীক্ষা, এখন আর এখানে না এলেও চলবে।

কাল সকালেই ফিরে যাও কলকাতায়।

বিজয় হঠাৎ বৌদির এই পরিবর্তনে চমকে ওঠে। বলে সে।

—কিন্তু—

কমলা বলে—ওসব কথা থাক। যা বললাম তাই করবে। আর একটা কথা বজু সামান্য কিছুর লোভে বড় কিছুকে হারানোর মত ভুল করো না। জীবনটা অনেক বড়। যা করার সাধ্য নেই সেটা করার মিথ্যা আশ্বাসও কাউকে দিও না।

বিজয় চাইল ওর দিকে। বৌদি ও ঘরে চলে গেছে।

বিজয়ের সারা মনে ঝড় ওঠে। হঠাৎ বৌদিকে এভাবে বদলে যেতে দেখে স ঘাবড়ে গেছে। জানে বৌদির কাঠিন্যের পরিচয়। হয়তো সাথী আর তার ব্যাপারটা বৌদি জেনে গেছে।

বিজয় চুপ করে কি ভাবছে। তার জীবনের এমনি জটিলতার কথা সে আগে ভাবেনি। এ সমস্যা সমাধানের কোন পথ তার জানা নেই।

আশ্বাস সে দেয় নি সাথীকে। আশ্বাস দেবার সাধ্য তার নেই। আজও বেকার সে। কিন্তু কেউ যদি ভবিষ্যৎ-এর রঙীন স্বপ্ন দেখে সে কি করতে পারে?

এ কথা বৌদিকে বুঝিয়ে বলার সাধ্য তার নেই। চলেই যেতে হবে কাল

এখান থেকে। পরীক্ষার কথাও মনে আসে এবার।

ছোট্ট সহরের অনেকেই অনেককে চেনে। বাদলবাবু এখানের বাসিন্দা ওকালতি করেন এখানে আদালতে। খুব নামী উকিল নাহলেও দিন চলে যায় তার। লোকটি নিরীহ গোছের।

বাদলবাবুর স্ত্রীও দেখেছে সাথীকে। তাদের মেয়ে চিত্রার সঙ্গে কলেজে পড়ে। এ বাড়িতেও দু একবার এসেছে চিত্রার সঙ্গে।

বাদলবাবুর স্ত্রীও স্নেহময়ী জননী।

সাথীর পরিচয় অন্য খবরা খবর জেনে সেদিন বাদলবাবুর স্ত্রী মালতীর কথাটা মনে হয়। কিছুদিন থেকে কথাটা ভেবেছে, তারপর বাদলবাবুকে বলে মালতী।

বাদলবাবুর দাদা বেশ কিছুদিন আগে গত হয়েছেন।

বৌদি তার পরের বছরই মারা যান। ফলে তাদের একমাত্র ছেলে প্রশান্তকে বাদলবাবুরাই মানুষ করেছিলেন।

প্রশান্ত কাকা কাকীমাকেই সব থেকে আপন বলে জানে।

প্রশান্ত এখান থেকে বি-এ পাশ করে রেলে চাকরী করছে।

এখন কর্ড লাইনের মশাগ্রামের সহকারী ষ্টেশন মাষ্টার।

ওখানেই কোয়ার্টারে থাকে। মাঝে মাঝে ছুটি পেলে প্রশান্ত কাকা কাকীমার কাছে আসে।

বেশ ভালো ছেলে। মালতী বাদলবাবুকে বলে।

—সাথী মেয়েটি কিন্তু বেশ। দেখতে শুনতেও ভালো। পড়াশোনাতেও রূপগুণ দুইই আছে। প্রশান্তের সঙ্গে মানাবেও ভালো। পালটি ঘর।

তাই বলছিলাম কথাটা ওর কাকাবাবুকে বলো না?

বাদলবাবু কথাটা ভাবে নি। তবে প্রশান্তের বিয়ের কথাবার্তা চলছে দু এক জায়গায়।

স্ত্রীর কথায় বাদলবাবু বলে—কিন্তু ওরা তো বাঙাল, আমরা তো ঘটি ওরা রাজী হবেন কি? আর প্রশান্তের মতামত আছে।

মালতীদেবী কিছুটা আট ঘাট বেঁধেই এগিয়েছে।

প্রশান্ত সেবার ছুটিতে বাড়ি আসতে চিত্রাকে বলে সাথীকেও এখানে এনেছিল মালতী। অবশ্য ব্যাপারটা চিত্রা-সাথী দুজনের কাছেই অজানা ছিল, এমনকি প্রশান্তের কাছেও।

তবে প্রশান্ত দেখেছিল সাথীকে।

মালতী বলে—প্রশান্তের অমত হবে না। আর ডাক্তারবাবুর স্ত্রীকে না হয় আমিই কথাটা জানাবো। তবে জানো—প্রশান্ত ভালো চাকরী করছে, জমিজিরাত —বাড়ি ঘরও আছে। ছেলেও ভালো। দাবী দাওয়াও কিছু করবো না, ওদের

মত হয়ে যাবে মনে হয়।

বাদলবাবু স্ত্রীকে অনেক সময় মেনে চলে। দেখেছে সাংসারিক বুদ্ধিটা তার চেয়ে মালতীর কম নেই। তাই বলে বাদলবাবু।

—বেশ তো। তুমি যখন বলছো দ্যাখো!

মালতী জানতো তার স্বামীর অমত হবে না এ ব্যাপারে।

বিজয় কলকাতায় ফিরেছে বেদনাহত মন নিয়ে।

বৌদি যে এভাবে তাদের ব্যাপারটা ধরে ফেলবে আর এমনি কঠিন হয়ে উঠবে তা ভাবেনি। বিজয়ের মনে হয় বেশ কিছুটা বাড়াবাড়ি করে ফেলেছিল সে। বোকার মত প্রতিমাসেই দু'একবার করে ওখানে যেতে বৌদির হয়তো সন্দেহ হয়েছিল।

আসার দিন সকালে এক ফাঁকে গিয়েছিল বিজয়।

বৌদির বাড়ি থেকে সকালেই সুটকেশটা নিয়ে বাস ধরার জন্যর বের হয়ে ওই পথেই গিয়েছিল সাথীদের বাড়ি।

ডাঃ দত্ত সকালেই কি কাজে হাসপাতাল গেছেন। কাকীমা পুজোয় বসেছে।

বাইরের ঘরে বিজয়কে আসতে দেখে সাথী চাইল। বিজয়ের মুখ চোখে বেদনার ছায়া।

ওকে এসময় দেখে সাথীও অবাক হয়।

—কি ব্যাপার ?

বিজয় বলে—আজই চলে যাচ্ছি সাথী। বৌদি আমাদের সব কিছু ব্যাপার টের পেয়ে গেছেন।

—সে কি। সাথী চমকে ওঠে।

বিজয় বলে—কাল রাতে নদীর ধারে আমাদের দেখেছে, হয়তো আমাদের কথাও কিছু শুনেছেন। কাল বেশ দুচারটে কড়া কথা শোনালেন।

এখানে আসি এটা তিনি চান না।

তাই চলে যাচ্ছি আজ সকালেই।

সাথী ভাবছে কথাটা।

এতদিন ধরে ওদের যে প্রেম নির্জন নিভৃতে গড়ে উঠেছিল বিনা বাধায়, দুজনে যে স্বপ্ন জগৎ গড়েছিল আজ তার আকাশে উঠেছে ঝড়ের কালো মেঘ। আজ বিজয়ের বিবর্ণ মুখের দিকে চেয়ে সাথী তার বিপদের গুরুত্বটা অনুভব করেছে। বলে সে।

—তুমি বৌদিকে কি বল্লে ?

বিজয় চুপ করে থাকে। বৌদির মুখের উপর কোন কথা সে বলতে পারে

নি। চুপ করে ওর শাসনটাই শুনেছে।

সাথী বলে—অন্যায় তো কিছু করিনি। তুমি একথাটা বললে পারতে। আর এ আমাদের নিজেদের ব্যাপার—এর মধ্যে ওর বলার কি থাকতে পারে।

সাথীর এই বেপরোয়া ভাব দেখে বিজয় কিছু বলতে পারে না। তবে আজ সাথীকে নোতুন করে চিনেছে সে। সাথী বলে।

—ওখানে না আসো এ বাড়িতে আসবে। আমাদের মধ্যেই থাকুক এটা। এত সহজে আমাদের দুজনকে কেউ সরিয়ে দিতে পারবে না বিজয়। তুমি যদি সত্যিই ভালোবাসো—

বিজয়ের সারা মনে কি সাহস জাগে।

সাথীকে পাশে পেলে সে সব বিপদ প্রতিবাদের মখোমুখি হতে পারবে। তার ভালোবাসায় কোন খাদ নেই।

বিজয় বলে—তোমাকে ভালোবাসি সাথী। তোমাকে ছেড়ে একা একা জীবনের বাঁচার পথ চলার কথা ভাবতেই পারি না।

সাথী দেখছে ওকে। বলে।

—যতই বিপদ আসুক, আমি তোমার পাশেই থাকবো। তুমি আবার আসবে। এখানে উঠবে। দরকার হয় দুজনে সবকিছুর মুখোমুখি হবো। ভালো করে পরীক্ষাটা দাও—ওর উপরই সবকিছু নির্ভর করছে আমাদের ভবিষ্যৎ!

বিজয় কলকাতা ফিরেছে, এত দুঃখের মধ্যেও সাথীর কথাগুলো তার হতাশ ভরা মনে একটা আশ্বাস এনেছে। সাথী তাকে ভুল বোঝেনি। বরং তার বিপদে তার পাশে দাঁড়াবার কথাই বলেছে।

সামনে ফাইন্যাল পরীক্ষা। বিজয় সাথীর কথা মনে করতে পারে। ভালো ভাবে পাশ করতেই হবে। ফাষ্ট ক্লাশ অর্নাস পেতে হবে। দরকার হয় একটা চাকরী নিয়ে সে আর সাথী ঘর বাঁধবে।

ওদের কারোও কথা তারা মানবে না। বৌদিকে যে ভাবে হোক তখন মত করাবেই।

সুখী হবে তারা।

বিজয় তাই যেন পড়াশোনাতেই ডুবে গেছে।

সাথী বিজয় চলে যাবার পর কিছুদিন যায়নি বৌদির ওখানে। মনে মনে আজ একটা নীরব ভয়—কিছুটা অভিমানই হয় বৌদির উপর। মনে হয় প্রতিটি নারীর মনের অতলে রয়ে গেছে কিছু হিংসা আর সস্য়া।

মা হোক—মাতৃসমা বৌদিই হোক তারা বোধ হয় চায় না তাদের ছেলে অন্য কোন মেয়েকে ভালোবাসুক, তাদের নিজেদের নিভৃত জগৎ গড়ে তুলুক।

তাই তারা প্রতিবাদ করবেই। প্রেমকে তারা তাই সমর্থন তো করবেই না, সামাজিক অপরাধ বলেই অভিহিত করে। আজ তাই সাথীও যেন বৌদির

কাছে অপরাধী হয়ে উঠেছে বিনা দোষে। সাথী কলেজে যায়। বাড়ি ফিরে আসে।

অতসী বলে—বৌমা আইছিল, ওখানে যাস নাই কদিন। তোরে যাইতে কইছে।

সাথী কথাটা শোনে মাত্র। কোন জবাব দিল না।

অতসী কাকিমার সাথীকে ওখানে পাঠাবার কারণ একটা ছিল। এর মধ্যে বাদলবাবুর স্ত্রী এখানে এসে তার দেওরের ছেলে প্রশান্তের সঙ্গে বিয়ের কথা বলেছে। ডাঃ দত্তও শুনেছেন কথাটা।

ছেলে হিসাবে প্রশান্ত ভালোই! সরকারী চাকরী করে, বাড়ি ঘর জমিজমাও আছে। কোন দাবী দাওয়াও নেই। তবু ডাঃ দত্ত তার ভাইঝির বিয়েতে খরচ কিছু করবেন।

ডাঃ দত্ত বলেন ওর বিয়েটা দিলে তবু দায় মুক্ত হই, বেশতো কথাটা ভেবে দেখে জানাও ওদের।

অতসী কথাটা কমলার সঙ্গেও আলোচনা করেছে। দেখেছে কমলার অমত নেই। তাই অতসী কাকিমা কমলাকেই বলেছেন সাথীকে জানাতে। তাই সাথীকে ওখানে পাঠানো দরকার।

কিন্তু সাথীকে চুপ করে থাকতে দেখে বলে।

—কি হল? বেচারা একা থাকে, যাতি কইছে।

সাথী বলে—উনি একাই থাকতে চান। যেতে বলছো, যাবো না হয়!

অতসী কাকিমা ওর কথায় খুশি হন নি। বলেন।

—তর যত সব তালি বালি কথা!

কমলা সেদিন বিজয়কে ওই সব কড়া কথা বলে পরে নিজেই দুঃখ পেয়েছিল। কিন্তু এসব কথা না বলে পারে নি। জীবনে সে দেখেছে অনেক কিছু। বিজয় এই ভালোবাসার বোঝা টানতে গিয়ে ফুরিয়ে যাবে এটা ভাবতেই পারে নি কমলা। তাই সরাবার জন্যই ওকে কঠিন হতে হয়েছিল।

বিজয়ের জীবনে এই দুঃখটাই তাকে বড় হবার, এগিয়ে যাবার জেদ আনবে। সামান্য কিছু পেয়ে সেই তৃপ্তিতে বিজয়কে ফুরিয়ে যেতে দিতে চায় না কমলা।

নিজেও ভেবেছে কথাটা। তাকে আরামবাগ থেকে চলে যেতে হবে। না হলে বিজয় এখানে আসবে না।

কমলা এর মধ্যে দু একটা অন্য স্কুল কলেজে ইনটারভিউ দিয়েছে। বারাসত গার্লস কলেজে হয়তো চাকরিটা পেয়ে যাবে। কলকাতার কাছেই—কমলা সেখান থেকে ডক্টরেট করতে পারবে। কলকাতার কাছেই বিজয়কেও দেখতে পাবে।

সাথীকে বৌদি কিছুদিন এড়িয়ে থাকতে দেখে তার মনে হয়েছে সাথী—বিজয়ের ব্যাপারটার গভীরতা। বিজয়ের চেয়ে, সাথীকেই কমলার কোথায় বেশী

ভয়। মেয়েরাই ছেলেদের বিদ্রোহী করে তুলতে পারে।

তাই সাথীর বিয়ের কথা শুনে অতসী কাকিমাকে সে তার কথা বলেছিল সাথী হয়তো মিথ্যা স্বপ্নই দেখছে।

বিজয়কে সে বিভ্রান্ত করতে পারে। এমনি একটা কিছু ঘটলে হয়তে ভালোই হবে।

সাথী আজ এই প্রেমের স্বপ্ন ভুলে নোতুন নিশ্চিন্ত জীবনকে মেনে নিয়ে সুখী হবে।

বিকেল নামছে। সাথীকে আসতে দেখে চাইল কমলা।

হঠাৎ ওকে দেখবে ভাবতে পারে নি। কিছুদিনের মধ্যে সাথীর চেহার খারাপ হয়ে গেছে। মুখ চোখে সেই খুশির আবেশ নেই। চুলগুলো উস্কে খুস্কো। ওর মনের অতলে যেন অহঃরহ একটা ঝড় চলেছে।

কমলা বলে—কদিন আসোনি?

সাথী চুপ করে থাকে। কমলা দেখছে ওকে। কঠিন হতে পারে না কমলা নিঃসঙ্গ মেয়েটির সঙ্গে তারও জীবনের যেন একটা মিল রয়ে গেছে। মনে পড়ে তার অতীতের কথা।

প্রেম সব ছেলেমেয়ের জীবনেই থাকে বিস্মৃত একটি ইতিহাস হয়ে। কমল বলে।

—আমি বোধ হয় এখান থেকে চলে যাবো সাথী। বাইরে একটা কলেজে চান্স পাচ্ছি।

কমলার দিকে চাইল সাথী। কমলা বলে।

—আমাকে তুমিও ভুল বুঝেছো বোধ হয়, তোমরা দুজনেই। চমকে ওঠে সাথী। বৌদি—বিজয় আর তাকে নিয়েই ইঙ্গিতটা করেছে। সাথী বলে—ভুল কেন বুঝবো?

কমলা শোনায়—জীবনটা বহু বিচিত্র আর বড় সাথী। এখানে মানুষ ভাবে এক, কিন্তু সব তেমন ঘটে না। এমন কিছু ঘটে তার উপর মানুষের হাত থাকে না। তোমার কাকীমা কথাটা বলতে পারেন নি তোমাকে, আমাকে বলেছেন। তোমার বিয়ের চেষ্টা করছেন ওরা।

চমকে ওঠে সাথী। সব ব্যাপারটাই যেন তার কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠেছে সাথীকে ওরা কৌশলে সরিয়ে দিতে চায় বিজয়ের কাছ থেকে।

সাথী বলে—বিয়েতে আমার মত নেই। আমি পড়তে চাই—

বি-এ পাশ করে এম-এ—

হাসে কমলা। বলে সে।

—তারপর আমার মত নির্জন নিঃসঙ্গ ব্যর্থ জীবনের বোঝা বয়ে স্বাধীন হবা নামে কোন স্কুলে মাষ্টারী করবে?

সাথী চাইল ওর দিকে। কমলা বলে।

—বিজয় তো বেকার। এখন ছাত্র। তাব রোজকারও কিছু নেই। ওসব স্বপ্নই থেকে যাবে তাই বলছি।

সাথীর মনের সব প্রতিবাদ যেন হঠাৎ কি অসহায় বেদনায় অশ্রু হয়ে ঝরে পড়ে। চমকে ওঠে কমলা।

সাথীর দুচোখে জল নেমেছে। ওখান থেকে সে বের হয়ে গেল নিজেকে সামলাবার জন্য। তাকে কেন্দ্র করে বাড়িতে এসব ষড়যন্ত্র চলেছে ভাবেনি।

অতসী কাকীমাকেই আজ কথাটা শুধোবে। এ বিয়েতে মত সে দেবে না। সে সব কষ্ট সয়েও একজনের জন্য প্রতীক্ষা করবেই। সে বিজয়।

সাথী চলেছে বাড়ির দিকে বিক্ষুব্ধ মন নিয়ে।

হঠাৎ বাড়ির সামনে কিছু লোকজন—হাসপাতালের এ্যাম্বুলেন্স দেখে চমকে ওঠে। ওকে দেখে সহকারী ডাঃ সেন ওর দিকে চাইলেন।

সাথীর মনে হঠাৎ কেমন একটা ভয় নেমেছে।

শুধোয় সে—কি ব্যাপার ডাঃ সেন?

ডাঃ সেন সাথীকে দেখে কি যেন বলতে গিয়েও পারেন না। বলেন—ভিতরে যাও, ইয়ে তোমার কাকাবাবু হঠাং হাসপাতালে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। কাকীমাকে নিতে এসেছি। তুমি এসে পড়েছো ভালোই হয়েছে।

সাথী ব্যাকুল কণ্ঠে শুধোয়—কি হয়েছে কাকাবাবুর?

ডাঃ সেন বলেন—তেমন কিছুই নয়। গাড়ি এনেছি কাকীমাকে নিয়ে এসো।

সাথী ভিতরে চলে গেল। কাকীমা ওকে দেখে ভরসা পায়।

বলে—এসে পড়েছিস সাথী। চল বাছা—কি বিপদ দেখতো!

বিপদটা যে সত্যি সত্যিই এসে পড়বে তা ওরা ভাবতে পারে নি।

অতসী—সাথী এসে পড়েছে হাসপাতালে, কিন্তু তখন যা হবার হয়ে গেছে।

ডাঃ দত্ত হাসপাতালে কাজ করতে করতে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন, ডাঃ সেন অন্য একজন ডাক্তারও এসে পড়েন। কিন্তু ম্যাসিভ হার্ট এ্যাটাক। তাই ওদেরও করার কিছু ছিল না। সব চেষ্টা ব্যর্থ করে ডাঃ দত্ত ওখানেই মারা যান।

অতসী কাকিমার চোখের সামনে যেন বিনা মেঘে বজ্রঘাত হয়েছে। সাথীও ভাবতে পারে নি এমনি একটা ঘটনা ঘটবে। আজ যেন তাদের এত বড় সর্বনাশটাকে ভাবতেই পারে নি।

পায়ের নীচ থেকে তাদের মাটি সরে গেছে।

কমলা এসে পড়ে। সহরের অনেকেই আসেন। বাদলবাবু উকিল, ওর স্ত্রী মালতীও এসেছে। আজ বিদেশী মানুষটির জন্য অনেকেই দুঃখ বোধ

করে।

শ্বারকেশ্বরের বালুচরে সন্ধ্যার অন্ধকার নামে, একটি চিতার আগুনও নিভে এল, নিভে গেল একটি জীবন দীপ।

অতসী কাকীমা সব হারিয়ে ফিরে এসেছে তাদের বাসায়।

কমলাও এসেছে, আজ সে তার নিজের বাসায় ফিরতে পারে নি। শোকসন্তপ্ত এই পরিবারের পাশে এখানেই রয়ে গেছে। আর সাধ্যমত সব ব্যবস্থা করেছে বাদলবাবু, তার স্ত্রী।

ওই পরিবারটিও আজ এদের চরম বিপদের দিনে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। সব রকম সাহায্য করেছে।

সাথীর সারা মনে একটা ঝড় বয়ে গেছে। বেশ বুঝেছে সে কাকাবাবুর রোজকারেই চলতো তাদের। হঠাৎ কাকাবাবু চলে যাওয়ার পর তার অদৃষ্টে কি ঘটবে তা জানে না। দেশেও ফেরা যাবে না, এখানে দূর সম্পর্কের কোন আত্মীয়ের গলগ্রহ হয়েই থাকার চেষ্টা করতে হবে। কতদূর সফল হবে তা জানে না।

কাকীমার বোঝা আর বাড়াতে সে চায় না। কিন্তু কোন পথই দেখে না সে।

সাথীর মনে পড়ে বিজয়ের কথা। আজ মনে হয় যদি সে কোন পথের সন্ধান দিতে পারে।

বিজয়ের ফাইন্যাল বি-এস-সি পরীক্ষা চলছে কিছু দিন—আর সময়ও নেই তার। যেন ঝড় বয়ে চলেছে।

পরীক্ষার পর্ব শেষ করে সে দিন হোস্টেলে এসেছে বিজয়। মাস তিনেক ছুটি। বাবা লিখেছেন পরীক্ষার পর দেশে চলে আসতে। তিন মাস কলকাতায় বসে থাকার কোন দরকার নেই। ফল বের হলে তবে কলকাতায় ফিরবে।

প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা বাকী আছে, মধ্যে দিন পনেরো অবসর—একটু বিশ্রামই নেবে বিজয়।

কর্মহীন এই দিনগুলোয় আরামবাগে যেতে মন চায়। কিন্তু বৌদির উপর কি অভিমানেই বিজয় সেখানে যেতে চায় না। তবু মনে পড়ে সাথীর কথা। আরামবাগের সেই শ্বারকেশ্বরের বালুচর মুক্ত প্রান্তর, ছায়াঘন নদীতীর—সাথীর কথা বার বার মনে পড়ে।

হঠাৎ সেদিন হোস্টেলে ফিরে সাথীর চিঠিটা পেয়ে চমকে ওঠে।

সাথী লিখেছে—

—বোধ হয় পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে। তাই চিঠি দিলাম: ভালো পরীক্ষা দিয়েছো নিশ্চয়! একবার এখানে এসো—খুব জরুরী আলোচনা আছে। নিশ্চয়ই আসবে।

সাথী আজ তাকে ডেকেছে।

বিজয়ের মনে পড়ে বৌদির কথা। বৌদি তেমন কিছুই জানায় নি।

কিন্তু সাথী যেন বিপদেই পড়েছে। বিজয় যাবেই। যেতে তাকে হবেই।

বৌদিকে যা হয় কিছু বলবে। পরীক্ষার পর ক'দিন ছুটি তাই চলে এসেছে সে।

বিজয় ভেবেছিল সাথীদের বাড়িতেই সোজা যাবে বাস স্ট্যান্ড থেকে। কিন্তু সেটা খুবই খারাপ দেখাবে। বৌদিকে অপমান করতে পারবে না বিজয়।

তাই বিজয় বাস থেকে নেমে বৌদির ওখানেই গেছে।

বিকেল নামছে। কমলা স্কুল থেকে ফিরে পরীক্ষার খাতা পত্র নিয়ে বসেছে। এমন সময় বিজয়কে আসতে দেখে একটু অবাক হয়।

—তুমি!

বিজয় বৌদিকে প্রণাম করে বলে।

—পরীক্ষা হয়ে গেল, কদিন খুব চাপ গেল তাই পরীক্ষার পর ভাবলাম দিন কতক একটু ঘুরে যাই। ফিরে গিয়ে প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা দিয়েই দেশে ফিরে যাবো।

অর্থাৎ তাই এসেছো এখানে। কমলা শুধোয়।

—পরীক্ষা কেমন দিলে? ফার্স্ট ক্লাশ অনার্স থাকবে তো?

বিজয় শোনায় দিয়েছি তো ভালোই। দেখা যাক—

কমলা বলে—হাত মুখ ধুয়ে নাও। চা করছি।

বিজয় ছটফট করছে। সাথীদের ওখানে যেতে চায় সে। বের হবার সুযোগ খুঁজছে সে। তাই বৌদির কথায় বলে—

—আবার ওসব হাঙ্গামা কেন করবে? আমি বরং বাইরে চা খেয়ে আসছি।

কমলা চাইল ওর দিকে। বিজয়ের এই চাঞ্চল্য তার চোখেও পড়েছে।

বলে কমলা—তার দরকার হবে না।

কমলা অনুমান করেছে ব্যাপারটা। বিজয় চা-খাবার নিয়ে বসেছে। কমলা বলে—সাথীদের খবর শুনেছো?

বিজয় চাইল ওর দিকে। বলে সে—কই না তো?

সাথীদের কোন খবর জানে না সে। সাথীও লেখেনি কিছু।

কমলা ওর কাকাবাবুর মৃত্যু সংবাদটা দিতে চমকে ওঠে বিজয়। সাথীদের এতবড় সর্বনাশে সে কিছুই করতে পারে নি। সাথী আজ তাকে ডেকেছে, হয়তো কিছু বলতে চায় ওকে।

কিন্তু তার আগেই এত বড় দুর্ঘটনার খবরে মুষড়ে পড়ে বিজয়।

কমলা বলে—ওরা খুব বিপদেই পড়েছে। কাকাবাবুই ছিল ওর গার্জেন। তিনিই ওর খরচ চালাতেন। এখন কাকীমা ওর বোঝা কত দিন টানতে পারবেন? মেয়েটার দুর্ভাগ্য বিজয়।

বিজয়ের সারা মনে নীরব ঝড় ওঠে।

সাথী আজ বিপদে পড়েছে। বিজয়ের সাধ্য থাকলে আজ সাথীকে সে নিজের ঘরেই আনতো। কিন্তু সে বেকার। আজও তাকে সংসারের কাছে হাত পাততে হয় নিজের জন্য। আর ক'টা বছরও যদি সময় পেতো তাহলে আজ বিজয়ের কাছে এটা সমস্যাই হতো না। বরং সাথীকে সাহায্য করতে পারলে সুখী হতো সে।

বিজয় স্তব্ধ হয়ে গেছে।

কমলা দেখছে বিজয়কে। ওর মুখে নীরব বেদনার কালো ছায়াটাকে দেখেছে সে। বলে কমলা।

—ওর কাকীমা এখানের বাসা তুলে দিয়ে কলকাতায় কোন আত্মীয়ের ওখানে চলে যাবেন। ক'টা দিন আর থাকছেন এখানে। আমিও চলে যাচ্ছি বারাসত কলেজে প্রফেসারী নিয়ে।

বিজয় শুনেছে কথাগুলো।

কমলাই বলে, এখানের এক উকিল তার ভাইপোর সঙ্গে সাথীর বিয়ে দিতে চান। কোন দাবী দাওয়াও নেই। ছেলেটি রেলের এসিষ্টাণ্ট ষ্টেশন মাষ্টার। ওর কাকীমা চান বিয়েটা দিয়ে ওর ভারমুক্ত হয়ে যেতে। একটা মেয়ের বোঝা টানবার সামর্থ ওর আর নেই।

বিজয়কে যেন কে তার মৃত্যুদণ্ডের কথাই শোনাচ্ছে।

সাথী তার জীবন থেকে সরে যাবে, এ যেন কোন এক নিষ্ঠুর নিয়তিরই বিধান। সাথী কথাটা তাকে খুলে বলতে পারে নি তাই চলে আসতেই লিখেছে।

বিজয় বৌদির সামনে নিজের আগ্রহ চেপে রেখে বলে।

—তাহলে ওদের খুবই বিপদ। এসে পড়েছি যখন—তখন কাকীমার সঙ্গে দেখা করে আসি।

কমলা বাধা দিতে পারে না।

বিজয়কে দেখে কাকীমার দুচোখে জল নামে। তার রিক্ত বেশ দেখে বিজয় চমকে উঠেছে। একটা মানুষের অভাবে আজ এদের সারা বাড়িটা শূন্য হয়ে গেছে। এদের জীবন যাত্রার সব সুর ও ছন্দ ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। কাকীমা বলে—এমন সর্বনাশ হবে তা ভাবতে পারিনি বিজু!

বিজয়ও ভাবনায় পড়েছে।

সাথীর সেই হাসি খুশি ভাব আর নেই। কি ভাবনায় তার সেই ভাবটুকুও মুছে গেছে। ডাগর চোখে নেমেছে বেদনার আভাষ।

সাথী বলে—তাহলে সবই শুনেছো?

বিজয় শুনেছে সবই। সাথী বলে ম্লান বিষণ্ণ সুরে।

—কাকীমা চান দায় মুক্ত হতে, আমিই বা কোথায় আর যাবো জানি না—

বিজয়ও ভাবছে কথাটা। এর সমাধানের কোন পথ সে জানে না।

তবু বলে বিজয়—একটু ভাবতে সময় দাও সাথী। বি-এস-সি পরীক্ষার রেজাল্ট বের হোক।

হাসলো সাথী। সেই হাসিটা যেন কান্নার চেয়েও করুন।

বলে সে-সব ঘটনাগুলো এমনি হঠাৎ ঘটে যাবে তা ভাবিনি বিজয়। আজ শুধুমাত্র মান সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকার আশ্বাসটুকুও আমার হারিয়ে গেছে। জানিনা কি হবে আমার—

ওর দুচোখে জল নামে।

বিজয় চুপ করে থাকে। ওকে সান্তনা দেবার ভাষা তার নেই।

বিরাট আকাশের বুকে হাজারো তারার রোশনী জাগে, তবু এই তমসা দূর হয় নি। এত বড় পৃথিবীতে বিজয় আর সাথীর জন্য যেন কোন ঠাই নেই। তবু পথ তাদের বের করতেই হবে।

বিজয়-এর মনে হয় বাবাকেই বলবে কথাটা। কিন্তু সাহস হয় না। নিজের দায়িত্ব তার নিজেরই নেওয়া উচিত। তাই ভাবছে সে—

কমলা জানতো বিজয় ওখানেই গেছে। ওকে গম্ভীর হয়ে ফিরতে দেখে চাইল।

খাওয়াতে বিজয়ের যেন রুচি নেই। কমলা ওর অন্তরের ঝড়টাকে বুঝেছে। আজ বিজয়ের জন্য দুঃখ হয়। কিন্তু জীবন বড় কঠিন ঠাঁই। এখানে ওই সব দয়ার কোন ঠাঁই নেই।

—বিজু। বিজয় বৌদির ডাকে চাইল।

রাত্রির স্তব্ধতা নেমেছে। কমলা বলে—

—খুব দুঃখ পেয়েছ না? পাওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু এর সার্থকতা কি আছে বলতে পারো? অনেক কিছু আশা করে মানুষ, কিন্তু জীবন এমন বিচিত্র যে এখানে সেই হিসাব চলে না। সে তার নিজের পথেই চলে, আজ সাথীকেও তাই নিজের পথে চলতে হবে। সেখানে কিছু করার সাধ্য তোমার নেই। তুমি সেখানে অসহায়। ওর অন্য কিছু করতে চাইলেও তা পারবে না। এক্ষেত্রে তোমার ওর পথে বাধা না হয়ে দাঁড়ানোই ভালো নয় কি? না হলে তুমিও দুঃখ পাবে ও বেচারার জীবনটাকেও হয়তো ব্যর্থ করে দেবে।

চমকে ওঠে বিজয়।

ওর সামনে কোন পথই নেই। বৌদি সব জেনেছে।

আজ বলে বিজয়—কিন্তু এতদিনের পরিচয়—

কমলা বলে—বন্ধুত্ব হয়েছিল—ভালোও বেসেছিলে। সাথীও হয়তো ভালোবেসেছিল। কিন্তু সত্যি যদি ভালোবেসে থাকো বিজয়, ওকে ওর জগতে যেতে দাও। সুখী হতে দাও, শান্তি খুঁজে পেতে দাও ওর নোতুন ঘরে।

বিজয়ের মন মানে না। ঘর সেও তো বাঁধতে চেয়েছিল। বলে বিজয়

—কিন্তু ঘর আমিও বাঁধতে চেয়েছিলাম বৌদি।

কমলা হাসল। বলে সে।

—কিন্তু তার জন্য প্রস্তুতির দরকার। যোগ্যতার দরকার। সেগুলোর কিছুই নেই তোমার! ওকে মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে ওর সামান্য পাওয়াকে বিবিয়ে দিও না বিজয়। তোমারও বয়স হয়েছে, কথাটা ভেবে দেখো। কাউকে ঠকানোর চেয়ে নীরবে সরে যাওয়াই ভালো।

বিজয় বলে—কিন্তু সাথী কি ভাববে?

কমলা বলে—সে আজ না হোক পরেও তোমার অসহায় অবস্থার কথা বুঝো তবু তোমাকে ক্ষমা করতে পারবে কিন্তু তাকে ঠকালে সে তোমাকে কোনদিনই ক্ষমা করবে না। ঘৃণা করবে সারাজীবন তোমাকে।

চুপ করে যায় বিজয়।

তার সারা মনে কথাগুলো নীরব ঝড় তুলেছে। রাত্রি নামে। কমলা বলে—ভেবে দেখো। যদি সত্যিই ওর ভালো চাও তাহলে আর দেখা করে ওর মনে ঝড় তুলোনা বিজয়। কালই চলে যেও। আমি সামনের মাসে বারাসত গার্লস কলেজে যাচ্ছি ওখানেই দেখা হবে।

বলে বৌদি—ভালো যদি বেসে থাকো তবে ব্যর্থতার এই জ্বালাটা তোমার মনে জেগে থাক বিজয়। হয়তো এই জ্বালাটাই একদিন তোমাকে সার্থক করে তুলবে। এই দুঃখেরও প্রয়োজন আছে জীবনে বৃহত্তর কল্যাণের জন্য।

যাও, রাত হয়েছে। শোও গে।

বিজয় ঘুমুতে পারে না। কি দুঃসহ জ্বালা তাকে অস্থির করে তুলেছে।

এ যেন এক দুঃসহ রাত্রি।

বিজয়, বার বার ভেবেছে কথাটা। নিজেকে এত অসহায় বোধ করে নি কোনদিন। যেন একটি নিমজ্জমান নৌকায় রয়েছে সে। নৌকটি তলিয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে, চারিদিকে তার অকূল সমুদ্র, সাঁতার জানে না সে। ডুবতেই হবে তাকে। হিমশীতল মৃত্যুর পদধ্বনি শুনছে সে।

সামনে তার করাল মৃত্যুর কালো ছায়া।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল জানে না।

চারিদিকে আলো আর সানাই এর সুর অপরিচিত শতমানুষের ভিড়। বিয়ের আসরে সেও এসেছে। কাউকে চেনে না। বর কনেও রয়েছে সামনে যজ্ঞকুম্ভ, বিয়ের মন্ত্রপাঠ হচ্ছে।

হঠাৎ কনের দিকে চেয়ে চমকে ওঠে। কনেচন্দন-দামী বেনারসী শাড়ি গহণা পরে দাঁড়িয়ে আছে একটি মেয়ে। মুখে তার কি এক নোতুন জীবনের সলজ্জ কৌতূহল।

বিজয় চেনে মেয়েটিকে।

সাথী চলে যাচ্ছে অন্য কারো ঘরে। সানাই এর সুর ওঠে।

বিজয় ওই আসরেই চীৎকার করে ওঠে, না—না! সাথী!

স্বর বের হয় না, তার কণ্ঠস্বর যেন রুদ্ধ হয়ে গেছে। সারা দেহে কি উত্তেজনা। এগিয়ে যাবার চেষ্টা করে, কারা বাধা দেয় তাকে। চীৎকার করতে চায়, পারে না। কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে গেছে।

হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যায়।

বিজয় কি একটা স্বপ্ন দেখছিল। সারা গা ঘেমে গেছে, জানলার ফাঁক দিয়ে দিনের আলো এসে পড়েছে, পাখীর কলরব শোনা যায়। মনটা কি নিবিড় বেদনায় ভরে ওঠে।

ভোরের স্বপ্ন সত্যি হয়। এ যেন তার জীবনে চরম-কঠিন একটি সত্যেই পরিণত হয়েছে। সেই পরাজয়কে আজ সাথীর ভালোর জন্যই মেনে নিতে হবে তাকে।

কমলা ওকে দেখে চাইল।

বিজয় মনস্থির করে ফেলেছে। বলে সে,

—সকালের বাসেই চলে যাচ্ছি বৌদি।

কমলা ওর কথার সুরে বেদনার নিবিড়তাটুকুকে অনুভব করে।

বিজয় বলে—জীবনে এমনি করে হেরে যাবো তা ভাবিনি বৌদি। এমনি করে সব হারিয়ে যাবে তাও ভাবিনি। সাথীর এত বড় বিপদেও কিছু করতে পারলাম না, সাথী আমাকে কাপুরুষই ভাববে। কিন্তু—

কমলা বলে,

—এ ছাড়া পথ ছিল না বিজয়। কিন্তু হারবে কেন? এই হারানোর দুঃখ তোমাকে আরও বড় করে তুলবে, নিজের স্বার্থে শুধু সাথীকেই নয় দেশের দশের জন্য সত্যিকার কিছু করে তোলার সামর্থ এনে দেবে। এই শপথটা মনে রেখো বিজয়।

তবেই জানবো সাথীকে সত্যকার ভালো বেসেছিলে। না হলে জানবো এ ভালোবাসা প্রেম নয়। এ শুধু দেহের, চোখের নেশা মাত্র।

বিজয় শুনছে কথাগুলো।

সাথীর সঙ্গে দেখা করার মুখও তার নেই। সকালের আলো ভরা ছোট জনপদ জেগে উঠছে। বালুচর ভরে গেছে সোনা রোদে। বিজয় আজ ওখান থেকে চলে আসছে।

আর কোনদিন এখানের ছায়াঘন পাখী ডাকা জনপদে আসবে না, তার জীবনের বহু স্বপ্ন দেখা সঙ্গী সেই সাথীকেও এই দূর জনপদে রেখে বিজয় চলেছে।

জীবনে আর তার সঙ্গে দেখা হবে কিনা জানে না। একটি উজ্জ্বলতম স্বপ্নরঙ্গীন বিচিত্র স্বপ্নকে সে এখানে রেখে নিজে হারিয়ে গেল।

বাসটা চলেছে ধূসর—শস্যরিক্ত প্রান্তরের বুক চিরে দিগন্তের পথ ধরে। ওই পথ কোথায় গেছে জানে না। কিন্তু সব পথই বিজয়কে ঘরছাড়া করেছে, নবাবগঞ্জ থেকে কুচবিহার, সেখান থেকে কলকাতা—আরামবাগ বিভিন্ন ঠাঁই-এ এনেছে। কিন্তু শুধু জীবনের পাত্র কি বেদনাতেই ভরে তুলেছে।

আরও কি কোথায় আছে জানে না। কিন্তু তার নিয়তি যেন দুর্বার বেগে তাকে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে পথে পথে। এ পথের ধারে কোথাও সবুজ শস্য শ্যামল প্রান্তর, জলভরা নদী, কোথাও ধূধূ শস্যরিক্ত প্রান্তর, রুক্ষ বালুচর। সবকিছুই তার সামনে নিঃস্বতার ছবি নিয়ে ফুটে ওঠে, তার মাঝ দিয়ে পথ চিরে চলেছে, আর চলেছে একটি ক্লান্ত নিঃস্ব পদাতিক, কিসের সন্ধানে, কেন তা জানে না সে।

ছায়াঘন আরামবাগ অনেক পিছনে ফেলে বাসটা চলেছে।

ওই পথ আপাততঃ এসে থেমেছে মালদহে। গাঝারি গোছের সহর। পদ্মার সীমা পারে বেশ কিছুটা এসে ছোট শহরটা। চারদিকে সবুজ ছায়াঘন আমবাগান, কোথায় ছোট্ট জনপদ—চারদিকে তুতের সবুজ গাছগুলো মাপ মত ছাটা। রেশম পোকার খাদ্য ওই পাতা গুলো।

বালি বালি মাটি—তার বাদিকে মহানন্দার কোল ঘেসে ছোট্ট শহর। এককালে তেমন নাম ডাক ছিল না। তবু কোট কাছারি পুলিশ লাইন ছিল। এখন দেশ বিভাগের পর ওপার বাংলার অনেক মানুষ এসে ভিড় করেছে।

ফলে এখন আশপাশে নোতুন মহল্লা, বাড়ি গড়ে উঠেছে। শহরেরও অনেক বড় বাড়িগুলো ওপার বাংলার মানুষরা কিনে নিয়ে আবার মেরামত করে বাস করছে।

মলয়—আশীসরাও নবাবগঞ্জের দিক থেকে এসেছে ইংলিশবাজার অঞ্চলে বাড়ি করেছে, বিজয়ের বাবা মনোতোষবাবু দূরদর্শী লোক। তিনি আগে থেকেই এমন কিছু ঘটবে ভেবেই ওপার বাংলার ব্যবসাপত্র জমিজায়গা বিক্রী করে বারহারোয়া—মালদহ, এর ওপাশে পুরোনো মালদহ অঞ্চলেও বাড়ি ঘর জমি-জায়গা করেছেন। এখানেরও সহরে ব্যবসাপত্র করেছেন।

বয়স হয়ে আসছে তাঁর।

সারা জীবন খেটে খেটে আজ তিনি ক্লান্ত। ছেলেদের তবু প্রতিষ্ঠিত করে যেতে চান।

বিজয় পরীক্ষা দিয়ে কলকাতা থেকে ফিরেছে। মালদহের বাড়িতে নিয়েই উঠেছে। মা অবাক হয়।

—এ কি রে! এমনি শরীর খারাপ হয়েছে তোর?

বিজয়ের দেহমনের উপর দিয়ে যেন ঝড় বয়ে গেছে। ক'দিনের মধ্যে তার সবকিছু হারিয়ে গেছে। সাথীও আর নেই, তার জীবন থেকে সে হারিয়ে গেছে চিরদিনের জন্য।

বিজয়কে সেও শেষ চিঠি দিয়েছিল কি অভিমান ভরেই। হয়তো সাথীও এই ব্যাপারটাকে মেনে নিতে চেয়েছিল। বলেছিল সে—যা ঘটতে চলেছে তাতে তোমারও কোন হাত নেই। আমারও। এটাকে তাই মেনে নিতেই চেষ্টা করবো। তোমার সঙ্গে আর দেখা হবে কিনা জানি না। তুমি সাবধানে থেকো। আর আমাকে ভুলে যাবার চেষ্টাই করো।

পারো তবে বিয়ে থা করে সংসারী হয়ো। খবরটা পেলে আমিও নিশ্চিন্ত হবো।

সাথীর কথাগুলো আজও ভোলেনি বিজয়।

ভুলতে তাকে সে পারবে না। জীবনের প্রথম আর হয়তো শেষ প্রেমই। বিজয় মায়ের কথায় ওসব প্রসঙ্গে এড়িয়ে গিয়ে বলে।

— পরীক্ষার চাপ ছিল কি না!

মা বলে—কিছুদিন এখন বিশ্রাম নে বাবা।

বিজয়েরও কাজ এখন নেই। এর মধ্যে সহরের বিভিন্ন এলাকায় ছড়ানো আশীষ—মলয়দের খুঁজে বের করেছে। মলয় ওখানের একটা স্কুলে মাস্টারি করছে। নোতুন স্কুল গড়ে উঠছে নবাগত ওপার বাংলার মানুষদের মহল্লায়। সবে প্রথম অবস্থা।

কোন রকমে কিছুটা পাকা, কিছুটা মুলিবাঁশের বেড়া মাথায় টিনের ছাউনি দেওয়া স্কুল। তবে ছাত্রের অভাব নেই।

মলয় ওদের মহল্লার তেমনি একটা স্কুলে রয়েছে। আশীষ অবশ্য ম্যাট্রিক পাশ করে তেমন কিছুই করে না। ও স্বপ্ন দেখছে তার বড়দাও চিঠি দিয়েছেন তাকে জার্মানীতে চলে যাবার জন্য।

সে ভিন্‌দেশের স্বপ্ন দেখছে।

মলয় বলে বিজয়কে—পরীক্ষা দিয়ে তো এলি। ভাল ছেলে তুই, বি-এস-সি ঠিকই পাশ করবি। এখন বাড়িতে না বসে থেকে এখানে মাস্টারি শুরু কর।

বিজয় একটু অবাক হয়। তার স্বপ্ন সে এম-এস-সি পড়বে। বলে মলয়।
—ক'মাস তো কাজ কর! তারপর না হয় চলে যাবি কলকাতায় পড়তে। ভালো সায়েন্স টিচার নেই স্কুলে, তুই লেগে পড়। তাহলে রতিদাকে বলি।

রতিকান্ত ঘোষ স্কুলের সেক্রেটারী কাম্ প্রতিষ্ঠাতা। সব শুনে রতিবাবুও বলেন।

—তাই করো বিজয়। লাইগা পড়ো, পড়ার চচ্চাটাও থাকবো। পোলাপাণ-গুলানেরও কাম হইব। তবে মাইনা এহন বেশী দিতি পারবো না। কিছু

অবশ্য দিমু !

বিজয়েরও সময় কাটে না। কর্মহীন অলস দুপুরে ঘরে যেন বন্দী হয়ে থাকে।

বার বার মনে পড়ে সাথীর কথা। কুচবিহারের সেই স্বপ্নরঙ্গীন দিনগুলো। আরামবাগের কটা দিন তার মনে যেন ঝড় তোলে।

বারবার নিজেকে অসহায়-পরাজিত বলেই বোধ হয়। বিজয় স্কুলের কাজটা নিয়েছে।

আশীষ জার্মানী যাবার জন্য সঙ্গী খুঁজছে। আরও কিছু টাকাও তার চাই। বিজয়ের বাড়ির অবস্থা ভালোই। মলয়ও কিছু টাকা জামিয়েছে, দাদাকে সেও লিখেছিল যদি তার পাথের সংগ্রহ করার জন্য আরও দু'একজনকে সে দেশে নিয়ে যায় আর তাদের যদি সেখানে কাজ হয়ে যায় তাহলে আশীষেরও এদের ঘাড়ে ভর করে বিদেশে যাওয়া হবে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর জার্মানীতে কাজের লোক কমই রয়েছে। তাদের দেশকে নোতুন করে গড়ে তোলার কর্মকাণ্ড সুরু হয়েছে। বিভিন্ন কারখানা—সহরকে ঢেলে সাজাতে হচ্ছে। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ জার্মান জাতকে যেন প্রায় শেষ করে দিয়েছে। কাজের লোকের অভাব।

তাই আশীষের বড়দাও জানেন এখানে কাজের অভাব হবে না। বরং কাজের লোক এরা চাইছে। তাই সেও তার ছোট ভাইকে জানায় যে তার সঙ্গে তার আরও দুই বন্ধুকে আনলেও এখানে থাকা—কাজের ব্যবস্থাও হয়ে যাবে তাদের। এখানে লোকের চাহিদা রয়েছে।

স্কুলের কাজ করছে বিজয়। কেমন বিশ্রী একঘেঁয়ে বোধ হয়। বিজয়-এর মনে হয় তার যেন এখানে করার কিছুই নেই। ক'মাস কেটে গেছে।

বি-এস-সি পরীক্ষার ফলও বের হয়েছে। আর সবচেয়ে হতাশ হয়েছে বিজয়। প্রাকটিক্যাল পরীক্ষাগুলো তার বেশ খারাপ হয়ে গেছল মানসিক অবস্থার জন্য। সাথীই যাবার আগে তার মনে ঝড়ে তুলে গেছে। আর তার জন্যই বিজয় প্রাকটিক্যাল পরীক্ষাতে কোন রকমে পাশ করেছে মাত্র ফলে অনার্স নামমাত্র। সেকেণ্ড ক্লাশ অনার্স।

বি-এস-সি পরীক্ষায় তেমন কোন কৃতিত্বই দেখাতে পারে নি সে।

কলকাতা ইউনিভার্সিটিতে ওই নাম্বার নিয়ে এম-এস সি পড়া যাবে না।

বিজয়ও মুষড়ে পড়েছে।

সাথীও নেই। সামনে তার এগিয়ে যাবার পথও রুদ্ধ। জীবনভোর এই মফঃস্বল সহরের একটা স্কুলে তাকে সায়েন্স টিচার হয়ে ব্যর্থ নিঃস্ব জীবনের বোঝা বয়ে চলতে হবে।

মলয়ও বুঝেছে বিজয়ের মনের অবস্থা।

বলে সে—এত মুষড়ে পড়লে চলবে? বেশতো দ্যাখনা কল্যানী, বর্ধমান না হয় নর্থবেঙ্গল ইউনিভার্সিটিতে চান্স পেয়ে যাবি হয়তো।

বিজয় যেন হেরেই গেছে। এখানের উপরই তার বিতৃষ্ণা এসেছে। বলে বিজয়—এখানে কিছুই আমার হবে না। এই ভাবে সব হারিয়ে আর হেরে গিয়েই বাঁচতে হবে। এ আমি চাইনা রে!

মলয় এমনিতে একটু বেপরোয়া।

জীবনটাকে সে হেসে খেলেই কাটাতে চায়। দুঃখবোধটাও তার কম। বলে সে—তোর যত সব বাজে কথা। এ দেশ ছেড়ে কোথায় যাবো বল?

আর কি যোগ্যতা আছে যে বিদেশে গিয়ে হাত পা গজাবে।

বিজয় বলে—এ দেশে কাজ করার গণ্ডীও কম, যোগ্যতা কি আছে না আছে কিছু করার এ দেশে তার যাচাইও হবার সুযোগ কম।

মলয় শোনায়—বিদেশে গিয়ে যদি হেরে যাস তখন? এ তবু নিজের দেশ।

বিজয়-এর চোখের সামনে ছেলেবেলার বৌদির সেই কথাগুলো, সেই স্বপ্নগুলো জেগে ওঠে। সারা পৃথিবীটা তার ঘরের গ্লোবের মধ্যে সীমিত।

বলে সে—দুনিয়ার সীমা এখন অনেক ছোট হয়ে গেছেরে।

পৃথিবীর নানা দেশে নানা সুযোগ আছে। হয়তো কোথাও তাই খুঁজে নিতে হবে।

সন্ধ্যা নামছে মহানন্দার বালুচরে।

এমনি নবাবগঞ্জের ধারেও সন্ধ্যা নামে। এই মহানন্দা তাদের শৈশবের ছেড়ে আসা নবাবগঞ্জের কোল দিয়ে বয়ে আসছে। সেই নদী তীরে এমন আগত সন্ধ্যার অন্ধকারে একটি কিশোর কোন দূরদেশের স্বপ্ন দেখেছিল।

আজও সেই স্বপ্ন—তার বৌদির কথাগুলো ভোলেনি। সাথীর কাছেও হেরে গেছে বিজয়।

তাই যে ভাবে হোক এই জীবনযুদ্ধে তাকে জয়ী হতেই হবে। যে কোন দেশে হোক গিয়েও তাকে বড় হতে হবে।

এমনি দিনে আশীষ তার বড়দার চিঠিখানা আনে।

জার্মানীর কোন এক ছোট্ট সহর ডুসেলডর্ফ সেখানের ছাপমারা চিঠিখানা আজ তিনটি তরুণের মনে কি নোতুন এক অভিযানের স্বপ্ন আনে।

বিজয় পড়েছে চিঠিখানা।

মলয় শুধোয় আশীষকে, কত টাকা লাগবে রে যেতে?

আশীষ বলে—জাহাজেই যাবো সস্তায় হবে। বোম্বে থেকে জাহাজে উঠে ট্রালিতে নামবো। সেখান থেকে ট্রেনে ডুসেলডর্ফ।

মলয় বলে—যেন মালদহ থেকে শিয়ালদহ যাবার মতই ব্যাপার! শালা গড়গড় করে তো বলে গেলি। কিন্তু হ্যাপা কত জানিস?

পাশপোর্ট—ভিসা, জাহাজের টিকিট। তারপর শীতের দেশ। তোর চাদর সোয়েটারে চলবে না। প্যান্ট কোট-ওভার কোট এসব চাই।

ভাবছে ওরা। বিজয় বলে।

—ওসব হয়ে যাবে। তুই আর আমি দুজনে আশীষের ভাড়াটা দেব। আশীষ তুই সেনদাকে লিখে দে আমরা যাবার ব্যবস্থা করছি। উনি যেন থাকার আর কাজের ব্যবস্থা করে জানান আমাদের।

আশীষ এতদিন ধরে ওই দূরে দেশে যাবার স্বপ্নই দেখেছিল। আজ সেই স্বপ্ন তার সফল হতে চলেছে। আশীষ বলে।

—মাইরী বলছিস? তাহলে লিখে দিই। আর পাশপোর্ট-এর দরখাস্তও দিয়েই দিই।

বিজয় বলে—তা দিতে হবে। তবে এ খবর এখন কেউ জানতে না পারে। শেষে যদি যাওয়া না হয় সারা সহরে অনেকে টিটকারী দেবে তাই এসব কাজ গোপনে করে যা। যাওয়া হলে তখন জানবে সবাই।

মনোতোষবাবু বিজয়ের কথা শুনে চাইলেন। বাবাকে কথাটা জানাতে হয় তাকে। নিজেও কমাসে. স্কুলের মাইনেটা জানিয়েছে বিজয় কিন্তু সে সামান্যই। তার কিছু টাকারও দরকার।

মনোতোষবাবু ভাবতেও পারেন নি বিজয় এমনি দূরে দেশে যাবার কথা ভাবছে। পাসপোর্ট-এর ব্যবস্থাও হয়ে গেছে। বিজয় যেন চিরকালই এবাড়ির থেকে স্বতন্ত্র একটি সত্বা।

মনোতোষবাবু বলেন।

—এ দেশে থেকেও তো কিছু করা যায়? তুমি ভেবোনা যে টাকার জন্য তোমাকে বাধা দিচ্ছি। ও টাকা দিতে খুব অসুবিধা হবে না। আমি ভাবছি তোমার অসুবিধার কথা। ভিন্ দেশ, ভিন্ন ভাষা, পরিবেশ অনিশ্চিত জীবন।

বিজয়ের কাছে ওসব বাধা বড় হয়ে ঠেকে না। বিজয় বলে।

—ও সবে আটকাবে না বাবা। সেনদা ইংলিশ বাজারের সেনবাড়িব ছেলে তিনিও তো রয়েছেন। আমরা তিনজন বন্ধু যাচ্ছি ওখানে। জার্মানীতে কিছু করতে পারবোই।

মনোতোষবাবু জেদী ছেলেটির দিকে চেয়ে থাকেন।

মনে হয় ও ভিন্ন ধাতুতে গড়া। তিনিও ভাবেন যদি সেখানেও কিছু করতে পারে বাধা দেবেন না।

বলেন মনোতোষবাবু।

—দ্যাখো যা ভালো বোঝো করো, আমি তোমাকে বাধা দেব না। তবে বলবো—সেখানে গিয়ে যদি কোন অসুবিধা বোধ করো দেশে ফিরে আসবে। এখানে মোটামুটি ভদ্রভাবে বাঁচার সংস্থান তোমার আছে, থাকবে।

বিজয় বাবার কথায় নিশ্চিন্ত হয়। জানতো সে ওই সংযত মানুষটির অন্তরে একটা উদারতা আছে। তার পরিচয় আজ সে নোতুন করে পেয়েছে।

কিন্তু মা অবাক হয়। তার নারীমন কি ব্যাকুলতায় ভরে ওঠে।

বলে মহামায়া—সে কি রে? কোথায় কোন মুল্লুকে যাবি?

বিজয় হাসে। বলে।

—ভয় নেই মা। তোমার বিজয়ের মত অনেক মায়ের ছেলেই আজ বিরাট পৃথিবীর কোণে কোণে রয়েছে, ভালোভাবেই রয়েছে। আমিও হারাবো না।

তবু মায়ের মন মানে না।

কিন্তু বিজয় মাকেও রাজী করায়।

তিনজনের পাশপোর্ট হয়ে গেছে। জার্মানী থেকে সেনদার চিঠিও এসেছে। ওরা এলে এখানে থাকার, চাকরীর ব্যবস্থাও হয়ে যাবে। সুতরাং আর যাবার বাধা কিছু নেই।

কলকাতায় গিয়ে ভিসা, জাহাজের টিকিটের ব্যবস্থাও করে এসেছে।

এক গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় তিনটি তরুণ মালদহ থেকে ট্রেনে উঠলো কলকাতার উদ্দেশ্যে।

মায়ের চোখে জল নামে। ভিড় করেছে পিসীমা মেজদি বাড়ির সকলে। বাবাকে প্রণাম করতে তিনি বিজয়কে বুকে টেনে নিয়ে বললেন—সাবধানে থাকবে।

আজ মালদহটাকেও যেন বড় ভালো লাগে বিজয়ের।

ছোট সহরটাকে অজানতেই তারা ভালোবেসে ফেলেছিল। তাই ছেড়ে যেতে মন কাঁদে।

ট্রেন এসে গেছে।

মলয় আশীষের সঙ্গে বিজয়ও উঠেছে। আজ রাতের অন্ধকারে মালদহকে পিছনে ফেলে ওরা চলেছে দূর কোন দেশের দিকে। মলয় বলে—কি রে আশীষ! চুপ করে আছিস যে! মন কেমন করছে?

আশীষ-এর চোখ দিয়ে হঠাৎ জল নামে।

বিজয় মলয় হাসছে হো হো করে। মলয় বলে।

—শালা মেয়ে ছেলে নাকি রে? যেন নোতুন শ্বশুর বাড়ি যাচ্ছে। চল ব্যাটা, জার্মানীতে একটা ডাঁটোপুরু মেমসাহেব দেখে তোর সঙ্গে বিয়েই দোব।

আশীষ ধমকে ওঠে—ইয়ার্কি মারবি না বলছি মলয়।

মলয় বলে—দেখা যাবে ইয়ার্কি না সত্যি। মেয়ে তো ওখানে গিজ গিজ করছে রে। তোকে খুঁজতে হবে না, তোকেই তারা খুঁজে নেবে!

আশীষ যেন স্বপ্ন দেখছে, কোন নীল নয়না যুবতীর।

ট্রেনটা রাতের আঁধার ফুঁড়ে চলেছে।

বিজয় চেয়ে আছে বাইরের দিকে। ঘুম নামা দিগন্ত ছোট জনপদ মাঠ প্রান্তর পিছনে ফেলে ছুটে চলেছে ট্রেনটা।

কমলা দেখেছে জীবনকে।

বিজয়কে সে দোষ দিতে পারে না, সাথীকে সে নিবিড় ভাবেই ভালোবেসে ছিল। আজ নারীমন দিয়ে সেও বুঝেছিল সাথীর ভালোবাসার গভীরতাও। এত জীবনেরই ধর্ম, মানুষের প্রাণেরই লক্ষণই।

তাই ওদের এই প্রেমের এমনি একটি ব্যর্থ পরিণতিতে সেও দুঃখই পেয়েছিল কিন্তু এ ছাড়া পথও ছিল না।

আরও খুশী হয়েছিল কমলা সাথীকে দেখে।

সেও বিজয়ের এই ভাবে সরে যাওয়াতে বাধা দেয় নি, তার প্রেমের বাঁধন থেকে বিজয়কে মুক্তিই দিয়েছিল সে।

কমলার বারাসত কলেজে চাকরীটা হয়ে গেছে। কুষ্ঠিয়াতে থাকতে বাবার চাপেই সে প্রাইভেটে এম-এ পরীক্ষাটা দিয়েছিল।

আজ সেইটাই তাকে সাহায্য করছে।

অতসী কাকিমা আরামবাগ ছেড়ে যাবার আগে কমলাকে বলে—তুমিও চলে যাবে মা, তাই ভাবছি বিয়ের ব্যাপারটা এখানেই মিটিয়ে দিই। বাদলবাবুরাও চাপ দিচ্ছেন।

কমলাও বলে—তাই ভালো কাকীমা। শুভ কাজ-এ দেরী করা ঠিক হবে না।

সাথী স্তব্ধ হয়ে গেছে।

বিয়ের সব অনুষ্ঠানই সে নীরব দর্শকের মত যেন দেখছে। উদাস বিষণ্ণ একটি মূর্তি। যেন জীবনের কাছে সে নীরবে বিনাবাধায় আত্মসমর্পণ করেছে, যদিও এর কোন কিছুকেই সে মেনে নিতে পারেনি তবু বাধাও দেয় নি।

কমলা বলে—এভাবে গুম হয়েই থাকবি সাথী?

সাথী দেখছে কমলাকে। ওর এতদিনের সঞ্চিত হতাশা হঠাৎ যেন বাঁধভাঙ্গা অশ্রু হয়ে নামে।

সাথী কান্না ভেজা স্বরে বলে।

—এ আর সইতে পারছি না বৌদি! কেন যে বেঁচে আছি তাই ভাবছি।

যার কেউ নেই—কিছু নেই তার বেঁচে থাকার দাম কি?

কমলা বলে—তবু বাঁচতে হবে সাথী। জীবন বহু বৈচিত্রময়। দুঃখই এর সব নয় রে! যে জীবন একদিন সব কেড়ে নেয় সেই জীবনই একদিন অনেক কিছু ফিরিয়ে দেয়। দেখবি আবার সুখী হবি,

সাথীর মনে হয় সুখ শান্তির প্রকৃত রূপটাকে সে হয়তো কোনদিনই দেখবে না। বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে তার সব কিছু হারিয়ে গেছে।

সাথী। এই অনুষ্ঠান—আলো, সানাই-এর সুরের মাঝে একজনকে দেখে।

সে ওই প্রশান্ত। সহজ সাধারণ একটি সুখী সুখী গোছের মানুষ। কোন ষ্টেশনের সহকারী ষ্টেশন মাষ্টার। আজ সাথীর জীবন তার অজানতেই ওর সঙ্গে জড়িয়ে গেছে।

মুছে ফেলতে হবে তার মন থেকে বিজয়ের সব ছবি, সব স্মৃতি।

আজ সে তার জীবনে মিথ্যা হয়ে গেছে।

সানাই এর সুরে কি বেদনায় তার চোখে জল নামে। কিন্তু প্রকাশ্যে চোখের জল ফেলার কোন স্বাধীনতাও তার নেই। মনের বেদনাকে মনের অতলেই রাখতে হবে।

কমলা বিয়ের পরই চলে এসেছে বারাসতে।

কয়েক মাস কেটে গেছে। কমলা বারাসতে এসেছে এবার নোতুন করে নিজের কথাও ভাবছে। কাছেই কলকাতা, কমলা ওখানে যাতায়ত করে এবার রিসার্চ এর ব্যবস্থাও করেছে।

কলেজের চাকরীতে পি-এইচ-ডিটা করতে পারলে দাম বাড়ে। আর সময়ও অনেক। তাই সুরু করেছে পড়াশোনা।

তবু বিজয়ের কথা মনে পড়ে। বিজয়ের কাছে কমলাও যেন নিজেকে অপরাধী মনে করে। একটু বেশী নিষ্ঠুরই হয়েছিল সে। কিন্তু না হয়ে পথ ছিল না।

এখন সাথীর চিঠিও পায়। এখন সাথী বাসাতে গেছে।

সাথীর স্বামী প্রশান্ত এখন বোলপুর ষ্টেশনে বদলি হয়ে গেছে

সাথীও সেখানে গিয়ে ঘর বেঁধেছে। কমলাকে যেতে লিখেছে বার বার করে, কাছে শান্তিনিকেতন। দু'চার দিন ছুটিতে গেলে সাথীরা খুব খুশী হবে।

কমলা কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়েছে। মেয়েরা একটু বৌচিত্রই। মনের অতলের যন্ত্রণাকে কিছুটা চেপে রেখে বাইরের পরিবর্তনের সঙ্গে হয়তো সহজেই নিজেদের মানিয়ে নিতে পারে।

সাথী হয়তো তাই পেরেছে। ওর চিঠিতে তবু কিছুটা খুশীর চাপা সুর শুনেছে কমলা। প্রশান্তের সমন্ধেও দু'চারটে মজার কথা লিখেছে। ওই লোকটার অনেক ভারই নাকি তার উপর পড়েছে।

কমলার মনে হয় সাথী ভালোই আছে তার নিজের ঘর পেয়ে। ওরা সুখে থাকুক।

বিজয়ের জন্য তাই যেন দুঃখই হয় কমলার।

বি-এস-সি পরীক্ষাতে বিজয়ের ফল ভালো হয় নি কেন তা কিছুটা অনুমান করতে পারে কমলা।

দুঃখ তার এইখানেই বিজয়কে সামলাবার চেষ্টা সে করেছিল। নিষ্ঠুরও

হয়েছিল। তবু সবদিক রক্ষা করতে পারেনি। বিজয় যেন হেরে গেছে।

সাধারণভাবে বি-এস-সি পাশ করে কোন ছোট্ট স্কুলে মাষ্টারি করছে। তারপর কোন গ্রামের মেয়েকে ঘটা করে বিয়ে করে আনবে ঘরে। বাচ্চা আসবে।

তাদের বোঝা টানতে টানতে বাকী জীবনের গ্লানিময় দিনগুলোকে শেষ করে দেবে আরও পাঁচজনের মত বিজয়।

কমলার মনে হয় এ তার নিজেরই পরাজয়। তার সব স্বপ্নকে ওরা ব্যর্থ করে দিয়েছে। কারোও উপর এতটুকু বিশ্বাস তার আর নাই। তাই নিজের বাকী জীবনটাকে নোতুন করে গড়ার কথাই ভাবছে সে।

বৈকাল হয়ে গেছে।

শীতের সুরু। সামনে কলেজ মাঠে প্রাচীন রেইনট্রি গাছগুলোর পাতা ঝরেছে। কমলা বইপত্র নিয়ে বসেছে। হঠাৎ কলিং বেল-এর শব্দ শুনে উঠে গিয়ে দরজা খুলে সামনে বিজয়কে দেখে চমকে ওঠে।

—তুমি!

কমলা দেখছে বিজয়কে: পরণে সুট চেহারায় সেই পরাজয়ের বেদনাটা নেই। নোতুন একটি খুশিতে যেন সেই বেদনা মুছে গেছে।

বিজয় ওকে প্রণাম করে বলে।

—এ দেশ থেকে চলে যাচ্ছি বৌদি। তাই যাবার আগে খুঁজে খুঁজে তোমাকে প্রণাম করতে এলাম।

কমলা বলে—সে কি! কোথায় যাচ্ছো?

বিজয় বলে—জার্মানী। ডুসেল ডর্ফ-এ একটা চান্স পেয়েছি।

কালই বোম্বে মেলে গিয়ে বোম্বাই থেকে জাহাজ ধরবো।

কমলা দেখছে ওকে।

বিজয় আজ বৃহত্তম পৃথিবীর পথে চলেছে। হারিয়ে যায় নি তাহলে বিজয় কমলা বলে।

—খুব খুশি হয়েছি বিজয়। জানতাম তুমি জীবনে সহজে হার মানবে না। বড় হবেই।

কমলার ওখানে রাত্রিটা থেকে যেতে হল বিজয়কে।

কমলা নিজে রান্না করেছে। বিজয় বলে।

—তোমার রান্নার স্বাদ কিন্তু মুখে লেগে রইল বৌদি। বিদেশে কি জুটবে জানি না।

কমলা বলে—দেশে তো ফিরে আসবে বিজয়। এখানেই তোমার আসল কাজ। বিদেশে যা দেখবে, শিখবে রোজকার করবে সে এখানের জন্যই। একজনকে ভালোবেসেছিলে নিজের স্বার্থে, কিন্তু এবার দেশকে, এখানের মানুষকে ভালো-

বাসবে নিঃস্বার্থ ভাবে। তাই বড় হয়ে, কৃতি হয়ে এদেশেই ফিরে আসবে।

বিজয় বলে—কিন্তু দেশ সেদিন আমাদের কি ভাবে নেবে তা জানি না বৌদি।

হাসে কমলা—অভিমানের কথা এসব বিজয়। তবে এ অভিমানের কারণও আছে।

বিজয়ের ইচ্ছা করে সাথীর কথা জানতে। কেমন আছে সে।

কমলা বলে—সাথী দুঃখ পেয়েছে খুবই। তবে মেয়েটা বড় শান্ত সংযত। হয়তো কিছুটা মেনে নেবে সে। ওরা এখন বোলপুরে আছে।

ওখানের এ্যাসিস্টাট স্টেশন মাষ্টার প্রশান্ত। ভালোই আছে লিখেছে।

বিজয় চুপ করে কথাগুলো শোনে। কোন জবাব দিল না।

আজ সাথীও তার জীবন থেকে সরে গেছে। বৌদির খেয়াল হয়।

বলে সে—ইস্। রাত্রি হয়ে গেছে। শুয়ে পড়ো।

বৌদি ওকে হাসিমুখেই বিদায় দিয়েছে।

বলে কমলা—গিয়ে চিঠি দিও। সাবধানে থেকো। আর বিদেশের ভালো খারাপ দুই-ই আছে। প্রাচুর্যের দেশ। ওদের ভালো টাকে নিতে চেষ্টা করো। মনে রাখবে তোমার পথ চেয়ে থাকবো। জয়ী হয়ে ফিরে আসতেই হবে তোমাকে।

বিজয় দেখছে বৌদিকে।

বলে সে—বাইরে যাবার নেশা, বড় হবার স্বপ্নকে তুমিই জাগিয়েছিলে বৌদি। সেকথা আমি ভুলবো না।

বোম্বে সহর দেখে প্রথমে হকচকিয়ে যায় বিজয়।

মলয় আশীষও দেখছে নোতুন সহরকে। ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস থেকে বের হয়ে এসে জাহাজ কোম্পানীর অপিসে গিয়ে কথাবার্তা বলে নেয়।

পরশু জাহাজ ছাড়বে।

দুদিন পুরো বিশ্রাম পাবে এখানে।

ওরা হোটেলে মালপত্র রেখে বের হয়েছে সহরের পথে।

কলকাতার চেয়েও জমকালো সহর, তিনদিকে সমুদ্র।

ব্যস্ত সমস্ত লোকজন, ইলেকট্রিক ট্রেনগুলো সহরের বুক চিরে চলেছে। আকাশ-ছোঁয়া বাড়ির লাইন।

ওরা যেন এখুনিই ভিন্ দেশে এসে পড়েছে।

সামনে বিরাট তাজ হোটেলের প্রাসাদ। এদিকে সমুদ্রের সুরু।

গেট ওয়ে অব ইন্ডিয়া।

ভারতের জমি শেষ হয়ে গিয়ে সমুদ্রের শুরু হয়েছে। দূরে দূরে সমুদ্রের বুকে অনেক জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে। দূর যাত্রী, ওরা।

ওই দূর সমুদ্র পারে কোথায় তাদের যেতে হবে এ মাটির মায়া কাটিয়ে।

ওরা হোটেলে ফিরেছে। দুদিনেই বোম্বাই সহরটাকে ওরা দেখে দেখেছে কিছুটা। নানা বৈচিত্রের মাঝে ওরা সহজ হয়ে উঠেছে। মলয় বলে।

—মন্দ লাগছেনা রে। মালদহ থেকে যেন বেড়াতে এসেছি।

আশীষ বলে—তা সত্যিই। ওখানে থেকে কুনো ব্যাং হয়েছিলাম।

ইটালির জাহাজ। ব্যালার্ড পীয়ারে যাত্রীদের ভিড় সুরু হয়েছে। যাত্রীদের মালপত্র লগেজ চেক হচ্ছে। লাইনে দাঁড়িয়েছে বিজয়রাও তিনজনে।

পাশপোর্ট—ভিসা— হেলথ সার্টিফিকেট এসব চেক করিয়ে মালপত্র দেখিয়ে ওরা জাহাজে উঠেছে।

এর আগে জাহাজ সমন্ধে ওদের ধারণা ছিল না। উঠে অবাক হয়। কয়েক-তলা বিরাট একটা ভাসমান প্রাসাদ। সাদা পোষাক পরা জাহাজের কর্মচারীরাই তাদের কেবিনে নিয়ে যায়।

একটা ছোট ঘর, লাগোয়া বাথরুম। আর ট্রেনের কামরার মত দেওয়াল থেকে তিনটে তিনটে ছটা বেশ চওড়া বাংকও রয়েছে। তারা তিনজন ছাড়াও আরও তিনজন যাত্রী যাবে এতে।

ওরা মালপত্র কেবিনে রেখে বাইরে এসে দাঁড়ালো।

বেলা দুপুর গড়িয়ে গেছে।

লোকজন উঠে গেছে প্রায় জাহাজে। ওদিকে জেটিতে দেখা যায় বহু লোকজন, মেয়েছেলেদেরও। ওরা বিদায় জানাতে এসেছে তাদের প্রিয় জনকে। জাহাজ-এর বড় সিঁড়িগুলো উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে।

বিকট শব্দে জাহাজের ভোঁ বাজে দুতিনবার।

যাত্রীদের মধ্যে চাঞ্চল্য জাগে। কেউ রুমাল নাড়ছে—কেউ জাহাজের রেলিং এ লম্বা রঙ্গীন ফিতে বেঁধেছে—সেগুলো যেন ডাঙার ওদের প্রীতির বাঁধন। কারোও চোখে জল হাত নাড়ছে।

বিজয়দের বিদায় জানাতে কেউ আসেনি।

ওদের জন্য কেউ রুমাল নাড়ে নি। জাহাজটা দূরে চলে যাচ্ছে।

ছিড়ে যায় ডাঙার প্রীতির বাঁধন সেই রঙ্গীন ফিতে গুলো।

বোম্বাই সহরটা দেখা যায় ভাসমান দ্বীপের মতই।

জাহাজ বোম্বাই এর সীমা ছাড়িয়ে দূর আরব সমুদ্রের দিকে চলেছে।

হঠাৎ মনে হয় বিজয়ের এবার ভারতের মাটি ছেড়ে সত্যই চলেছে সে। আর সেই স্নেহময়ী মৃত্তিকার কোন স্পর্শ নেই। এ দেশ যেন তাকে কি বেদনায় দূরে সরিয়ে দিয়েছে।

মনে পড়ে মালদহের ছায়া নামা বৈকালের কথা, বাবা-মায়ের কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে বৌদির কথা। আর একজনের কথাও। সে সাথী। আজ ওদের

জন্য রয়েছে ঘরের ঠিকানা, কার প্রেম ভালোবাসা-মাটির স্পর্শ, আর বিজয় কি এক দুঃসহ অভিশাপে যেন সব হারিয়ে এদেশে থেকে নির্বাসিত হয়েছে দূর অজানা পৃথিবীর অঙ্গনে, কোথায় তার ঠাঁই সে জানে না। কোথায় তার ঘর তার ঠিকানাও হারিয়ে গেছে তার সামনে।

আজ সব হারিয়ে কোন দূর সমুদ্রে কোথায় লবঙ্গ বন ছায়াঘন পাইন-ফার-ওকের কোন ছায়া দ্বীপের সন্ধানে চলেছে দিশাহারা এক নাবিক। সামনে তার অন্তহীন বিক্ষুব্ধ সমুদ্র। বিশাল সীমাহীন। দুচোখ জলে ভরে আসে।

আশীষের চোখেও জল নেমেছে। বলে সে।

—বেশ ছিলাম মালদহে শান্তিতে, না এলেই ভালো ছিল রে।

কিন্তু ফেরার পথ আর নেই। জাহাজটা তখন দূরে আরও দূরে চলেছে: দূরে বোম্বাই সহরের দিগন্তও হারিয়ে গেল। সন্ধ্যা নামছে সমুদ্রে রক্তিম আলোর তুফান তুলে।

ওরা এবার ক্লান্ত পদক্ষেপে ফিরছে জাহাজে তাদের নিজেদের কেবিনের দিকে। জাহাজের মাইকে ঘোষণা করা হচ্ছে মদের দোকান চালু হয়েছে। ক্রেতারা মদ পেতে পারবেন এখন।

কেবিনে তখন বাকী তিনজন যাত্রীও এসে গেছে:

একজন বাঙ্গালী ডাক্তার। ডাঃ ঘোষ চলেছেন লণ্ডনে সেখানে কোন বিষয়ে স্পেশালাইজড হবেন। ওপাশে কার ডাক শুনে চাইল বিজয়।

—ওয়েলকাম বয়েজ।

একজন বয়স্ক শ্বেতাঙ্গ বৃদ্ধ। চোখে হাইপাওয়ার চশমা। মুখে বয়সের ছাপ, কিন্তু হাসিটা সুন্দর।

ডাঃ ঘোষ-এর সঙ্গেও পরিচয় হয়ে গেল। কলকাতার লোক।

মিঃ ডসন চলেছেন তার স্ত্রীকে নিয়ে লণ্ডনে। ওখানে কোন পাড়া গ্রামে ওদের বাড়ি। কিন্তু মিঃ ডসনের সেখানে বাস করার ইচ্ছা নেই। বলেন টু কোল্ড। তার চেয়ে ইণ্ডিয়া অনেক ভালো। সামারের শেষেই ফিরে আসবো। ব্যাক টু মাই বাংলো এ্যাট লক্ষ্ণৌ। ভেরি নাইস প্লেস লক্ষ্ণৌ। ভেরি হসপিটয়্যাল সিটি। লক্ষ্ণৌতেও চাকরী করতেন। রিটায়ার করে ওখানেই রয়ে গেছেন। এদেশেই তার ঘর বাড়ি গড়ে এখানের মানুষ হয়ে গেছেন তিনি।

স্ত্রী চলেছে ওপাশে লেডিজ কেবিনে।

হঠাৎ কিসের শব্দে চাইলাম।

—সরি। মাপ কিজিয়ে ভাই লোক।

একটি ভদ্রলোক ঢুকছে, হাতে মদের বোতল। জাহাজের মদের দোকানের বোধ হয় প্রথম খদ্দের। কিছুটা মাল এরমধ্যে গিলে খুশী হয়ে ঢুকছে বাকীটা নিয়ে। ঠোক্কর খেয়ে পড়তো—ধরে ফেলেছে বিজয়। বলে সে—থ্যাঙ্ক ইউ,

হুম্‌ মিঃ আনন্দ। দিল্লীর হাউস খাস্‌ এ বড়া ভাইয়া বোলনসে সবকোই পহচানে গা।

বড় ভাইয়া বটে। এক দিক দিয়ে সে বিজয়দের কেবিনে বড় ভাইয়ার সম্মান অর্জন করেছে। বোতলের ছিপিটা বন্ধ করে ব্যাংক-এ বসে বলে।

—গুড হুইস্কি ভেরি গুড! মুলুকমে পিতে হে পানি বরাবর। বিলকুল দো নম্বরী চীজ—লেকিন ইয়ে আসলি।

মালপত্র গুছিয়ে রেখে ওরা ধাতস্থ হয়েছে। এবার ঘোষণা করা হয় ডাইনিং হলে যেতে পারো। নাচ গান আয়োজনও আছে। সিনেমাও দেখানো হবে ডিনারের পর।

বিজয়রা বের হয়েছে, খাবার ব্যবস্থা ওই ডাইনিং হলে। সারা জাহাজ এখন আলোয় ভরে গেছে। ডেকেও এখন মিঠে হাওয়া বইছে। জাহাজটা এবার গভীর সমুদ্রে চলেছে, একটি আলোকিত প্রাসাদ যেন ভেসে চলেছে। ডাইনিং হলে জমায়েত হয়েছে সকলেই।

একটা বিরাট হল ঘরই। আলোয় ঝলমল করছে।

সার সার চেয়ার টেবিল সাজানো। মেজেতে পুরু লাল কার্পেট পাতা। ওদিকে ডায়াস মত। জাহাজটা ইটালীর, তার ক্যাপ্টেন মিঃ কেরোনো জমকালো পোষাক পরে সমাগত যাত্রী অতিথিদের উদ্দেশ্যে একটু ভাষণ দিয়ে তাদের স্বাগত জানালেন। তার পরই সুরু হল বাজনা।

দ্রুতলয়ে বিদেশী বাজনার সুর ওঠে।

এর মধ্যে দু চারজন ছেলে মেয়ে—আধা বয়সী ভদ্রলোক ভদ্রমহিলাও জোড়ায় জোড়ায় নাচতে শুরু করেছে।

বিজয় দেখছে ওদের।

আশীষ এদের মধ্যে হঠাৎ যেন একটু বেশী চালু হয়ে গেছে। বোধ হয় আড়ালে এর মধ্যে দু'এক পেগ মদও গিলেছে। সে ওদিকে একটি কেরলবাসিনী কালো মহিলাকে নিয়ে নাচতে নেমেছে।

চমকে ওঠে বিজয়। মলয় বলে—শালা চালু পুরিয়ারে!

ওদিকে নাচের ধুম পড়েছে। দুটি অ্যাংলো মহিলা তাদের পার্টনার না পেয়ে দুজনেই নাচছে।

হঠাৎ দুজন সর্দারজী দাড়ি পাগড়ি সমেত এগিয়ে এসে ওদের ডাকতে ওরা এবার পার্টনার পেয়ে দুজনে দুই পঞ্চনদবাসীকে ধরেই নাচ সুরু করেছে।

আশীষ দেখছে বিজয়দের।

সেই মেয়েটিকে এদের কাছে এনে বলে—মিট শুভা, মিস শুভলক্ষ্মী।

মেয়েটি নমস্কার করে এদের। আশীষ বলে।

—যা না, নাচ বিজয়। শুভা খুব ভালো নাচে তোকে শিখিয়ে দেবে।

বিজয়ের এসব ভালো লাগে না। বলে সে।

—থাক ধন্যবাদ। চল—খিদে পেয়েছে। যাওয়া যাক।

তারপর ফাঁকা বাতাসে ডেকে বসবো। এখানে বড্ড গণ্ডগোল আর কলরব।

আশীষ ক্ষুব্ধ হয়ে বলে—তুই একটা হোপলেস। আহার আর নিদ্রা।

বলে—ঠিক আছে। চল।

মেয়েটিকে বলে—আবার দেখা হবে। দ ভসন্যা।

রাত্রির আকাশে হাজার তারার রোশনী। নীচে কালো জল। জাহাজ চলেছে পুরো গতিবেগে। ডেক চেয়ারে বসে আছে বিজয়। ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে। ক'দিন খুব ধকল গেছে। ক'দিন এখন জাহাজে বিশ্রাম পাবে তারা।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙে কার বমির শব্দে।

বাঙ্ক-এ শোওয়া যায় না, যেন ছিটকে পড়বে। জাহাজ দুলছে।

মিঃ ডসনও উঠে পড়েছেন। ডাঃ ঘোষ বাইরে কোথায় গেছেন। বেসামাল হয়ে বমি করছে বড়ভাইয়া।

মিঃ ডসন বলেন—সি সিকনেস্। না হলে ডাক্তারের কাছে যাও যদি কোন ওষুধ দেয়।

বিজয়েরও বমি দেখে গা গুলিয়ে ওঠে। মাথা ঘুরছে। মনে হয় ওই দুলুনির চোটে তারও বমি সুরু হবে। তবু কোন রকমে বের হয়ে এল।

জাহাজটা কয়েকতলা।

সিঁড়ি বেয়ে তিন তলায় ডাক্তারের চেম্বার ডিসপেনসারী।

ওখানে যেতে ডাক্তার সব শুনে বলেন।

—আমার যাবার দরকার হবে না। সিস্টার যাচ্ছে ওষুধ নিয়ে।

বড়ভাইয়ার খুব আপশোষ।

—এত্না দামী মাল বিলকুল বরবাদ হয়ে গেছে।

সিস্টার ওকে কয়েকটা ট্যাবলেট দিয়ে বলে।

—ডেকে যান। ওখানে গেলে কিছুটা নর্মাল হতে পারবেন।

মলয় আশীষও বলে।

—গা গুলুচ্ছে রে?

বৃদ্ধ মিঃ ডসন বলে ওঠে স্নেহভরা শাসনের সুরে।

—বয়েজ, লেট আস গো টু দি ডাইনিং হল। ইউ মাস্ট টেক ইওর ব্রেকফাস্ট। ইট সামথিং-এভরিথিং উইল বি নর্মাল।

বুড়োই জোর করে এদের নিয়ে চলে।

ওপাশে মেয়েদের কেবিন। বিজয় লক্ষ্য করেছে মিঃ ডসন কানে কম শোনে। ওকে একটু জোরে কথা বল্লে তবে শুনতে পায়।

ওদিকের কেবিন থেকে বুড়ি মিসেস ডসনকে দেখে মিঃ ডসন পরিচয় করিয়ে দেন।

— জুলি মিট মাই বয়েজ।

বুড়িও বুড়োর মতই স্নেহময়ী। ছেলে পুলে নেই। তাই যেন এদের ভালো লেগে গেছে তাদের। বিজয় দেখে বুড়ি মিঃ ডসনের সঙ্গে একটু মৃদু স্বরে কথা বলতে বুড়ো ঠিকই শুনছে। অর্থাৎ বিশেষ পর্দায় কথা বললে ওর কোন অসুবিধাই হয় না।

বিজয় শুধোয়—কানের দোষ হলো কি করে ওর?

মিসেস ডসন বলেন—লক্ষ্ণৌতে কোন ডাক্তার ভুল ওষুধ দিয়ে ফেলেছিল বেশী মাত্রায়।

বুড়ো মিঃ ডসন এখনও সেই রাগটাকে ভোলেনি। বলে সে—দ্যাট বাগার হ্যাজ ফিনিশড মি মাইবয়। ইফ ইট উড হ্যাপন ইন লণ্ডন আই উড সুট হিম।

এদেশে ডাক্তারের বিরুদ্ধেও ক্ষতি পূরণের দাবী করে মামলা করা যায়। করেও অনেকে। ব্যাপারটা বিজয়ের কাছে নোতুন বলেই বোধ হয়।

জাহাজেই চিঠি পোষ্ট করার ব্যবস্থা আছে। বিজয় বাড়িতে চিঠি দিয়েছে বাবাকে। বৌদির কথাও মনে পড়ে। খুবই ইচ্ছা হয় সাথীকে একটা চিঠি দেবে। কিন্তু সে ইচ্ছাটা চেপেই যেতে হল।

বিদেশে চলেছে।

জাহাজের বেশী যাত্রী ভারতীয়ই। তাই ক্যাপ্টেন বলেছিলেন জাহাজে ভারতীয় ভাষার গানই বাজানো হবে। হিন্দীগান বাজছে।

বাঙালী কিছু যাত্রীর হঠাৎ যেন ভাষা প্রীতি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। তারাই প্রতিবাদ করে।

—হিন্দী গানই কেন বাজবে? বাংলা গানও চাই। বন্ধ করো হিন্দী গান।

ওদিকে সর্দারজীরাও চলেছে অনেক। ওরা ইংল্যাণ্ডেই থাকে। ওদের দেখেছে বিজয় জাহাজে উঠেও বাণিজ্য, ইংলণ্ডের ব্যবসা—কাজের কথাই বলতে। কিছু অন্য প্রদেশের হিন্দী ভাষাভাষীও আছে।

তারাও এবার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে।

—কভি নেই। হিন্দী গানাই চলে গা।

দুজনই মুখোমুখি হয়েছে। বাংলার দল এবার রবীন্দ্রনাথ, নজরুল—অতুলপ্রাসাদকে টানে ওরাও নাচার।

শেষ অবধি হাতাহাতি হবার উপক্রম। জাহাজ কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপে ব্যাপারটা চাপা পড়লো। তবু এদের উষ্মা যায় না।

বিজয়ও ব্যাপারটা দেখেছে। তার মনে হয়।

বাইরের কোন দেশের লোকদের সামনে ভারতবর্ষের নিজেদের ঝগড়াটাকে এভাবে তুলে ধরে নিজেদের দৈন্য প্রকাশ না করলেই এরা ভালো করতো। নিজেরই লজ্জা করে কথাটা ভাবলে।

সরে এল সে ডেকের অন্যদিকে।

শান্তনীল সমুদ্র। জাহাজ এগিয়ে চলেছে। ওপাশের চেয়ারে গিয়ে বসেছে। হঠাৎ কার ডাকে চাইল।

—নমস্তে।

শুভলক্ষী। কালকের রাতের সেই দখিনী মেয়েটি তাকে দেখে এগিয়ে এসে বলে—বসতে পারি ?

বিজয়-এর পাশে চেয়ার টেনে নিয়ে বসলো। বিদেশে শুভলক্ষী চলেছে জার্মানীতে নার্সের স্পেশাল ট্রেনিং নিতে। কালো শ্যামলা চেহারা। মাথায় একরাশ কোকড়ানো চুল। দক্ষিণী সিল্কের শাড়ি পরা। শান্ত নম্র চেহারা।

বাংলার মেয়েদের মত শান্ত ভাব কিছুটা ওদের আছে।

শুভলক্ষী বলে—ফিলিং হো হামসিক্ ! না ?

বিজয় চাইল ওর দিকে। শুভলক্ষী বলে।

—আমারও ভালো লাগছে না। কিন্তু যেতেই হবে। বাড়িতে কে কে আছে তোমার ?

বিজয় বলে—মা-বাবা-ভাই-বোন—

হাসে শুভা—আর কেউ ?

বিজয় চাইল ওর দিকে। শুভা বলে।

—শুনেছি তোমাদের দেশেও আর্লি ম্যারেজ হয়। আমার মা-তো বিয়ে না দিয়ে ছাড়ছিল না, কোন রকমে বের হয়ে এসেছি। হাসছে বিজয়। শুভাকে দেখছে সে। সমুদ্রের হাওয়ায় উড়ছে ওর পিঠ ঝাঁপানো চুল। চোখ দুটোয় শান্ত উদাস দৃষ্টি।

শুভা বলে—কদিন ল্যাণ্ড না দেখে বিশ্রী লাগছে। শুনছি এডেন-এ থামবে কাল।

বিজয়ও বলে—সত্যি।

মলয় আশীষকে দেখে চাইল। মলয় বলে।

—খেতে যেতে হবে না ? চল—

শুভাও বলে স্যরি। ভুলেই গেছলাম। চলো।

কড়ভাইয়া এর মধ্যে ফিট হয়ে এসেছে। মাল তার চাই। ওদিকের লাঞ্চের-এর টেবিলে ঘোষদা, মিঃ ডসনদের কাছে গিয়ে বসলো এরা।

প্রচুর খাবার—যার যা খুসী খাও।

খাওয়ার পর ফলও দেয়, আপেলই বেশী। মিঃ ডসন তার আপেলটা নিয়ে

গেলেন। পরে খাবেন। বিজয়ও রাখল নিজেরটা। তখন খাবার মত অবস্থা নেই।

দুপুরে একটু ঘুমই দেয় ওরা।

বৈকালে আবার জল হাওয়ার গুণে খিদেটা চাগিয়ে ওঠে। চা, স্ন্যাকস্‌ও থাকে তখন।

মিঃ ডসন ছুরি বের করে এই সময় আপেলটা কাটেন। নিজে একাও খেতে পারে না। সকলেই তাতে যেন ইচ্ছা করেই ভাগ বসায়। ফলে বুড়োর ভাগে আর তেমন জোটে না।

ক'দিন থেকেই এই ব্যাপারটা চলেছে। বিজয়ও দেখেছে সেটা।

আজ ওরা ফলাহার করে বৈকালে চা খাবার জন্য বের হয়ে যেতে বিজয় নিজের আপেলটা বের করে মিঃ ডসনকে দিতে বলে।

—তোমারটা সব তো ওরাই খেয়ে গেল। এটা তুমি খাও!

বুড়ো বলে ওঠে—নো নো! একা সবটা খেয়ে কোন তৃপ্তি পাই না মাই বয়। আমার কাছে সবাইকে দেবার পর ওই টুকরোটাই বেশী মিষ্টি বোধ হয়। কিপ্‌ ইট।

বিজয় বুড়োর এই কথায় অবাক হয়ে চেয়ে থাকে।

জাহাজ এডেনে ভিড়বে, সকলেই মাটিতে নামার জন্য ব্যস্ত। মাটির জন্য যেন মানুষের টান একটা রয়েছে।

কিন্তু এডেনে তখন রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার জন্য কিছু গোলমাল চলেছে। তাই ঘোষণা করা হোল মাইকে জাহাজ এডেনে থামবে না, থামবে সোজা গিয়ে পোর্ট সৈয়াঙ্গ।

অনেকেই ক্ষুণ্ণ হয়। বিশেষ করে সর্দারজীরাও। একজন বলে—বহুৎ লোকসান কর দিয়া শালালোগ। এডেনে রুখনেসে কুছ নাফা হোতা।

সর্দারজীর যেন বেশ কিছু লোকসানই হয়ে গেল।

এরপর সুয়েজ ক্যানেল হয়ে জাহাজ থামবে পোর্ট সৈয়াঙ্গ।

বড়ভাইয়া বলে—যানে দেও জাহান্নামমে, ইলোগ্‌ এইসাই হ্যায়। হম্‌ কাহা ভি নেহি উতরেগা। মাট্টি ছোড় দিয়া ব্যস।

বড়ভাইয়া অবশ্য জলপথেই চলেছে বরাবর। দামী মদ পেয়ে সে পৃথিবীকে ভোলার চেষ্টা করে। আর সবাইকে দিব্যজ্ঞান দিয়ে চলেছে।

—ক্যা দেখেগা। দু পাঁচবার গিয়া জাহাজমে। সব পোর্ট দেখলিয়া তুম লোগ নয়া হ্যায়, দেখো।

রাত্রি নামছে।

জাহাজ অবিশ্রান্ত গতিতে চলেছে একটানা ইঞ্জিনের শব্দ তুলে। দুচারটে পাখীকে দেখা যায় তীরের দিকে ফিরতে। কাছাকাছি বোধ হয় তীর আছে,

কিন্তু সহর অন্ধকারে দেখা যায় না।

সকাল হয়ে গেছে।

বিজয়ের ঘুম ভাঙ্গে কলরব—কোলাহলে, জাহাজটা থেমে আছে। আর নীচে যেন কোথায় মেলা বসেছে।

বের হয়ে এসে দেখে বিজয় জাহাজ পোর্ট সৈয়াঙ্গ বন্দরে ভিড়েছে আর নৌকা নিয়ে, জেটি বেয়ে কাতারে কাতারে এ দেশী লোক রকমারি চামড়ার ব্যাগ, লেডিজ ব্যাগ মালা, ন্যানা জিনিষপত্র নিয়ে এসে জাহাজে উঠেছে, ডেকে পশরা খুলে নানা ভাষায় কলরব করছে। যাত্রীরাও ভিড় করেছে।

দেশ থেকে বের হবার সময় দেশের টাকা বেশী আনা আইনবিরুদ্ধ। জানিয়ে আসতে হয়। কিন্তু হঠাৎ দেখা যায় অনেক যাত্রীর এদিক ওদিক থেকে বেশ কিছু নোট বের হচ্ছে একশো টাকার।

আর ওই ব্যাপারীরা ভারতীয় টাকা, ডলার—লীরা—পাউন্ড যে দেশের টাকাই হোক না নিচ্ছে।

সর্দারজীদের এখান ওখান থেকে বেশ কিছু টাকা বের হচ্ছে, ওরা চামড়ার লেডিজ ব্যাগ, ব্যাগ—সৌখীন বেশ কিছু জিনিষ হাজার কয়েক টাকারই কিনে ডাই করেছে!

বিজয় শুধোয়—এত কি হবে?

একজন সর্দারজী মুচকি হেসে বলে।

—লণ্ডনমে এক এক ব্যাগকা কিতনা কিস্মৎ জানতা বাবুজী, এক পাউণ্ড সে ভি জ্যাদা। পাঁচ রুপেয়া খরিদা—ষোল রুপেয়া বিকেগা হর ব্যাগ, কিতনা মার্জিন আয়গা।

অর্থাৎ বাণিজ্য করার জন্য এরা ঘুরছে। এডেনে নাকি আরও সস্তা এ সব। তাই এডেনে জাহাজ না থামাতে এদের লোকসানই হয়ে গেছে, তার কিছুটা পুষিয়ে নিতে চায়।

জাহাজ একদিন থাকবে এখানে।

অপিস থেকে পাশপোর্ট দেখিয়ে এক দিনের জন্য সহরে নামার অনুমতি পত্র পাওয়া গেল। বড়ভাইয়া কেবিনেই রয়েছে।

সে বলে—হম্ পোর্ট সৈয়াঙ্গ বহুৎ দফে দেখা! নেহি যায়ে গা! তুম লোক যাও।

কেবিনের চাবি রইল তার কাছেই।

ঘোষদাকে নিয়ে বের হয়েছে বিজয়, মলয় আর আশীষ।

নোংরা গিঞ্জি সহর, যেন বিহারের দেহাত অঞ্চলের বহু সহরের মত মাটির ঘর—কিছু অবশ্য অভিজাত মহল্লা আছে। দোকান পশার—রাস্তায় ধুলো ময়লা, মলিন বিবর্ণ পোষাকের লোকই বেশী। আর হৈ চৈ—কলরব চলেছে।

হঠাৎ একজন বয়স্ক লোককে ওদের দিকে আসতে দেখে চাইল। লোকটা শুধোয়—ইণ্ডিয়া ?

ঘাড় নাড়ে তারা। বুড়ো আকাশের দিকে দুহাত তুলে বলে কাতর স্বরে।

—নেহেরু—নেহেরু! আল্লা—আল্লা—মৌত হো গিয়া।

বিজয় দেখছে ওকে। দেশেই শুনেছিল জহরলালজীর অসুখের কথা। কদিন কোন খবর রাখেনি। আজ পোর্ট সৈয়াঙ্গ নেমে হঠাৎ নেহেরুজীর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে চমকে ওঠে। ভারতবর্ষের একজন প্রধান পুরুষ চলে গেলেন।

আর বিদেশী এক বৃদ্ধকে তার জন্য চোখের জল ফেলতে দেখে তারাও অবাক হয়েছে। মনে হয় মানবিকতার দেশ-সীমা নেই। পৃথিবীর সব মানুষের মাঝেই তার বিস্তৃতি।

তাই এই পরদেশীও আজ তাঁর জন্য চোখের জল ফেলে শ্রদ্ধা জানায়।

চলেছে ওরা পথ দিয়ে।

একটি তরুণ এসে ধরেছে ওদের—সিগ্রেট আছে তো দাও, ইণ্ডিয়ান শিগ্রেট।

পিছু পিছু আসছে। আশীষের পকেটে একটা চারমিনারের প্যাকেট ছিল, আমাদের দেশের সস্তা সিগারেট। ওই বাকী প্যাকেটটা ওকে দিতে ছেলেটা দারুণ খুশী। সিগ্রেট ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলে।—ফাইন্। ভেরি গুড্! থ্যাঙ্ক ইউ্!

সহরের বিচিত্র পশরা ভর্তি দোকান। কিন্তু পকেটে রেস্ত খুবই সীমিত, কেনার সাধ্য নেই। আর কিনবেই বা কার জন্য? ওরা চলেছে দূরের দিকে।

তবু বিজয় এরমধ্যে কয়েকটা পিকচার পোষ্টকার্ড কিনেছে দেশে বাবা দাদাকে, বারাসতে বৌদিকে পাঠাবে দুলাইন লিখে। ঘোষদা বলে—পাঠাবে ভালোই। তবে দেশে পৌঁছে ঠিকানায় যাবে কিনা সন্দেহ আছে হে! ডাকঘরের বাবুদের তো চেনো না? ছেলেকে ভূগোল পড়াতে নিয়ে যাবে ওসব।

সত্যি কিনা জানে না, বিজয় তবু পোষ্ট করে ওগুলো।

কিন্তু ঘোষদার কথাই সত্যি, আজতক্ সেগুলো প্রাপকের কাছে পৌঁছে নি। কে জানে ডাকবাবুদের ছেলেদের ভৌগলিক জ্ঞান বৃদ্ধি করেছে কিনা।

এরা এতক্ষণ ধরে শহরে ঘুরছে, বন্দর শহর। এখানের একটি বিশেষ জীবনও আছে। এরা ঠিক জানতো না।

হঠাৎ একটু নিরিবিলি পথে বিজয়দের দেখে একজন এগিয়ে এসে বলে।

—গুড পিকচার্স—সি স্যার। ভেরি গুড—নাইস। ভেরি চীপ্। চুজ এনি—

লোকটা পকেট থেকে কয়েকটা মেয়ের বিভিন্ন অর্ধনগ্ন পোজের ফটোগ্রাফ বের করে এদের সামনে মেলে ধরে বলে—অল কলেজ গার্ল। পিক আপ এনি ওয়ান। আই টেক ভেরি চীপ!

চমকে ওঠে বিজয় ওই কাণ্ড দেখে।

বলে সে—ঘোষদা। মেয়ে ছেলের ছবি দেখায় যে!

ঘোষদা বিচক্ষণ লোক। কলকাতাতেও এই দেহবেসাতির ব্যবসা আছে জানে সে। এখানেও সেই ব্যবসা আছে।

এ ব্যবসা পৃথিবীর আদিম ব্যবসার অন্যতম। তাই সারা দেশেই আছে।

ঘোষদা বলে—ওর মতলব বোঝো নি?

তাকে বলে ঘোষদা—দরকার নেই বাপধন ওসবে। তুমি এখানে সময় নষ্ট না করে অন্যত্র দ্যাখো গে।

লোকটা হতাশ হয়ে বলে—ইউ নো গুড!

জাহাজে ফিরছে তারা ক্লান্ত হয়ে। দোতলায় ওদিকে মেয়েদের কেবিন। তখনও অনেকেই বাইরে থেকে ফেরেনি। বাকীরা ডেকে বাণিজ্য করছে; জাহাজের এদিকটা নির্জন।

এক বুড়িকে কেন্দ্র করে তখন কিছু লোকজন জুটেছে কেবিনের এদিকে। বুড়ির পোষাক ভিজে। নেহাৎ এদিকে খুব গরম তাই ভিজে পোষাকে দাঁড়িয়ে বুড়ি তখনও চেচাচ্ছে।

—হরিবল! ন্যাষ্টি—

তার কেবিনটা খালিই ছিল। তখন জাহাজের কোন এক কর্মচারী তাক বুঝে কোন মহিলাকে নিয়ে ওই খালি কেবিনে ঢুকে বোধ হয় বিশ্রম্ভালাপ সুরু করে-ছিল নিভৃতে।

হঠাৎ বুড়ি দরজা ঠেলে ঢুকে পড়তেই তাদের কর্মে বাধা পড়ে যায়, হাতে-নাতে ধরা পড়বার ভয়ে সেই যুগল বুড়ির চোখ মুখে এক গেলাস জল ছিটিয়ে তার হাই পাওয়ার চশমা ভিজিয়ে দিয়ে কোন মতে বের হয়ে পালিয়েছে।

বুড়ি অবশ্য তাদের চিনতে পারেনি। তবু চেলাচ্ছে। জাহাজের ফার্স্ট মেট এসে পড়েছে। কিন্তু বুড়ির চশমা ভিজে যাওয়ার জন্য সঠিক কাউকে চিনতে পারেনি। ফলে দোষীদের ধরা গেল না। অফিসারটিরও বুদ্ধির প্রশংসা করে বিজয়। বুড়ির চশমা না ভিজালে আজ তার নাকের জলে চোখের জলে তা একাকার করে তুলতো জাহাজের ক্যাপ্টেন।

হাসাহাসিও হয় এনিয়ে।

আশীষ বলে—ব্যাটা বেশ রসিক রে! বুড়িটাই নাম্বার ওয়ান বেরসিক। হুট করে কেন যে ঢুকলো।

মলয় বলে—চলতো। এতক্ষণ ঘুরে হাত পা টাটিয়ে গেছে। কেবিনে চল। লম্বা হতে হবে।

কিন্তু তাদের কেবিন তালাবন্ধ। বলে বিজয়,

—বড়ভাইয়া বের হবে না বলেছে। দ্যাখ ডেকে না হয় মেয়েদের ভিড়ে কোথাও আছে।

খুঁজছে ওরা সারা জাহাজ তন্ন তন্ন করে। আপার ডেক লোয়ার ডেক। ডাইনিং হল—সুইমিং পুলের ধার, বল নাচের হল—এদিক ওদিকে কোথাও তার পাত্তা নেই।

জাহাজ ছাড়ারও সময় হয়ে আসছে। যাত্রীরাও ফিরেছে প্রায় সকলেই। হঠাৎ দেখা যায় বড়ভাইয়াকে, সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছে। পরণে বাহারের কলকাতার পাঞ্জাবী, সেরওয়ানি মাথায় টুপি!

কোথায় গেছলেন? শুধোল বিজয়।

বড়ভাইয়া বলে সহজ ভাবে—আরে! হম্ নেহি গিয়া ভাই। দেখো—ইয়ে চাবি, চুপ চাপ বইঠা রতে রতে থক্ গিয়া, ইয়ে চাবিকো হম্ থোড়া ঘুমানে লেগিয়া ভাইসাব্!

অর্থাৎ সে যায়নি। শুধু এই বন্দী চাবীটাকে একটু ঘোরাতে নিয়ে গেছল সহরে!

কেবিনে এসে ঢুকেছে ওরা।

বিজয়-মলয়-ঘোষদা তাদের কেনা সামান্য সওদাগুলো দেখাতে বড়ভাইয়া গম্ভীর ভাবে বলে।

—চু-চু। তুম লোক্‌কে সিধা সাদা দেখক্‌র বুদ্ধু বানা দিয়া। ই-পোর্ট সৈয়ঙ্গাকা হর গলি—হর ব্যাপারী হম্‌কো পহচানতা। হম্‌কো আসলি চীজ দেতা—কাহে নেহি বোলা!

দুঃখ হয় ঠকে যাবার জন্য।

বড়ভাইয়ার মত এলেমদার লোক থাকতে ঠকে এলাম। বড়ভাইয়া ততক্ষণে একটা আতরের শিশি বের করে বলে।

—ইয়ে দেখো। আসলি ইরাণী আতর! ক্যা খোষবু, হম্‌কো আসলি চীজই দেতা উলোক্! লেও দেখো—

বেশ গম্ভীর ভাবে বড়ভাইয়া আসল ইরাণী আতরের শিশি খুলে আমাদের গায়ে দিতেই চমকে ওঠি। বিজয় বলে,

—শুধু মাত্র গোলাব জল বড়ভাইয়া। আতর কোথায়?

গোলাব জলই।

বড়ভাইয়া গর্জাচ্ছে—হম্‌কো বুদ্ধু বানায়েগা? খুন করেগা শালাকো। পুরা পয়সা ওয়াপস্ লায়েগা আভি।

কিন্তু পয়সা আনতে যাবার উপায় আর নেই। জাহাজ তখন বন্দর ছেড়ে দরিয়ায় ঢুকে চলতে সুরু করেছে। বড়ভাইয়া তখনও শূন্যে হাত তুলে গর্জাচ্ছে—শালা হারামজাদ কাহিকা! হম্‌কো বুদ্ধু বানায়েগা? দেখ লেগা।

দেখা নিশ্চয়ই আর হবেনা কোনদিনই তার সঙ্গে।

ভূমধ্য সাগরের মধ্য দিয়ে চলেছে জাহাজ। এবার গরমটা কমে শীতের ভাব

আসছে। ক'দিন জাহাজের অনেকেরই সঙ্গে চেনা জানা হয়ে গেছে। বুড়ি মিসেস ডসনও কেবিনে এসে গল্প করে। বুড়ি যেন মায়ের স্নেহ দিয়ে আগলে রেখেছে তাদের।

বিজয় দেখেছে এর মধ্যে শুভলক্ষীর সঙ্গে আশীষ যেন একটু বেশী জমে উঠেছে। দুজনকে লোয়ার ডেকের একদিকে বসে থাকতে দেখা যায়। নিঃসঙ্গ মেয়েটা আশীষকে পেয়ে হয়তো কিছুটা ভুলতে পেরেছে তার নির্জনতাকে।

মলয় বলে—কি আশীষ কি হচ্ছে? প্রেম?

আশীষ ধমকে ওঠে—তোদের ওই এক কথা। মেয়েটা খুব ভাল রে! ঠিক বাঙ্গালীদের মতই।

মলয় বলে—তাহলে মালদহে থেকে খুঁজে খুঁজে একটা ডাল ভাতখেকো বাঙ্গালী মেয়ের সঙ্গেই প্রেম করতিস! এতদূরে কেন ও কর্ম করতে আসা!

আশীষ চুপ করে থাকে।

ওদিকের ডেকে কোন বিদেশী বিদেশিনীর দল এইটুকু পোষাক পরে নীল চশমা চোখে দিয়ে রোদ পোয়াচ্ছিল। মলয় বলে।

—ওদের দ্যাখ! সাহেবের দেশে গিয়ে মেমসাহেবের সঙ্গেই প্রেম করবি, বুঝলি।

আশীষ সরে গেল। মলয় মন্তব্য করে—শালা!

সুইমিং পুলে তখন সোরগোল চলেছে। সারা জাহাজের মানুষগুলো সব কাজ ভুলে কদিন যেন একটি বৃহৎ সংসারের মানুষে পরিণত হয়েছে। দু চার জন জাহাজের কর্মীও তাদের চেনা হয়ে গেছে। জাহাজটাও!

কদিনপর জাহাজ এসে থামলো মাল্টায়।

ভূমধ্যসাগরের মধ্যে ছোট্ট একটা দ্বীপ' গরম আর নেই। দ্বীপটাও খুব সুন্দর, সাজানো গোছানো। গাছগাছালিও রয়েছে। চারিদিকে নীল জলভরা ভূমধ্যসাগর।

ছোট্ট বন্দরে জাহাজ কিছুক্ষণ থাকবে।

বিজয়রাও বের হয়েছে।

মনে হয় বিজয়েরা এবার যেন দেশ থেকে সত্যই দূরে এসেছে। এই পরিবেশের স্বাতন্ত্রটা চোখে পড়ে সহজেই। সহরটায় মানুষ জনের ভিড় তত নেই। বাসগুলো বেশ ঝকঝকে। রাস্তাঘাট ছিমছাম। বাড়ির সামনে রোদ পোয়াচ্ছে বুড়ো বুড়ির দল। আর অনেকে সাজানো পার্কে বসে পায়রাদের অন্য পাখীদের দানা খাওয়াচ্ছে।

পোষাকপত্রও ওদের সুন্দর। মুখে হাসিও রয়েছে।

সবই নোতুন বোধ হয় বিজয়ের কাছে, শুধু পায়রা ছাড়া।

ঘোষদা বলে—শীতের দেশ। শীতকালে গাছের সব পাতা ফল ফুল ঝরে

যায়। মাটি ঢেকে যায় বরফে। পাখীদের খাবার কিছু থাকে না। তখন ওরাই পাখীদের খেতে দেয়। ফলে পাখীগুলো ওদের সামনে এসে ভিড় করে। কিছু পিকচার পোষ্টকার্ড এখানেও কিনে ছাড়া হ'ল দেশে। সেগুলোরও একগতিই হয়েছিল। কার ঘর শোভা করছে জানেনা বিজয়।

পাহাড়ের গায়ে কমলালেবুর বাগান, হলুদ লেবুও ধরে আছে। কোথায় পাহাড়ের বুকে সবুজের মধ্যে ছড়ানো ছোট ছোট কয়েকটা বাড়ি, একটা গির্জাও মাথা তুলেছে।

মনে হয় বিজয়ের এবার দূরে—নোতুন দেশেই এসেছে তারা। মালদা থেকেই যার সূচনা শুরু হয়েছে।

জাহাজ এবার গিয়ে থামবে ইটালীর নেপলস্ বন্দরে।

রাতে জাহাজ ছাড়লো ইতালীর দিকে।

জাহাজটা ইতালীরই। কর্মচারীদের বাড়িও ইটালিতেই। দীর্ঘ সমুদ্র পাড়ি দিয়ে বেশকিছুদিন পর তারা দেশে ফিরছে এবার। ওদের মনে খুশীর সাড়া। ঘরে ফেরার আনন্দ।

আর বিজয়দের মনে কি বেদনার আভাষ। তারা এক একটা বন্দর ছাড়াচ্ছে আর দেশ থেকে তত দূরত্ব বাড়ছে তাদের।

তবু জাহাজের হৈ চৈ গোলমালে দিনগুলো কেটে যাচ্ছে। কাজের ভাবনা নেই, রকমারি খাবার—কত সঙ্গী! কিন্তু এই সুখের দিনও শেষ হয়ে আসছে। জাহাজ এসে মেসিনা বন্দরে থেমেছে।

ছোট বন্দর। এখানে অনেকেই নামছে। এখান থেকে ভিতরে চলে যাবে।

বোম্বে থেকে ছাড়ার সময় জাহাজ জমজমাট ছিল।

এখন সেই ভাবটা আর নেই। জাহাজের আনন্দের দিন ফুরিয়েছে। অনেকেই বিদায় নিল, বেশ কিছু কর্মচারীর দলও নেমে গেল এখানে। জাহাজে যেন বিদায়ের সুর উঠছে।

এরপর জাহাজ থামবে নেপলস্এ।

নেপলস্ বড় বন্দর। আর এর কাছেই ভিসুভিয়স আগ্নেয় গিরি।

তার গায়ে পম্পাই সহরের ধ্বংসাবশেষ আজও রয়েছে।

সমুদ্রের ধারে অর্ধচন্দ্রাকারে সাজানো সহর বন্দর নগরী নেপলস্।

যাত্রীরা অনেকেই নেমেছে ভিসুভিয়স দেখার জন্য।

বন্দর থেকে ১২-১৪ মাইল দূরেই পম্পাই।

বিদেশী যাত্রীদের দেখে ট্যাক্সিওয়ালারা দুম দাম দর বলে। সময় কম বাধ্য হয়েই ওই দামেই ট্যাক্সি নিয়ে চলেছে ওরা।

কিন্তু বিজয়রা দাঁড়িয়ে দেখছে। ওদের পয়সা মাপা, হিসাব করে চলতে

হবে। বিজয় বলে—ওই ছোকরাকে বলে দ্যাখ কত বলে ?

বিজয়-এর তাদের এক শিক্ষকের কথা মনে পড়ে। তিনি বলতেন—পারত-পক্ষে কারবার করবি ইয়ং ম্যানদের সঙ্গে। ওদের মনটা উদার থাকে, আর একজন বয়স্ক লোকের উপর সংসারের অনেক চাপ থাকে। তার ইচ্ছা থাকলেও কম দরে কাজ করতে পারেনা, ইয়ং ম্যানরা সেদিকে ফ্রি। ওরা তা পারে।

বিজয় ওই শিক্ষাটাকে মেনে চলে। আর কাজও হয় তাতে।

অন্য ট্যাক্সিওয়ালাদের চেয়ে কম দরেই তারা ট্যাক্সিটা পেয়ে গেল।

সামান্য পথ, পাহাড়ের নীচে এককালের প্রাচীন নগরী পম্পাই-এর ধ্বংসাবশেষ আজও তেমনি সাজানো আছে। একটা মিউজিয়ামও আছে ০০৭৬ এ-ডি-র সময় থেকেই এখানে পম্পাই নগরীর বহু কিছু রয়ে গেছে।

তখনকার দিনের একটি সহরের ঘর বাড়ি—জল নিকাশের ব্যবস্থা, রাস্তা ঘাট সবকিছু যে কত উন্নত ছিল তা আজও বোঝা যায় এই মৃত নগরীকে দেখে। সবই পড়ে আছে। স্তব্ধ-মৃত।

অতীতে এখানে কত মানুষ ছিল—তাদের জীবনযাত্রা হঠাৎ একদিন ভিস্যু-ভিয়াসের রুদ্রদোষে নিমেষের মধ্যে অতলে চাপা পড়ে গেল উত্তপ্ত লাভার স্রোতের নীচে।

আজও যেন সেই অশরীরি আত্মাদের দীর্ঘশ্বাস এখানের আকাশ বাতাসে ধ্বনিত হয় কি নীরব হাহাকারে। বিজয়রা বের হয়ে এল। সামনে ভিস্যুভিয়স আগ্নেয় গিরি। এখনও তার থেকে ধোয়া বের হচ্ছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তার এই কর্মকান্ড চলে আসছে।

পাহাড়ের গায়ে পথও আছে। অনেকে উঠছে ভিস্যুভিয়াস-এ। ওরাও উঠে দেখে এল সেই আগ্নেয়গিরিকে।

এবার ফেরার পালা।

জাহাজে এসে মনটা আরও খারাপ হয়। জাহাজ প্রায় খালি হয়ে আসছে। এখানেও অনেক যাত্রী নেমে গেছে।

বাকী সবাই নামবে জেনোয়াতে, ওখানে জাহাজের যাত্রা শেষ হবে। গোছ গাছ শুরু হয়ে গেছে। কালই জেনোয়া পৌছবে জাহাজ।

নেপলস্ ছাড়িয়ে তার যাত্রা সুরু হয়েছে।

আজ জাহাজে শেষ রাত্রি। ডাইনিং হলে ছোট অনুষ্ঠান হচ্ছে। প্রথম দিনের মত আজও জাহাজের ক্যাপটেন এসেছেন।

আজ স্বাগত সম্ভাষণ নয়, বিদায় সম্ভাষণ জানাতে।

জাহাজের যাত্রীরা যে তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন এর জন্য ধন্যবাদও দিলেন।

অন্যদিনের মত আজ জাহাজে বল নাচের আয়োজনও নেই, সিনেমা শোও

কণ্ঠ। যাত্রীদের মনে বিষাদের ছায়া।

এতদিন একসঙ্গে কাটিয়ে আবার কালই তাদের চলে যেতে হবে যার যার পথে।

ঘোষদা—মিঃ ডসন—বড়ভাইয়াও চুপ চাপ হয়ে গেছে।

বিজয়, মলয়, আশীষদের মনেও বিষাদের ছায়া। সামনে তাদের অজানা পথ। কাল সেই পথে হারিয়ে যাবে তারা।

যার যা মালপত্র নাম ঠিকানা লিখে লেবেল সেঁটে অপিসে দিয়ে দিয়েছে। বিল জাহাজ কোম্পানীর লোক সেইমত ষ্টেশনে পেঁৗছে দেবে। লাঞ্চের সময় জাহাজে ওদের ডিনারের জন্যও প্যাক করে খাবার দেওয়া হলো।

জাহাজ এবার জেনোয়া বন্দরে ভিড়ছে।

যাত্রীরা নামছে জাহাজ থেকে, মালপত্রও।

মিসেস ডসন, মিঃ ডসন, ঘোষদা, বড়ভাইয়ারা চলে যাচ্ছে এখান থেকে ট্রেনে ফ্রান্স হয়ে ডোভার পার হয়ে ইংল্যাণ্ড।

মিসেস ডসনের চোখে জল নামে।

কদিনেই বুড়ি যেন আপন করে নিয়েছিল এদের। আজ ছেড়ে যেতে তাই দুঃখ হয়। বুড়ি বলে—গড ব্লেশ ইউ মাই সন। সাবধানে থেকো।

ঘোষদা চেয়ে থাকে সজল নয়নে।

বড়ভাইয়া বলে ওঠে—দুনিয়া গোল হ্যায় ভাইসাহেব কভি না কভি ফির মিলেঙ্গে! খুস্ রহো ভাই।

ওদের বিদায় জানিয়ে বিজয়রা জেনোয়া ষ্টেশনে ওদের ট্রেন ধরার জন্য প্লাটফর্মে এল। মালপত্র আগেই এসে গেছে। এখান থেকে ইটালী পার হয়ে সুইজারল্যাণ্ড হয়ে ওদের ট্রেন সোজা জার্মানীতে যাবে। ওদের নামতে হবে ডুসেলডর্ফ ষ্টেশনে। সেখান থেকে কয়েকমাইল দূরে 'রাইড' ছোট্ট শহর। সেই রাইড তাদের গন্তব্যস্থল।

ট্রেনটা চলেছে।

অপরিচিত যাত্রীর ভিড়। ওরা ইতালীয় ভাষায় কথা বলে চলেছে, একবর্ণও বুঝতে পারে না এরা। তিনজনে একদিকে চুপ চাপ বসে আছে নির্বাসিতের মত।

বিজয়ের মনে পড়ে বাড়ির কথা।

এখন সেখানে বোধ হয় রাত্রি নেমেছে। শান্তিতে ঘুমুচ্ছে সবাই। বাবা মায়ের কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে বৌদির কথা। সাথীর মুখখানা ভেসে ওঠে।

দ্বারকেশ্বর-এর বালিয়াড়িতে সন্ধ্যা নেমেছে, চাঁদের আলো ভরা সন্ধ্যা, কাশফুলে ছেয়ে গেছে শূন্য দিগন্ত। বাতাসে যেন দিকজোড়া শ্বেত উত্তরী

উড়ছে।

তার মাঝে চলেছে তারা দুজনে। সাথীর হাসির সুর ওঠে।

বলে সে—ধরতে পারবে আমাকে? ধরো তো—

ছুটছে সে বালুচরে। উড়ছে ওর বাসন্তী রং-এর শাড়ি, দেহের নিটোল ছন্দ তুলে, হাসছে সাথী। ওর পিছনে দৌড়চ্ছে বিজয়।

হঠাৎ কিসের শব্দে হকচকিয়ে ওঠে বিজয়।

চোখ মেলে চাইল।

কোথায় সেই বালুচর, সাথীর সেই হাসি! একজন বিদেশী ওদের ফ্রেঞ্চ ভাষায় কি বলছে।

বিজয় বলে—পিক ইংলিশ!

ভদ্রলোক হেসে ভাঙ্গা ইংরাজী বলেন কাষ্টমস্। দিস ইজ সুইজারল্যাণ্ড। ওদের পাশপোর্ট ভিসা মালপত্র দেখে চলে গেল।

রাত্রি হয়েছে। চাঁদের আলোভরা জগৎ। চারিদিকে পাহাড়, ওদের মাথায় বরফ চিক্ চিক্ করে চাঁদের আলোয়।

ট্রেনে হিটিং এর ব্যবস্থা আছে, তাই তত ঠাণ্ডা লাগেনা। তবে ওরা শীতের দেশেই এসেছে। সুন্দর দেশ।

একদিকে উঁচু বরফঢাকা পাহাড়—অন্যদিকে চালু পাহাড়ের গায়ে সবুজ পাইন ফার বার্চ গাছের বন, সবুজ ক্ষেত, দুচারটে ছড়ানো ছিটানো ঘর বাড়ি। সুইজারল্যাণ্ড-এর ছবি দেখেছিল। আজ সেই সুন্দর দেশের বুক চিরে চলেছে তারা!

ঘুম নামছে চোখে।

জার্মানীতেও পাশপোর্ট ভিসা কাগজপত্র চেক করা হল। দিনের আলো জেগেছে, ওরা চলেছে এবার জার্মানীর উপর দিয়ে। পাইন-ফারবন, ছোট মাঝারি পাহাড়ের রাজ্য, দু' একটা নদীর ব্রিজ পার হচ্ছে।

দেখা যায় বায়ার কোম্পানীর ওষুধের ফ্যাকটরী, এদের তৈরী ওষুধ সারা পৃথিবীতে যায়। তাদের দেশেও দেখেছে।

দেখছে বিরাট কারখানা। ওখানে নাকি পৃথিবীর অন্যতম সেরা মটর গাড়ি মার্সেডিজ বেঞ্জ তৈরী হয়। ওদের কারখানা।

সারাটা দেশে বনপাহাড়ের মধ্যে ছোট্ট জনপদেও ছোটবড় সুন্দর কলকারখানা ছড়ানো।

চাষের জমিও কিছু আছে। গরু বাছুরও দেখা যায়, বেশ নধর হৃষ্টপুষ্ট। ওরা চাষ—যন্ত্রবিদ্যা—কলকারখানা সবকিছুই যেন নোতুন করে উন্নততর পদ্ধতিতে গড়েছে।

দুপুর নাগাদ ওরা ডুসলডর্ফ এসে পৌছালো।

জেনোয়াতে নেমে ওখানের টেলিগ্রাফ অপিসে ফর্ম ভর্তি করে টাকা দিয়েছে টেলিগ্রাফ করার জন্য। তবু ভয় হয় দাশুদা যদি টেলিগ্রাম না পান বিপদেই পড়বে তারা।

ট্যাক্সি করে কোথায় রাইড সেখানে যেতে হবে। কত লাগবে কে জানে। ট্রেন থেকে নেমে মালপত্র নামিয়ে তারা এদিক ওদিকে খুঁজছে। দেখা যায় আশীষের দাদা সেনদাকে।

—তোরা এসে গেছিস তাহলে!

এরা যেন হাতে চাঁদ পেয়েছে। প্লাটফর্মের উপর টিপ টিপ্ করে প্রণাম করতে থাকে। চারিদিকে অনেকেই এদের এই বিচিত্র কাজটাকে কৌতুহলী চোখ মেলে দেখছে।

সেনদা বলে—থাক, থাক, হয়েছে। চল। পথে কোন কষ্ট হয় নিতো?

ওরা বলে—না-না!

ডুসেলডর্ফ বেশ ভালো শহরই।

ছিমছাম, পরিষ্কার। বড় বড় বাড়ি অপিস কারখানা, বসতি অঞ্চল ছাড়িয়ে হাইওয়েতে উঠতে যেন কিছুক্ষণ সময় লাগলো।

দুপাশে পাইন বন, দূরে দূরে দু একটা বাড়ি, ফার্ম-ছোটখাটো কারখানা-গুলোও সুন্দর।

হাইওয়েতে প্রচুর গাড়ি চলেছে, রকমারি ধরনের গাড়ি। গতিবেগও কম নয়।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পর বিজয়রা হাইওয়ে থেকে বের হয়ে একটু ভিতরে মাঝারি একটা শহর রাইড-এ এসে পেঁছিলো।

ওদিকে কারখানা।

এপাশে ছোট বড় কোয়াটার। বাংলো টাইপের বাড়ি আশপাশে একটু বাগান মত, কিছু গাছ গাছালিও রয়েছে। এইখানে ওরা এসে থামলো।

সেনদা বলে—কোম্পানীর বাংলো, তোদের মাইনে থেকে কিছু সামান্য করে কেটে নেবে।

বিজয় দেখছে বাড়িটাকে। সেনদার বাংলো একটু ওদিকে, তবে কাছেই। আর এই ছোট বাড়িটা ও সুন্দর। মেঝেতে কার্পেট পাতা, হিটিং-এর ব্যবস্থাও আছে। গরম জল ঠাণ্ডা জল আসে ট্যাপে।

ওদিকে রান্নাঘর। ফিটফাট কিচেন আলমারীতে বাসনপত্র, রান্নার সরঞ্জামও সব আছে।

ওদিকে একটা ফ্রিজে কিছু শব্জী, আলু কপি টম্যাটো মাংসও রয়েছে। দুটো শোবার ঘর, খাট—ভারি পুরু বিছানাপত্র কম্বলও রয়েছে। লাগোয়া বাথরুম।

রাজসিক ব্যাপার। অবশ্য পরে বিজয় দেখেছিল সব বাড়িতেই এখানে ওসব ব্যাপার আছে। তবু আস্তানা দেখে খুশী হয়। ভাড়া কিছু লাগবে তিনজনে তা ভাগ করে নেবে। কিন্তু একটা সমস্যা মিটেছে তাদের।

সেনদা গ্যাস জ্বালানো নিভানো দেখিয়ে দেয়। বলে।

—আজ কিছু খেয়ে জিরিয়ে নে। কাল সকালে কারখানায় যেতে হবে। জাষ্ট এ্যাট এইট। তৈরী হয়ে থাকবি। দরকার হয় ফোন করবি।

দেখে একটা টেলিফোনও রয়েছে।

সেনদা চলে যেতে তিনজনে এবার ধড়াচূড়া খুলে গরমজলে হাত মুখ ধুয়ে কফি নিয়ে বসেছে।

মলয় ওদিকে গ্যাস জেলে আলু ডিম এর ঝোল বানাচ্ছে।

আশীষ বলে—ভাত রাঁধবি না ?

মলয় বলে ভেতো বাঙালী এসেছিস জার্মানীতে, ভাত কি রে ? রুটি টোষ্ট করে ওই ঝোল দিয়ে খেয়ে নে। ভাত খেতে এসেছে ! শালা ! ভাত বেরবে কাল থেকে।

বিজয় দেখছে নোতুন দেশকে। কাল থেকে কাজ সুরু হবে।

এই ফাঁকে বিজয় দেশে বাবাকে আর বৌদিকে দুখানা চিঠি লিখে নিল। আজই পোষ্ট করে দেবে বৈকালে।

খাওয়া দাওয়ার পর বিজয়ই বাসনগুলো সিঙ্ক এ নিয়ে গিয়ে সাবান দিয়ে ধুয়ে নিল। এখানে এসব কাজ নিজেদেরই করতে হয়।

রান্না করা, ঘরের কাজ করার জন্য অঢেল লোক এখানে মেলে না। তাই এখানের মানুষ অনেক বেশী স্বাবলম্বী হতে পারে, আর এই ঠাণ্ডা আবহাওয়ার কঠিন জীবন তাদের বেশী কর্মঠ করে তুলেছে।

খাওয়া দাওয়ার পর ক্লান্ত শরীরটা বিছানায় পড়তেই ঘুম আসে।

ক'দিন পর ওরা তিনজনে তবু পায়ের নীচে মাটি, একটু আশ্রয় পেয়ে এবার কিছুটা নিশ্চিন্তে ঘুমুতে পারে।

সকাল আটটায় মালদহে রোদ ঝকঝক করে, সহরে কর্মব্যস্ততা সুরু হয়। হাট বাজার বসে যায়, দোকান পশারও। কিন্তু এদেশে সকাল আটটার যে এমনি রূপ তা জানা ছিল না।

তখনও অন্ধকার রয়েছে। পথে আলো জ্বলছে। দোকানপাট হোটেল—মায় মদের দোকান পার গুলোর দরজা বন্ধ। লোকচলাচলও নেই প্রায়। কিছু লোক ওই ঠাণ্ডার মধ্যেই পোষাক পরে কারখানাতে চলেছে।

সেনদা ওদের নিয়ে কারখানাতে ঢুকলো।

সেনদাকে দেখেছে বিজয়। লোকটি সুদূর মালদা থেকে এসে এখানে বেশ জাঁকিয়ে বসেছে। সেনদা বলে।

—সব জায়গাতেই সব কাজেরই কিছু মাথা থাকে। সেই মাথাগুলোকে ধরতে হবে। আর ঠিকমত কায়দা করে তাদের হাতে আনতে পারলেই সব কাজও ঠিক মত হয়ে যাবে। এইটা মনে রাখবি! চল তোদের মিঃ প্যাগানির কাছে নিয়ে যাই। তার আগে তোদের ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিতে হবে।

বিজয়ও শুনছে কথাগুলো।

এখানে পড়াশোনা আরও করতে হবে তোদের। নাহলে ভবিষ্যৎএ কিছুই হবে না। বিজয় বি. এস. সি. কেমিষ্ট্রিতে অনার্স ছিল। ওর কেমিক্যাল ইনঞ্জিনিয়ারিং পড়া দরকার কলেজে, মলয় ফিজিক্সের ছাত্র ওকে বলেন—তুই মেকানিক্যাল পড়বি, আশীষ তো টি. টি. এম-পি, অর্থাৎ টেনেটুনে ম্যাট্রিক পাশ। সেনদা বলে।

—তুই আর কি করবি? তুই স্কিলড লেবারে ভর্তি হয়ে যা, পরে স্পেশালাইজড কোর্স এ পড়তে পারবি।

দুবছর কারখানাতে এ্যাপ্রেন্টিশ না করলে কিন্তু কলেজে চান্স পাবি না। বিজয় ভাবছে কথাটা।

দু বছর এখানে থাকার পর তবে কলেজের মুখ দেখতে পাবে। কিন্তু এখন ওসব কথা ভাবার সময় নেই। চাকরীর দরকার।

তারপর দেখা যাবে কি করবে।

সেনদা এই মত শিখিয়ে পড়িয়ে ওদের লম্বা করিডর দিয়ে নিয়ে গিয়ে একটা বড় ঘরে হাজির হলো।

কয়েকটা মেসিনও রয়েছে। ওদিকে সেই মেসিনে কি খুট খাট করছে একটি তরুণ। আর একজন বয়স্ক লালচে চেহারার লোকও জামার হাত গুটিয়ে কি করছে।

—ও—গুডমর্নিং মিঃ প্যাগানি ছেলেদের এনেছি তোমার কাছে। সেই বয়স্ক ভদ্রলোক বিজয়দের দেখছেন। ওদিকে কর্মরত যুবকটিও দেখছে এদের। সেনদা শুধোন।

—কি হল মনি?

মনি বাঙলায় বলে—দিয়েছে বিগড়ে মেসিনটাকে। দেখি ঠিক করা যায় কিনা। মিঃ প্যাগানিঃ যত বাজে কাজের ফন্দি।

ওরাও একজন বাঙালীকে দেখে খুশি হয়।

মণি শুধোয় - তোমার ভাই-এর বন্ধুরা! ঠিক আছে পরে পরিচয় হবে।

মনি আবার কাজে মন দেয়।

সেনদা যেন মিঃ প্যাগানির কথাগুলোই বলেছিল।

ভদ্রলোক বিজয়কে লেবরেটারী পাঠালেন। মলয় গেল মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপে, আশীষকে মোলডিং ডিপার্টমেণ্টে পাঠালেন কাজের জন্য। তিনজন এবার

কারখানার তিনদিকে ছড়িয়ে পড়লো।

অবশ্য লাঞ্চ ব্রেকের সময় তিনজনে আবার একত্র হয়েছে।

সেনদাও এসেছে, এসে জুটেছে মণিবাবুও।

মণি বিশ্বাস এখানে খুবই পরিচিত একটি নাম। কারখানায় আর চার পাঁচজন ভারতীয় রয়েছে, ওদের সকলকেই এনেছে এখানে মনি বিশ্বাসই।

মনি বলে—মিঃ প্যাগান থাকতে চাকরী পাবে না ওরা? ইয়ার্কি!

তবে বাবা কাজ করো খাও। ফুর্তি করো।

ফুর্তিটা মনি বিশ্বাস একটু বেশীই করে।

বলে সে—দারোগার ব্যাটা আমি।

বাংলাদেশে দারোগাদের প্রতাপ তখন অপরিসীম। কোন বুড়ি খুশী হয়ে নাকি লাটসাহেবকে আশীর্বাদ করেছিল।

—বাবা তুমি দারোগা হও।

মনি বিশ্বাসের বাবা ছিলেন এ হেন দারোগা। এখন রিটায়ার করে কেউটে সাপ ঢোঁড়া সাপ হয়ে গেছেন, ফলে মনি বিশ্বাসও বাংলা দেশ থেকে এখানে এসে জুটেছিল ইনজিনিয়ারিং পাশ করে কয়েক বছর আগে।

তখন সবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হয়েছে। জার্মানী তখনও ধ্বংসস্তূপে ভরা। নিদারুণ ইহুদী বিতাড়নের ফলে দেশে কাজের লোকও কম। কিছু ইহুদীরা আবার মিত্রপক্ষ আসতে জার্মানীতে ফিরেছে।

কেউ ফিরেছে তাদের হারানো প্রিয়জনের সন্ধানে। মিঃ প্যাগান জাতিতে ইহুদী। মহাযুদ্ধের সময় কোন মতে পালিয়ে বেঁচেছিলেন। রাইড কারখানা প্রায় নিজের হাতে গড়া। দক্ষ ইনজিনিয়ার।

রাইডের মায়া কাটাতে পারে নি সে। তাই ফিরে এসেছিল। কারখানারও ক্ষতি হয়েছিল খুবই। আরও আসার কারণ ছিল তার ছোট ভাই-এর জন্য। বেপরোয়া ছেলেটার কোন খবরই নেই। বোধ হয় মারাই গেছে কোন কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে সে বেচারা।

প্যাগান আর ফিরতে পারেনি। আবার রাইডের সেই কারখানা নোতুন করে গড়ার নেশায় লেগেছিল, এখন সে এখানের ভাইস প্রেসিডেণ্ট।

একদিন তার ঘরে হঠাৎ কাকে ঢুকতে দেখে চমকে ওঠে মিঃ প্যাগান। তেমনি মুখ চোখ—উস্কোখুস্কো চুল, দীর্ঘ তামাটে চেহারা, যেন তার হারানো ছোট ভাই এতদিন পর ফিরে এসেছে।

কিন্তু না। এ অন্য জন।

মনি বিশ্বাস এসেছে এই কারখানায় চাকরীর জন্য মিঃ প্যাগানের কাছে। শিবপুরের মেকানিক্যাল ইনজিনিয়ারিং পাশ করা ছেলে। মিঃ প্যাগান তাকে চাকরীতে নিয়ে নেন। বলেন।

—আজ আমার ওখানেই থাকবে, কাল তোমার বাসা ঠিক করে দোব।

তখন বাসার সমস্যা ছিল। মিঃ প্যাগান সেদিন মনির মধ্যে যেন তার হারানো ভাইকে দেখেছিল।

বলে প্যাগান—এখানে কাজ করো, এখানে স্পেশ্যাল কোর্সে মেকানিক্যাল ডিগ্রী নিতে পারলে আরও উন্নতি হবে।

মনি বিশ্বাস বলে—দেখি কি হয়।

ওর তখন চাকরী, আশ্রয়ের দরকার। তাই ও কথা বলে।

মনি বিশ্বাস তখন থেকেই রাইডএ গেড়ে বসেছে। অবশ্য দু'একবার এখান থেকে চাকরী ছেড়ে পড়ার জন্য বন-এ গেছে। কিন্তু মাল খেয়ে সহরে স্ফূর্তি ফার্তা করে টাকা শেষ করে ফিরে এসেছে। একা নয়—দু একটি ছেলেকে নিয়ে।

আবার মিঃ প্যাগান মনি বিশ্বাস উইথ হিজ ফ্রেন্ডকে এখানে কাজ দিয়েছে। এখানের অনেকেরই এই পক্ষপাত ভালো লাগেনি। মিঃ প্যাগান কারখানার ভাইস প্রেসিডেন্ট। কাজের লোক। তার উপর কথা বলতে কারো সাহস হয় না। ফলে মনি এখানে জাঁকিয়ে আছে।

কাজের পর বাংলোয় ফিরছে তারা।

বিজয় তার কাজের ধারাটাকে বুঝেছে। কারখানায় সোল্ডিং হবার আগে মেটাল টেষ্টিং করতে হয়। অন্য সব মাল-এর টেষ্টিংও করতে হয় তাদের।

কিন্তু দু বছর না হলে ইনঞ্জিনিয়ারিং পড়ার সুযোগ পাবে না, এটা ভাবতে ভালো লাগে না। জীবনের দুটো বছর তাকে এখানে পড়ে থাকতে হবে।

শীত পড়েছে। শীতের এই সুরু। সারা পথঘাট ডুবে যাবে বরফে। পাতা ঝরে যাবে সব গাছের। সব সাদা বরফে ঢেকে যাবে। বাড়ি ঘরও। হাটু ভোর বরফে হেটে যেতে হবে সবাইকে।

মনি বিশ্বাসও ফিরছে তাদের সঙ্গে।

এখন বৈকালে লোকজন কিছু চলাচল করছে, দোকান পাটও খোলা। একটা মদের দোকান এর সামনে এসে মনি বিশ্বাস নধর একটি মেয়েকে দেখে এগিয়ে গিয়ে জড়িয়ে ধরে সটান চুমু খায়। মেয়েটাও ওকে প্রকাশ্যে জড়িয়ে ধরেছে। মনি আদর করে তাকে।

—হাই জুলি! ডার্লিং।

মেয়েটাও কলকল করে—ইউ সোনি—

মনিই পরিচয় করিয়ে দেয়—এই জলি, মাই সুইট হার্ট। এই পরে এর মালিকান্। মাই ফ্রেন্ডস!

মনি বলে—চল। একটু খেয়ে যাবি!

বিজয় চমকে ওঠে। মদ টদ খাবে না কোনদিনই সে। বৌদি—বাবা—

সাথীর কথা মনে পড়ে। ওরা যেন কি ঘৃণা ভরে চাইবে তার দিকে।

আশীষ অবশ্য ছোঁক ছোঁক করছে। পাব-এ নীলনয়না কিছু যৌবনবতীর উচ্ছল ভঙ্গী সে দেখেছে। মলয়ও একা একা এ দেশে নিঃসঙ্গ বোধ করে।

ওখানে হৈ হৈ আড্ডা চলেছে। মদের ফোয়ারা চলেছে।

ধোঁয়ায় ছোট্ট ঘরটা আবছা হয়ে আছে!

বিজয় বলে—না রে। বড্ড টায়ার্ড। বাসায় চল।

মলয়ও যেন বল ফিরে পায়। বলে সে, তাই চল।

আশীষ বলে তোরা যা, আমি এখুনিই যাচ্ছি চিলড্ বিয়ার একটু খেয়ে নিই।

চিলড্ বিয়ার খাবার সখ ওর খুবই। বিজয়রা ফিরে এল বাংলোর দিকে। দেশের কথা মনে পড়ে। এতদিন বাবা, বৌদি বোধহয় তার চিঠি পেয়েছে।

ক'দিন ছুটিতে কমলা বারাসত থেকে বের হয়ে পড়েছে শান্তিনিকেতন-এর উদ্দেশ্যে। এত কাছে আছে অথচ যাওয়া হয়নি তার। ওখানের ট্যুরিষ্ট লজে বুকিং করেছে।

বিজয়ের চিঠি এসেছে জার্মানী থেকে। ওখানের কোন কারখানায় কাজ করছে, এরপর ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার ইচ্ছা আছে। না হলে কোন উন্নতি করতে পারবে না। তবু খুশী হয়েছে কমলা।

জানে বিজয় থামবে না। সে বড় হবেই।

ট্রেনটা অজয় নদীর ব্রিজ পার হয়ে এক দমে নিয়ে ছুটে যেন বোলপুর ষ্টেশনে ঢুকেছে। এখান থেকে সাইকেল রিক্সায় চলে যাবে ট্যুরিষ্ট লজে। কটা দিন এখন থাকবে এখানের নির্জন শান্ত পরিবেশে।

হঠাৎ বোলপুরে নেমে কথাটা মনে হয়। এখানেই রয়েছে সাথী। ছোট রেল কলোনী, ওর বাসা খুঁজে নিতে অসুবিধা হবে না। বরং বৈকালের দিকে চলে আসবে ট্যুরিষ্ট লজ থেকে।

সাথীর জীবনের উপর দিয়ে যেন একটা ঝড় বয়ে গেছে। এখনও মাঝে মাঝে সাথীর মন উদাস হয়ে চলে যায় তার ভাবনার রাজ্যে।

কোথায় কুচবিহারের সবুজ পল্লীর দিনগুলো মনে পড়ে।

মনে পড়ে বিজয়ের সঙ্গে প্রথম দেখার কথা, সেই নষ্টচন্দ্রের রাত্রে।

বিজয়দের দুরন্তপনার কথা, তাদের নিভৃত মনে জাগে নোতুন একটি সাড়া।

সাথী তার কুমারী মনের সেই স্মৃতিগুলোকে ভোলেনি। বিজয়কে নিবিড় ভাবে ভালোবেসেছিল।

সেই ভালোবাসা পূর্ণতর হয়েছিল আরামবাগের মাটিতে। দ্বারকেশ্বরের বালুচরে কোন তারাকিনী রাতে দুটি মন নিভৃতে আরও কাছে এসেছিল, স্বপ্ন

দে... ...এর বাঁধার।

কিন্তু কি দুরন্ত ঝড়ে সেই ঘর তাদের নিঃশেষ হয়ে গেছে। বার বার তবু মনে পড়ে সেই দিনগুলোর কথা।

নোতুন জীবনকে তবু মেনে নিয়েছে সাথী। বিজয়ের উপর তার কোন অভিযোগ নেই। সে তার প্রেমকে নিজের স্বার্থে কলুষিত কলঙ্কিত করেনি। দুজনে নিয়তির বিধানেই সরে গেছে দুদিকে। আজ বিজয় কোথায় জানে না সে। তবু আজও সাথী প্রতি সন্ধ্যায় তার বাসার ছোট্ট ঠাকুর ঘরে সন্ধ্যাপ্রদীপ জেলে তার স্বামীর কল্যাণ কামনা করে, আর প্রার্থনা করে বিজয় যেখানেই থাকুক, সুখী হোক। বড় হোক।

এর বেশী কোন চাওয়া তার নেই।

প্রশান্তকে নিয়েও শান্তিতে আছে সাথী। নির্বিরোধী শান্ত ভালোমানুষ। চাকরীই তার ধ্যান জ্ঞান। ফলে সাথীকেও প্রায় একাই থাকতে হয়।

বৈকালে সেদিন হঠাৎ কমলা বৌদিকে আসতে দেখে খুশি হয় সাথী। ওকে জড়িয়ে ধরে বলে সাথী।

—ওমা! আগে চিঠি দাওনি! কোন ট্রেনে এলে? মালপত্র কই তোমার? সাথীর কথায় কমলা বলে।

—ওসব শান্তিনিকেতনে ট্যুরিষ্ট লজে রেখে এসেছি।

স্বাগত কণ্ঠে বলে সাথী।

—আমার মত গরীবের বাড়িতে থাকবে কেন?

হাসে কমলা—পাগলী! নারে—এই তো এসেছি। বল কেমন আছিস?

সাথী বলে—আছি কোন মতে। বেঁচে আছি।

ওর কথার জবাবে যেন নীরব একটা ব্যর্থতার গ্লানিই ফুটে ওঠে।

কমলা তার কারণও জানে। তবু বলে।

—না রে! জীবনকে ভালোবাসতে হয় সাথী। ঈশ্বর একদিকে শূন্য করলেও অন্য দিয়ে তা পূর্ণ করেন। দেখিস নিম্নদীর একদিক ভাঙ্গে তখন অন্যদিকে নোতুন চরভুমি জেগে ওঠে। জীবন শুধু নেয় না—ফিরিয়েও দেয় অনেক কিছু!

সাথী হাসল।

এর মধ্যে চা করে এনেছে সাথী। বলে সে।

—এখানে আছি শান্তিনিকেতন ভালো করে দেখা হয়নি। ওর তো সময়ই নেই।

কমলা বলে—বেশতো। তাহলে কাল চল। ট্যুরিষ্টলজে থেকে দিন ভোর হৈ হৈ করে শান্তিনিকেতন, শ্রীনিকেতন, খোয়াই ঘোরা যাবে। প্রশান্তকে বল!

প্রশান্তও এসেছে। শান্ত নম্র ছেলেটি বলে।

—কালতো আমাকে ডবল ডিউটিতে থাকতে হবে বৌদি। একজন ছুটিতে গেছে।

সাথী বলে—শুনলে তো।

প্রশান্ত বলে—তোমরাই যাও দুজনে। কাল আমি চালিয়ে নোব।

সাথী চুপ করে থাকে। কমলা বলে।

—তাই চল সাথী।

ওই বাসার পরিবেশ থেকে একদিনের অবাধ মুক্তি সাথীর মনে কি সাড়া এনেছে। সারাদিন ধরে শান্তিনিকেতনে, শ্রীনিকেতন ঘুরে ওরা বৈকালের পড়ন্ত রোদে খোয়াই-এ এসে বসেছে।

লাল রুক্ষ মাটির স্তর যেন ধরিত্রীর বুকফাটা রূপকে প্রকটিত করেছে। পাখীরা কলরব করে। পশ্চিম আকাশে লেগেছে সূর্যের লালিমা।

সাথী এই খবরটা শোনার জন্যই উদগ্রীব হয়ে ছিল। বিজয় এখন দূর দেশে, বরফ ঢাকা রাজ্য—বিজয় সেখানে নিঃসঙ্গ হয়ে রয়েছে। জীবনে একটা আঘাত তাকে যে এমনি দেশছাড়া করবে তা ভাবেনি সাথী। এর জন্য যেন সেই-ই দায়ী।

কমলা বলে—ওখানে ওর বন্ধুরা এর মধ্যে মদ ধরেছে, মেয়েরও নাকি অভাব নেই। যুদ্ধে পুরুষতো ওখানে শেষ। মেয়েরাও নাকি খুব সিরিয়াস।

সাথী বলে—ও কি মদ খাওয়া আর নষ্টামি শিখতে ও দেশে গেছে? এসব কথা লেখে কেন?

কমলা দেখছে সাথীকে।

বলে সে-না-না। বিজয় তেমন নয় রে, দেখবি ও বড় হবেই। তুচ্ছ মোহ ওকে বাঁধতে পারবে না।

সাথী চুপ করে কি ভাবছে।

বিদেশ সম্বন্ধে শুনেছে অনেক কথাই। অনেকে নাকি সেখানের মেয়েদের বিয়ে করে ওদেশেই রয়ে গেছে। হারিয়ে গেছে তারা। তার বিজয়কে সে হারাতে চায় না।

আজ তার স্বামী—সংসার হয়েছে। সাথী সে সবও মেনে নিয়েছে। তবু মনে হয় আর একজনের প্রতি তার কিছু কর্তব্যও রয়ে গেছে। দেহের স্পর্শ আজ অবান্তর, কিন্তু মন থেকে বিজয়কে সরাতে পারবে না। তাই বিজয়ের জন্য তার ভাবনাও রয়ে যায়।

সন্ধ্যা নামছে নির্জন দিকহারা প্রান্তরে।

কমলা বলে—চল সাথী, ফিরতে হবে। সন্ধ্যা হয়ে এল।

সাথী ফিরছে ঘরের দিকে। তবু বার বার মনে পড়ে একজনের কথা। দূর প্রবাসে নিঃসঙ্গ বিজয়কে সে ভোলেনি। দেহের স্পর্শাতীত মন, সেই মন দিয়ে

আজ বিজয়কে সে নোতুন করে পেতে চায়। এ তার অপরাধ কিনা জানে না— কিন্তু হলেও তাকে মেনে নেবে সাথী।

শীত পড়েছে রাইড-এ। পাইন-ফারের পাতায় সাদা বরফের আস্তরণ। এরা ভোর রাতে আপাদমস্তক ঢেকে কারখানায় যায়।

বিজয় যেন সব মিলিয়ে এ দেশকে ভালোবাসতে পারেনি। সে এর মধ্যে লণ্ডন—বার্মিংহাম—ওয়েলস্ ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে ভর্তির জন্য দরখাস্ত করেছে। হয়তো কোনটার জবাব আসবে—সেও চলে যাবে এখান থেকে।

আশীষ এর মধ্যে রাম ধরেছে, পাব-এ কোন মেয়েকেও পাকড়েছে উইক এণ্ড-এ বাইরে চলে যায় তাকে নিয়ে।

মলয়ও চাকরীতে একটা গ্রেড পেয়েছে। তার ভালোই লাগে জায়গাটা। কিন্তু বিজয় যেন এটাকে মেনে নিতে পারে নি।

বড় বিশ্রী লাগে, নিঃসঙ্গ বোধ হয়।

আশীষ মলয়দের সঙ্গেই থাকে।

তবু উইক এণ্ড তারা দুজনেই বের হয়ে যায় কোন বান্ধবীর সঙ্গে। রাত্রিতেও ফেরে আনন্দ করে।

বিজয় যেন আরও নিঃসঙ্গ বোধ করে।

এটা দেখেছে তাদের ডিপার্টমেন্টের লিজা! মেয়েটি সুন্দরী—ছিমছাম। সিগ্রেটও খায় না, ড্রিঙ্কও করে না। লিজার বাবা যুদ্ধে মারা গেছে, মাকে নিয়ে থাকে রাইড-এর একটি ছোট বাড়িতে।

লিজা দেখেছে বিজয়কে।

কাজেও ওর পটুতা আছে। সুন্দর সংযত একটি তরুণ। লিজা সে দিন অপিসের ছুটির পর ওর সঙ্গ নেয়।

বলে সে—তোমার বন্ধুরা বোধ হয় ব্যস্ত!

বিজয় মাথা নাড়ে। লিজা চলেছে তার সঙ্গে। বৈকালের আঁধার নেমেছে। বরফ তখনও ঝরছে। ঝরবে এপ্রিল অবধি। লিজা বলে।

—তুমি বোর ফিল করছো, না? এখানকার জীবনকে ওদের মত মেনে নিতে পারো নি।

বিজয়ের মনের কথাই যেন বলেছে লিজা।

বিজয় বলে—তাই-ই।

দেশের কথাও শুধোয় লিজা। ওর বাবা মা-ভাই বোনদের কথা শুনে বলে, আমারও সব ছিল কিন্তু জানো ব্লাডিওয়ার আমাদের সব কেড়ে নিয়েছে। বাবা— ভাই বোন সব। আমি এখন একা—বুড়ি মাকে নিয়ে আছি।

ওর কণ্ঠে বেদনার সুর ফুটে ওঠে।

নীল ডাগর দুচোখ জলে ভরে ওঠে। সাথীর কথা মনে পড়ে বিজয়ের। ওর কাকা মারা যাবার পর সাথাও এমনি অসহায় কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিল।

লিজা বলে—আমাদের বাড়ির কাছেই এসে পড়েছি কিন্তু। চলো—এককাপ কফি খেয়ে যাবে। মাও তোমাকে দেখলে খুশী হবে। যাবে?

বিজয় ওর আমন্ত্রণে আন্তরিকতার সুরটাকে দেখেছে। বলে সে।

—ঠিক আছে। চলো।

—সো কাইণ্ড অব ইউ বিজয়। লিজাও খুশি হয়েছে।

ওর মা ও খুশি হয়। লিজা ওদিকেও কিচেনে কফি করতে ব্যস্ত।

ওর মা বিজয়ের কাছে দেশের গল্প শুনছে।

ক'মাসে বিজয় জার্মান ভাষা কিছুটা রপ্ত করেছে। কিন্তু পড়তে লিখতে এখনও ভালো পারে না। দারুণ কটমট ভাষা।

বুড়ি শুধোয়—তোমার মা আছে? মাকে চিঠি দাও তো? না এ দেশে এসে ওসব ভুলে গেছো?

বিজয় বলে—না—না। চিঠি দিই।

সব মায়েরাই যেন এক। বলে বুড়ি।

—আমার সবছিল, চলে গেল। একমাত্র মেয়েকে নিয়ে বেঁচে আছি। লিজাও খুব ভালো মেয়ে। নাহলে আমাকে কোন মিশন হোমে গিয়ে মরতে হতো।

কফি এনেছে লিজা।

এই ফাঁকে অপিসের ভারি পোষাক ছেড়ে সহজ সুন্দর একটা পোষাক পরেছে লিজা। এমনি পোষাকে লিজাকে দেখেনি এর আগে বিজয়। সুন্দরী—স্বাস্থ্যবতী মেয়েটিকে আরও সুন্দর বলে বোধ হয়। অনেকটা বাঙালী মেয়েদের মতই ঘরোয়া এরা।

হাসে লিজা—কি দেখছো? কফি নাও।

বিজয় চমকে ওঠে। যেন তার বহু দিনের চেনা কাউকে আবার এক দূর নির্বান্ধব দেশে এসে ফিরে পেয়েছে।

মাথা নামিয়ে বিজয় কফিতে চুমুক দিতে থাকে।

ফিরছে বিজয়। লিজা ওকে দরজা অবধি বিদায় জানাতে এসে বলে। —আবার আসবে কিন্তু। মাও তোমাকে দেখে খুশী হয়েছে।

বিজয় ফিরছে বাসার দিকে।

নির্জন বরফ ঢাকা পথে আলোগুলো লালচে আভা মেলে জ্বলছে।

দু একজন লোককে দেখছে, ওরা ফিরছে বাড়ির দিকে।

বিজয়ের আজ মনে হয় এই নির্বান্ধব দেশে একজনকে সে পেয়েছে যাকে দেখে কিছুটা খুশী হয়েছে। একটা আশ্রয় সে দেখছে যেখানে অবসর সময়

টুকুকে কাটাতে পারে সে।

এখানের নিঃসঙ্গ জীবন কিছুটা সহনীয় হয়ে ওঠে তার কাছে।

আঁপিসেও সময়টা কোন দিকে কেটে যায় বিজয়ের কাজের মধ্যে। লিজাও রয়েছে। ওর সুন্দর মুখের হাসিটুকুও ভালো লাগে বিজয়ের। লাঞ্চ-এর সময় মাঝে মাঝে লিজাও খাবার আনে। জোর করে দেয় বিজয়কে।

বিজয় এর মধ্যেও দু'একবার লিজার বাড়িতে গেছে।

লিজার জন্মদিন পার্টিতে একটা উপহারও দিয়েছে। লিজা খুব খুশী হয়। তবু বলে সে, দামী ঘড়ি কে তোমাকে দিতে বলেছিল নটি বয়। মেয়েদের পিছনে এ ভাবে পয়সা খর্চা করো না। বিপদে পড়বে।

বিজয় তবু খুশীই হয়েছিল ওর এই ছোট শাসনে।

সেদিন তারই প্রতিদান দেবার জন্যই লিজা বলে বিজয়কে।—তুমি এখানে আসার পর কোথাও যাওনি। কাজ আর বাসা—বোর হয়ে গেছো। চল এই উইক এণ্ড-এ বেড়িয়ে আসবো দুজনে!

চমকে ওঠে বিজয় ওর কথায়। ভয়ও হয়, আবার মনের অতলে একটা বিচিত্র অনুভূতিও জাগে।

আশীষ, মলয়রাও উইক এণ্ডে বাইরে যায় কোন বান্ধবীর সঙ্গে। কোথায় কোন হোটেল মোটেলএ ওঠে। আর ফিরে এসে তাদের যে সব বিচিত্র কাহিনী শুনিয়েছে, তাতে ভয়ই পায় বিজয়।

হাসছে লিজা ওর মুখে ভয়ের ছায়া দেখে।

বলে সে—কি হল? ভয়ে যে শুকিয়ে গেলে।

বিজয় তবু নিজের সাহস দেখাবার জন্য বলে।

—না, না ভয় পাবো কেন?

লিজা বলে—ভয়, নেই বিজয়। আমাকে আশা করি বিশ্বাস করো। চলো।

বরফ এর দিন ফুরিয়ে আবার মাটি জেগেছে, কচি সবুজ ঘাস ঢাকা ঢেউ খেলানো মাটি, পাইন বন। ঝর্ণাগুলো বরফ গলা জলে উচ্ছল হয়ে উঠেছে। দূরে কোথায় একটা ফার্মের বাড়ি—আপেল বাগান। গরু ঘোড়া চরছে।

লিজা গাড়ি নিয়ে চলেছে। মেয়েটা চালায় ভালো।

ওরা হাই ওয়ে ছেড়ে নির্জন একটা পথ ধরে চলেছে। যেন কোন গ্রামের পথ।

গ্রাম হলেও এদিকটা কিছুটা জমজমাট।

দোকান পশার কিছু আছে। একটা ছোট চার্চও। ওরা আরও ভিতরে একটা ছোট্ট সাজানো বাগান ঘেরা বাড়ির সামনে গিয়ে থামলো। বাগানের ওদিকে কিছু পাইন সবুজ ম্যাপেল গাছের নীচু দিয়ে একটা ঝর্ণা বয়ে চলেছে।

লিজা বলে—এইটা আমাদের ভিলেজ হোম। এখানে মাঝে মাঝে আসি।

ছোট্ট কাঠের বাড়ি। বেসামেণ্টে হিটিং বয়লার, গ্যাসও রয়েছে। উপরে কার্পেটপাতা বসার ঘর, কয়েকটা ভারি সোফা—একটা টিভি সেট রয়েছে। ওদিকে কিচেন। গ্যাস রেঞ্জ—আলমারী খাবার দাবার, উপরে দুটো বেড রুম।

লিজা এর মধ্যে গাড়ি গ্যারেজে রেখে এ্যাপ্রণ চাপিয়ে বাগান সাফ করতে লেগেছে। বিজয় বলে।

—ও কাজ আমিও পারি।

সেও একটা লন মোয়ার নিয়ে ঘাস ছাটতে চেষ্টা করে। স্লিপ করছে, হাসে লিজা। সে এসে ওর কাছে দাঁড়িয়ে মেসিনটো চালানো শেখাতে চেষ্টা করে। লিজার অনাবৃত নিটোল হাতের ছোঁয়া বিজয়ের হাতে, লালচে গাল সুন্দর মুখ, সোনালী একরাশ চুলের সুবাস বিজয়কে যেন চকিতের জন্য আনমনা করে দেয়। কাঁপছে ওর সারা দেহ।

লিজাও বুঝেছে বিজয়ের মনের অতলের ঝড়টাকে। সেও চমকে উঠেছে।

লিজা সামলে নিয়ে সহজভাবে বলে।

—নাও, ইউ ট্রাই বিজয়।

বিজয়ও যেন চেতনা ফিরে পায়।

দুজনে কিচেনে কি নোতুন রান্নার চেষ্টা করছে।

বিজয় হৈ চৈ বাধাতে লিজা ছুটে আসে। প্যানে পুড়েছে খাবারটা।

লিজা নামিয়ে নিয়ে বলে।

—বাংলোয় তুমি রান্না করো?

এখানে এসব কাজ নিজেদেরই করতে হয়। প্রথম দিকে মলয় আশীষও চেষ্টা করেছিল বিজয়কে দিয়ে রান্না করাতে। একজনের এক একদিন পালা পড়বে রান্নার।

কিন্তু বিজয়ের রান্না খেয়ে তারা তো অগ্নিশর্মা।

খাবার নুনে পুড়িয়ে দিয়েছে, বহু কষ্টে কিছু চাল যোগাড় করে ভাত খাবার আয়োজন হয়। সে চালও গলিয়ে পিণ্ডি করে দিয়েছিল বিজয়।

ওরা বাধ্য হয়ে বলে—তুই বাসন মাজতে পারবি তো?

এ কাজটা অনেক সোজা বোধ হয় বিজয়ের। বেসিনে গরম জল আসে। কিছু লিকুইড সোপ দিয়ে চটপট বাসন পত্র ধুয়ে ফেলা যায়।

বিজয় বলে—তা পারবো।

মলয় বলে—তাহলে ব্যাটা তুই বাসনই মাজবি। রান্নাবান্না তোর কর্ম নয় তা বুঝেছি।

বিজয় অবশ্য ইচ্ছা করেই এই বুদ্ধিতে রান্নার কাজ থেকে মুক্তি পেয়েছিল ওরা সেটা বুঝতে পারেনি। আজ লিজার কথায় বিজয় বলে।

—না। রান্না ওরাই করে আমি বাসনমাজি রোজ।

হাসে লিজা—তাহলে ডিস্‌ওয়াশার হয়ে একজন মেয়ে ছেলে থাকতে রাঁধতে গেলে কেন ?

হাসছে বিজয়। বলে—তোমাকে আমার রান্না খাওয়াতে চেয়েছিলাম।

লিজা এগিয়ে আসে। ওর দুচোখে হাসির ছটা। বলে সে —ইজ ইট সো ? চলো—ও বাসনটা এখন থাক।

লিজাই রান্নার ভার নিয়ে নেয়।

বৈকালে সবুজ বনে বনে হারিয়ে যায় তারা। বিজয় যেন বহুদিন পর আগেকার সেই মহানন্দার তীরের দিন গুলোর কথা মনে করতে পারে। মনে পড়ে বাবা—মা—বৌদির কথা।

কুচবিহারের দিনগুলোও মনে পড়ে। সাথীর কথা আজও ভোলেনি সে।

ছায়ানামা অপরাহ্নে দুজনে ম্যাপেল গাছের নীচে বসেছে।

পাখীরা আবার ফিরে এসেছে শীত শেষে। ঘাসে ঘাসে ফুলের আলপনা।

লিজা চাইল বিজয়ের দিকে।

বিজয়ের চোখে কি যেন নীরব একটি আলোর আশ্বাস। সব হারিয়ে নিঃসঙ্গ লিজাও যেন বিজয়কে পেয়েছে।

—বিজু।

বিজয় চাইল ওর দিকে। লিজা ওকে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে কাছে টেনে নেয়। ওর নরম নিটোল দেহের মাদক আমন্ত্রণ বিজয়কে আচ্ছন্ন করে তুলেছে।

লিজার উত্তপ্ত ঠোঁটের ছোয়া বিজয়ের গালে, বিজয় যেন আজ সব বাঁধন হারিয়ে ওর কাছে ধরা দিয়ে নিশ্চিন্ত হবে।

হঠাৎ চমকে ওঠে বিজয়। সারা মনে তার ঝড় ওঠে। বৌদির কথা, সাথীর কান্নাভিজে মিনতির কথা মনে পড়ে। না—না। সে এভাবে নিজেকে হারাতে পারবে না।

বিজয় নিজেকে মুক্ত করে নিল ওর নিবিড় কোমল বাঁধন থেকে। চমকে ওঠে লিজা! দেখছে সে বিজয়কে। অবাক হয়ে শুধোয়।

—কি হল বিজু ?

বিজয় বলে—না, কিছুই হয় নি লিজা। প্লিজ তুমি আমাকে ভুল বুঝোনা।

লিজা অবাক হয়ে দেখছে ওকে।

বৈকালের আলো মুছে আসছে। লিজা শুধোয়।

—একটা কথার জবাব দেবে বিজু ?

বিজয় চাইল ওর দিকে। লিজা শুধোয়।

—দেশে কাউকে ভালোবাসতে তুমি ?

বিজয় চাইল ওর দিকে। লিজার চোখে যেন সাথীরই অস্তিত্বকে দেখেছে সে। এ তার একান্ত গোপন এক সম্পদ। আজও সাথী তার মনে রয়ে গেছে।

লিজা বলে—আমাকে বিশ্বাস করো, সত্যি বলো।

বিজয় বলে সাথীর কথা। আজ সে তার জীবনে নেই—তবু তার প্রেমকে স অসম্মান করতে পারবে না। তার স্বপ্ন নিয়েই থাকবে সে।

লিজা বলে—কেন. সে তোমাকে বিয়ে করতে পারে না?

হাসে বিজয়। জানায় সে।

—আমাদের সমাজে তার কোন বিধান নেই লিজা।

অবাক হয় লিজা—স্ট্রেঞ্জ! তুমি সারা জীবন কি নিয়ে থাকবে বিজু? তোমার প্রেম ভালোবাসা—স্বপ্ন তার কোন দামই নেই? তোমার কোন প্রয়োজনও নেই?

বিজয় চুপ করে থাকে।

সন্ধ্যা নামছে। তারাগুলো এখানের আকাশেও জেগে ওঠে পাইন ম্যাপেল বনের মাথায়। বিজয় কি ভাবছে।

লিজা বলে—আমি তোমার প্রেমিকাকে হিংসা করি বিজু!

তোমার জন্য দুঃখ হয়।

দুজনে আবছা অন্ধকারে ফিরছে বাড়ির দিকে। আজ বিজয়ও যেন লিজার কাছে এসব কথা বলে কিছুটা মুক্ত হয়েছে। লিজাও সহজভাবে শ্রদ্ধার সঙ্গে কথাগুলো নিয়েছে।

বিজয়ের মনে হয় এরাও কিছুটা তাদের দেশের মেয়েদের মতই ভালোবাসার মর্য্যাদা দিতে জানে।

উইক এণ্ড দুজন ফিরেছে আবার। বিজয় আর লিজার সম্পর্কটাও অনেক সহজ হয়ে উঠেছে। যেন তারা দুটি বন্ধু। লিজা বলে।—তোমার প্রেমিকার ছবিটা দেখাবে আমায়। খুব দেখতে ইচ্ছা করে তাকে।

হাসে বিজয়—তাই?

সুন্দর মেজাজটা বিষিয়ে যায় বিজয়ের বাংলোয়, ফিরে।

আশীষ—মলয়ও ফুর্তি ফার্তা করে ফিরেছে উইক এণ্ডে। আশীষ ফেরার পথে মদও গিলেছে আবার।

ওরাও দেখেছে লিজার সঙ্গে বিজয়কে ফিরতে।

বাসায় এসে তাই এবার বলে তারা।

—কি রে বিজু! শালা খুব যে সতীপনা দেখাচ্ছিলি। এখনতো দেখি ওই সাত হাত ঘোরা এঁঠো মালের সঙ্গে উইক এণ্ড করছিস?

চমকে ওঠে বিজয় এই কথায়।

মলয় বলে—তা ছুঁড়িটা ক্যামন রে? দেখেতো মনে হয় ভালোই। প্রতিবাদ করে বিজয়—কি যা-তা বলছিস বাজে কথা—

মলয় বলে—বাজে কথা? শালা ডুবে ডুবে জল খাও শিবের বাপও টের

পাবে না। এদিকে ঠিক লটকেছিস ?

আশীষ বলে--মাছ খায় সব পাখীতে বদনাম শুধু মাছরাঙ্গার !

লে রে—খা আর ঢ্যামনামি করিস না।

মদের বোতলটা ওর সমান এগিয়ে দিতে বিজয় রাগে অপমানে জ্বলে ওঠে। বলে সে।

—ওসব খাই না, মেয়েছেলে নিয়ে নষ্টামিও করতে আসিনি তোদের মত। আশীষের নেশা চড়ে গেছে। চটে ওঠে সেও।

বলে সে—কি বললি ? আমরা নষ্টামি করি ? এত বড় কথা—

আশীষ বিজয়ের কলার চেপে ধরেছে নেশার ঘোরে।

বিজয়ও চটে ওঠে এই অপমানে। গর্জাচ্ছে আশীষ।

—আউট করে দোব ব্যাটা ধর্মপুত্তুরকে। শালা ইয়ার্কি পেয়েছিস।

মলয়ই ছাড়ায় ওদের ! নাহলে বোধ হয় হাতাহাতি হয়ে যেতো।

বিজয় গুম হয়ে যায়।

বেশ বুঝেছে এতদিন পর আজ আর ওদের সঙ্গে থাকা তার যাবেনা। এই পরিবেশে ওরাও বদলে গেছে।

বিজয় সেইরাত্রে খেলও না।

ওরাও ডাকেনা তাকে। বিজয় এখান থেকে চলে যাবার কথাই ভাবছে। এদেশ থেকেই চলে যেতে পারলে তবে কিছু হবে তার। এখানে এখনও এক বছর হাত-পা বাঁধা অবস্থায় এদের এইসব কথা সয়ে থাকতে হবে তাকে। কথাটা ভাবতে ও খারাপ লাগে।

দেশে ফিরে যাবার কথা ভাবছে সে।

বাবাও বলেছিলেন সেখানের দরজা তার খোলাই আছে। কিন্তু তবু শেষ চেষ্টা না করে বিজয় বিদেশ থেকে ঘরে যাবেনা।

পরদিনই চিঠিখানা এসে পেঁ।চেছে ওয়েলস্ এর প্যাণ্টিপ্যাডি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। সেখানে তাকে পড়ার সুযোগ ওরা দেবে--থাকার ব্যবস্থাও হয়ে যাবে সেখানে। তাহলে সামনের সপ্তাহেই গিয়ে সেখানের বিশ্ববিদ্যালয়ে রিপোর্ট করতে হবে।

বিজয় মনস্থির করে ফেলে আজই সেখানে টেলিগ্রাম করে দেয়। এদেশ থেকে সে চলেই যাবে নোতুন কোন পরিবেশে।

খবরটা শুনে সেনদাও আসেন।

বলেন তিনি—চলে যাবি তুই শুনলাম।

মলয়, আশীষ অবশ্য গতরাত্রের সেই ঝগড়ার ব্যাপারটাকে চেপেই গেছে। তারাও গম্ভীর হয়ে গেছে।

এর মধ্যে বিজয় যে সত্যিই এখান থেকে চলে যাবার চেষ্টাই করছিল ত

জানে না। আজ সেটা জেনেছে।

সেনদার কথায় বিজয় বলে—ওখানের ইউনিভার্সিটিতে চান্স পাচ্ছি, তাই চলে যাবো। এখানে কবে চান্স পাবো কি পাবো না জানিনা। ওখানে গিয়ে কিছু একটা কাজ জুটিয়ে নেবো। ওখানে সিভিল ইনঞ্জিনিয়ারিং চান্স পাচ্ছি।

সেনদা বাইরেই ঘুরেছেন। জানেন, কার ভাগ্য কোথায় নির্ধারিত আছে এত বড় পৃথিবীতে তা কেউ জানে না। তাই বাধা দেন না।

বলেন - সাবধানে থাকিস। পড়ার জন্য এখানের বন্ধু বান্ধব চাকরী ছেড়ে যাচ্ছিস সেটা যেন করিস।

চলে যাচ্ছে বিজয়। আবার কোন বন্ধু বিহীন নোতুন দেশে।

এমনি দিনে চিঠিখানা আসে। চমকে ওঠে বিজয়। এ চিঠি সে আশা করেনি।

সাথী চিঠি লিখেছে তাকে বোলপুর থেকে।

বৌদির কথাও লিখেছে। আর লিখেছে তার বন্ধুদের সম্বন্ধে সাবধান হতে। নিজের পথে যেন চলে, যত বাধাই আসুক একদিন উত্তীর্ণ হবে সে। ঠাকুরের কাছে রোজ সে তার কল্যাণ কামনায় সন্ধ্যাদীপ জেলে প্রণাম জানায়। আজ সে যতদূরে যেখানেই থাক সাথী মনে মনে তার সাথী হয়েই থাকবে। বিজয় আরও বড় হবে, জয়ী হয়ে একদিন দেশে ফিরবে। সেদিনও সাথী তার পথ চেয়েই থাকবে।

নিজের কথাও লিখেছে। এজীবনটাকে সে মানিয়ে নিয়েছে তার কথা ভেবেই।

চিঠিখানা বিজয়ের মনে কি একটা নির্ভর, আশ্বাস আনে। তার আকাশে এখন স্বাতীনক্ষত্রের স্নিগ্ধ জ্যোতি নিয়ে জেগে আছে একজন।

বিজয়ের মনে আজ অজানা জগতে হারিয়ে যাবার সাহস আনে সেই।

লিজাও স্টেশনে এসেছিল।

বলে সে --জীবনে আর হয়তো দেখা হবে না বিজয়। তবু তোমার কথা মনে থাকবে। মনে থাকবে ভারতীয়রা প্রেমের মর্যাদা দিতে জানে। গুডবাই!

ডুসেলডর্ফএ এসে বছর খানেক আগে নেমে ছিল তারা তিনজনে। আজ ওরা দুজনে রয়ে গেল এখানে, আবাব পথের টানে বিজয় হারিয়ে গেল কোন দূর জগতে।

ট্রেনটা চলেছে ফ্রাঙ্কফুর্ট এর দিকে। ওখানে ট্রেন বদলে বিজয় চলে যাবে ফ্রান্সের ক্যালের দিকে। সেখান থেকে বোটে ডোভার পার হয়ে ইংল্যান্ড। সেখান থেকে ওয়েলস্ এর ছোট্ট একটি সহরে।

চাকার শব্দ তুলে রাতের অন্ধকারে ট্রেন চলেছে।

বিজয়ের পথও চলেছে তাকে নিয়ে, এ চলার সুরু হয়েছিল সেই ছায়াঘেরা নবাবগঞ্জ থেকে। আজও চলেছে সে। কোথায় করে তার যাত্রা শেষ হবে জানেনা।

মলয়—আশীষ, লিজার কথা মনে পড়ে।

লিজা যেন তার মনে সাথীর উজ্জ্বল অস্তিত্বকে জানিয়ে দিয়েছে নোতুন করে।

ওয়েলস কয়লাখনির দেশ। এর মাটির রং কালো। এদিক ওদিকে দেখা যায় কয়লাখনির পিটহেডগিয়ারের ষ্টীল ফ্রেমগুলো। চিমনি দিয়ে কালো ধোঁয়া বের হয়ে কুয়াশাছন্ন আকাশকে ভারি করে তুলেছে।

প্যান্টিপ্যাড়ি এই পরিবেশের মধ্যে একটু স্বতন্ত্র। ছোট্ট জনবসত, পাহাড়ের গায়ে গায়ে বসতি, ওদিকে ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস একটু ঝকঝকে। কিছু গাছ গাছালি আছে।

ওখানেই বিজয়ের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মিসেস ম্যাস্কলের বাড়িতে পেয়িং গেস্ট হয়ে থাকতে হবে।

ভদ্রমহিলার স্বামী একজন ট্রাক ড্রাইভার। মাঝে মাঝে বাড়ি আসে। প্রথমে ট্রাক ড্রাইভার শুনে একটু ঘাবড়ে গেছলো বিজয়।

তার দেশে ট্রাক ড্রাইভারদের দেখেছে। ধাবায় ট্রাক রেখে দিশী মদ গিলে পড়ে থাকে। কারণ-অকারণে খিস্তী করে। কিন্তু এখানে মিঃ ম্যাস্কেলেকে দেখে এদেশের ট্রাক ড্রাইভার সম্বন্ধে ধারণাটা বদলে যায়।

পরিষ্কার সুট কোট পরে বটনহোলে ফুলগুঁজে রবিবার মিসেস ম্যাস্কেলেকে নিয়ে, গির্জায় যায়।

বিজয়কেও স্নেহ করে ভদ্রমহিলা।

এখানের পরিবেশটা তবু কিছুটা ভালো লাগে জার্মানী থেকে। এদের ভাষাও বোঝে। ইংরাজী ভাষা জার্মাণ ভাষার মত তার কাছে নোতুন নয়।

ছোট বিশ্ববিদ্যালয়, পড়া সুরু করে এবার ব্যাপারটা ভেবে একটু বিপদে পড়েছে বিজয়। জার্মানীতে কিছু টাকা জমিয়ে ছিল, তাই নিয়ে এখানে এসে ভেবেছিল পড়তে পড়তে কোন একটা কাজ ও জুটিয়ে নিতে পারবে। সেই পয়সায় তার পড়া—থাকা খাওয়াও চলে যাবে।

কিন্তু পান্টিপ্যাড়িতে সেই সুযোগ খুবই কম। ছোট জায়গা, ব্যবসাবাণিজ্য বড় দোকান পশার হোটেল তেমন কিছু নেই যেখানে কোন কাজ পাবে সে। ভাবনায় পড়ে বিজয়।

এখানে পড়তে গেলে বিপদেই পড়বে সে। তার জমানো এত টাকা নেই যে বসে বসে পড়া চালাতে পারবে।

সুতরাং এখান থেকে আরও বড় কোথাও যেতে হবে তাকে।

ভারতীয় বলতেও তেমন কেউ নেই এখানে। বাঙ্গালীতো কা কথা। হঠাৎ সেদিন লাইব্রেরীতে পরিচয় হয়ে যায় এক ভদ্রলোকের সঙ্গে। হামিদ সাহেব ভারতীয়। বিজয় যেন আপনজনকে খুঁজে পায়! তাই ওকে সব কথা জানাতে হামিদ সাহেব বলে।

—লিভারপুলে তার চেনা জানা আছে ওখানের ইউনিভার্সিটিতে। ওখানে অনেক ইণ্ডিয়ান, বাঙ্গালীতো আছে। যদি সেখানে যেতে চায় তিনি চেষ্টা করতে পারেন।

বিজয় যেন স্বপ্ন দেখছে।

বলে সে—তাই করুন। ওখানের ইউনিভার্সিটিতে যেকোন সাবজেক্ট নিয়ে পড়তে চাই। ওখানে পড়াটা চালাতে পারবো। এখানে তা সম্ভব নয়।

হামিদ সাহেবও বোঝেন অবস্থাটা। বলেন।

—দেখছি আজই ফোনে কথা বলবো। তুমি পরশু দেখা করো।

বিজয় ওকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বের হয়ে এল।

লিভারপুলে যাবার চেষ্টাও করেছিল সে জার্মানী থেকে কিন্তু সফল হয় নি। আজ হামিদ সাহেবের সাহায্যে যদি তা সম্ভব হয় বিজয় ওর কাছে চির কৃতজ্ঞ থাকবে।

দুটো দিন ধৈর্য ধরে থাকতেই হবে।

প্রতিদিন তার জমানো টাকার অঙ্ক কমে আসছে। বিদেশ বিভূই জায়গা। ওই টাকার অঙ্ক কমছে আর ভয়ের মাত্রাও বাড়ছে। লিভারপুলে কিছু না হলে টাকা ফুরিয়ে যাবার আগেই তাকে এদেশের পাট তুলে দেশে ফিরতে হবে। জার্মানীতে মুখ নীচু করে ফিরে যাবেনা সে।

খবর পাবে মলয়—আশীষরা। সেনদাও শুনবেন।

বিজয় যেন হার মেনে ফিরে গেছে। সাথী—বৌদিদের কি বলবে সে। তারা তার দিকে চেয়ে আছে। ওদের নিরাশ করতে পারবেনা।

কিন্তু কোন পথই তার সামনে নেই।

মিসেস ম্যাক্সলেও খেতে বসে বিজয়কে আনমনা দেখে শুধোয়।

—কি হল তোমার? চুপ চাপ আছো ক'দিন? শরীর খারাপ?

বিজয় ওকে আসল সমস্যার কথা জানাতে পারেনা। বলে সে।

—না। তা নয়।

—তবে? দেশের জন্য মন খারাপ করছে?

বিজয় হাসল। বুড়ি যেন আসল সমস্যার কারণ খুজে পেয়েছে।

বলে সে—ওসব ঠিক হয়ে যাবে। মন দিয়ে পড়াশোনা করো।

বিজয়ের পড়াতেও মন বসে না।

দ্বদিন কাটিয়ে ছ্বটে গেছে লাইব্রেরীতে হামিদ সাহেবের কাছে। আজ তার ভাগ্য নির্ভর করছে ওর উপরই।

হামিদ সাহেব বলেন—ওখানে টেকনিক্যাল লাইব্রেরিয়ানশিপ কোর্সে সিট পাওয়া যেতে পারে। আর লিভারপ্বলে আমার বন্ধ্বর হোটেল আছে। সেখানে পার্টটাইম কাজের ব্যবস্থাও করেছি। যদি রাজী থাকো চলে যাও ওখানে। বন্ধ্বই থাকার ব্যবস্থাও করে দিতে পারবে ইণ্ডিয়ান ছেলেদের মেসে।

বিজয় যেন হাতে চাঁদ পেয়েছে। পড়াটা বিচিত্র কোর্সে, এখন অবশ্য তার সময় আছে।

আর সবচেয়ে বড় কথা লিভারপ্বলে সে কাজ পাবে থাকার আশ্রয় পাবে, আর বড় জায়গা, লণ্ডনের কাছাকাছি। স্বতরাং ওখানে পায়ের নীচে মাটি পেলে পরে বিজয় অন্য পথও দেখতে পারবে। তাই বলে হামিদসাহেবকে।

—অজস্র ধন্যবাদ আপনাকে। খুবই উপকার করলেন। ওদের বলে দিন আমি যাচ্ছি।

হামিদ সাহেবের চিঠিপত্র, ওর বন্ধ্বর ঠিকানা নিয়ে বের হয়ে এল বিজয়। আজ একটা কঠিন সমস্যার সমাধান হয়েছে।

মিসেস ম্যাক্কলেও শ্বনেছে কথাটা। বলে।

—কনগ্রাচ্বলেসন্ মাইবয়। লিভারপ্বল বিরাট জায়গা, ইউ উইল ফাইণ্ড গ্বড্লাক দেয়ার।

বিজয় ওয়েলস থেকে আসছে লিভারপ্বলে ?

ছোট ঘ্বমন্ত জনপদ প্যাণ্টিপ্যাডি থেকে বিজয় এবার লিভারপ্বলে এসে ইংল্যাণ্ডের জীবনের কর্মব্যস্ততার পরিচয় পেল। রাইডও ছিল ছোট জায়গা। ডুসেল ডর্ফ দেখেছে কয়েকবার মাত্র। তার ত্বলনায় লিভারপ্বল অনেক বড়।

চারিদিকে অনেক ছোট কারখানা, বড় বন্দর। বন্দরে দেশবিদেশের জাহাজ এসে ভেঁড়ে। পথেঘাটে সারা প্থিবীর মান্বষদের দেখা যায়। ভারতীয় নাবিক, চাটগাইয়া জাহাজীদেরও দেখেছে। ওদের টানা টানা বাংলা শ্বনে ভালো লাগে।

কতদিন পর বাংলা ভাষা শ্বনছে।

হামিদসাহেবের বন্ধ্বর বড় রেস্তারায় ওয়েটারের কাজও পেয়েছে। ক'দিনেই ধড়া চ্বড়া পরে বিজয় প্লেট হাতে খাবার সার্ভ করার, মায় দরকার মত কোমর ন্বইয়ে খারদারদের বাও করাও শিখে গেছে। অবশ্য একাজে তালিম দিয়ে দেয় তাকে রহিম্বদ্দি, শিলেটি বাঙ্গাল। খাস বাঙ্গাল ভাষায় বলে—শিখা লও মিঞা। কামে লাগবো।

'ক' আর 'খ' এর উচ্চারণ ওরা এমনি করে তাল গোল পাকিয়ে তোলে।

রহিম্বদ্দি বলে—হালায় ট্রিপস্ যা পাইবা সিধা পখেটে পোরবা। অপনার

খাটুনির পন্থা, ছাড়বা না।

বিজয়-এর ডিস্ ধোয়ার কাজ করাই ছিল আগে। জার্মানীতেই ওটা শিখেছে। এবার খাবারের অর্ডার নেওয়া খাবার সার্ভ করাটাও শিখে নিয়েছে এখানে।

রহিমও তার মতই একজন ছাত্র।

ইউনিভার্সিটিতে পড়ে আর পার্ট টাইম এই কাজ করে। ওদের হোটেলেই জায়গা পেয়েছে বিজয়। এর মধ্যে ইউনিভার্সিটিতেও ভর্তি হয়ে গেছে।

পড়াশোনাও শুরু করেছে।

ওয়ার্ল্ড ফ্রেন্ডশিপ হাউস-এর নামটা বিরাট, তার তুলনায় বাড়িটা ছোটই। বিশ্ববন্ধুত্বের বিরাট পরিবেশ না থাকলেও ছোট বাড়িটাতে ভারতবর্ষের অনেকেই আছে। বিশেষ করে দুচারজন ডাক্তার ইনঞ্জিনিয়ার অন্য পথের লোকও থাকে। কারণ কিছুটা সস্তায় থাকা যায়।

কোন চার্চ থেকে এর ব্যয় ভার কিছুটা বহনও করে।

হাউস এর কর্তা এখানে সস্ত্রীক থাকে। মিঃ মিসেস গডার্ডদেরও তাই নজর রয়েছে এর পরিচালনায়। আর আছে তাদের পালিতা কন্যা এ্যান এঞ্জাসন। মেয়েটি এখানেই অফিস সেক্রেটারীর কাজ করে।

গালে-ঠোঁটে রং লাগিয়ে এ্যানা অপিসে বসে তার স্বল্পবসন ঢাকা দেহটাকেই দেখাবার চেষ্টা করে।

রহিম বলে—হালায় মহা ত্যাদড়া, হুশিয়ার থাকবা বিজয় ওই ছেমড়ির থনে। অবশ্যি ওর নজর আমাগোর দিকে আইবো না।

—কেন? বিজয় শুধোয় ওকে।

রহিম বলে—ওর নজর দেহো নি ওই ছোকরা ডাক্তার-ইন্‌জিনিয়ার গোর দিকেই বেশী। ওদের একখানকে গাথোনোর ওর খুব সখ।

ও যারে তারে গাথঁবো না।

অর্থাৎ রহিম বোধ হয় চেষ্টা করেও যুৎ করতে পারে নি ওর কাছে। তাই যেন ক্ষোভের সঙ্গেই কথাটা বলেছে। বিজয় বলে।

—কেন? তুমি কি ঘা খেয়েছো?

রহিমের মুখে বেদনার ছায়া নামে। চেষ্টা সে করেছিল এ্যানার নজর কাড়তে। আর সেই চেষ্টা আজও চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ও তরফ থেকে কোন সাড়া যেন নেই। তবু থামেনি রহিম।

সেটা প্রকাশ না করে রহিম বলে।

—থোও ফ্যালাই যত তালি বালি কথা! এ মিঞা চাইলি আসমানের চাঁদ ধরাতি পারে। বোঝালানি।

বিজয় হাসছে।

কিছু ভারতীয় তরুণ ডাক্তার ওখানে থাকে। লিভারপুল ইউনিভার্সিটির চাইল্ড হেলথ, কিংবা ট্রপিক্যাল মেডিসিনে ছয় মাসের জন্য একটা ডিপ্লোমা কোর্স আছে। এটা অনেকেই করতে আসে, দেশে কদর বাড়ে। তাই কিছু ডাক্তারও থাকে এখানে।

এ্যানা এণ্ডারসন জীবনে তেমন কিছুই পায় নি। খুবই গরীবের ঘরের মেয়ে সে, এখান থেকে মাইল পঞ্চাশ দূরে কোন ছোট্ট গ্রামে হয়েছিল। জন্মাবার পরই মা মারা যায়, তার কিছুদিন পর মাতাল বাবাও ইহলোক ত্যাগ করে।

তখন গডার্ডসাহেব মিশনের কাজে ওই অঞ্চলে খুব ছিলেন, দয়াপরবশ হয়ে এ্যানাকে নিয়ে এসে নিজেরা বড় সড় করেছেন, তারপর চার্চের এই সেণ্টারেই কাজটা দিয়ে রেখেছেন।

চার্চের প্রতিষ্ঠান, এ্যানা প্রতি রবিবার সেজে গুজে তার যৌবন উছল দেহের কানায় বান ডাকিয়ে চার্চে যায়। সারমন শোনার ভানও করে।

কিন্তু তার মনের অতলের যৌবনের ঝড়ে সেই বানী কোন অমৃত সঞ্চার আনতে পারে নি। তার মনের কোণে বাসনা রয়ে গেছে সে কোন ডাক্তার ইনঞ্জিনিয়ারকে বিয়ে করবে।

অবশ্য এ্যানা এমনিতেই বেশ রসিকই।

কারণ অকারণে হাসিতে ফেটে পড়ে। অনেকের সঙ্গে দু একদিন সন্ধ্যায় উধাও হয়।

মিঃ গডার্ড গজ গজ করে।

কিন্তু অভিসারের প্রতি এ্যানার এই অদম্য বাসনাকে থামাতে পারে নি।

ডাঃ রমণ দক্ষিণ ভারতের ছেলে, সেণ্টারের একপ্রান্তে তেতলার ঘরে থাকে। ওদিকটা নিরিবিলি। পড়াশোনার পক্ষে ভালো, তাই রমণ ওদিকটাতে ঘর নিয়েছে।

বাসুদেবন্ এসেছে অন্ধ্র থেকে। কলকাতার নিশাকর ঘোষও আছে। যাদবপুরের ছাত্র, এখানে ইলেকট্রনিক্স নিয়ে পড়ছে।

—হ্যাল্লো! সুইটি! লিস্‌ন্!

এ্যানা ইদানীং নিশাকর ঘোষ এর সঙ্গেও ঘুরছে। নিশাকর ঘোষ বলে —ক্লাশ আছে এ্যানা। আজ সময় নেই।

এ্যানা নিজেই এসে নিশাকরকে আদর করে গাল টিপে দেয়।

— নটি বয়।

নিশাকর ঘোষ হাতে পয়সা থাকলে এ্যানাকে সিনেমাতেও নিয়ে যায়। এখন মাসের শেষ, পয়সার টান, তাই সরে গেল।

চুপ করে কি ভাবছে এ্যানা। আজকের সন্ধ্যার বেড়ানোর সঙ্গী কেউ নেই!
বিজয়কে দেখে ডাকে—হাই বিজয়! সন্ধ্যায় ফ্রি আছো?

বিজয় ওকে প্রথম থেকেই এড়িয়ে চলে। কলেজ থেকে ফিরছে বিজয়। ও কথায় বলে।

—সন্ধ্যায় তো কাজ!

এ্যানা হতাশ হয়ে শোনায়।

—ইউ পিপল, অলওয়েজ আফটার মানি।

বিজয় উঠে গেল নিজের ঘরে। দেখে, রহিম বেশ ফিট ফাট বেশবাস করে নামছে। আজ ওর অফ ডে। বিজয় বলে।

—কোথায় চল্লে?

রহিম শোনায়—একটু ঘুরে যাইয়া আইব।

ও নেমে গেল। জানলা দিয়ে একটু পরে দেখে এ্যানা আর রহিম দুজনে সেজে গুজে চলেছে শহরের পথে। রহিম যেন বহু চেষ্টার পর আজ ওকে হাতে আনতে পেরেছে।

ডাঃ রমন এদেশে এসেছে—ওখানে তাদের গোঁড়া—বদ্ধ পরিবেশ থেকে হঠাৎ মুক্তির স্বাদ পেয়ে একটু মায়া বেড়ে গেছে। তবে হিসেবী ছোকরা।

এ্যানার নজরও পড়েছে তার দিকে। রমনও কাজের ফাঁকে এসে অপিসে বসে আড্ডা দেয় এ্যানার সঙ্গে। মেয়েটার চোখে কি এক স্বপ্ন।

রমন তাকে ত্রিবান্দ্রামের বীচ—ঝাউবন-এর কথা বলে। নারকেল গাছ-এর সারি, কোথায় তাদের গ্রাম। এ্যানা লিভারপুল-এর এই ধোঁয়া কুয়াশার রাজ্য থেকে দূর রৌদ্রকিরনোজ্জ্বল একটি জগতের স্বপ্ন দেখে। অনেক ক্রীশ্চানও আছে সেখানে।

ডাঃ রমনের নিজের গাড়ি—বাংলো আছে। এখনও সেখানে কেউ আসেনি।

—রিয়েলি? এ্যানা যেন স্বপ্ন দেখছে।

ডাঃ রমন বলে—কাল যাবে উইক এণ্ড ব্রাইটন-এর ওদিকে।

এ্যানা খুশি হয়। বলে সে—ও রিয়েলি, ইউ আর এ জেম রমন! ব্রাইটন না—তোমার তিরবানডাম্ ইজ ভেরি গুড প্লেস! সানি—বিউটিফুল—আই লাইক টু গো দেয়ার!

রমণ-এর হাতখানা অকারণে চঞ্চল হয়ে ওঠে।

ওর নধর নিটোল নরম দেহটাকে কাছে টেনে নেয়। বলে সে।

—যাবে এ্যানা। মাই ডার্লিং!

এ্যানার কি আবেশে দু'চোখ বুজে আসে। বলে সে।

—আই ড্রিম মাই ডিয়ার!

ইদানীং ওরা যেন একটু বেশী জড়িয়ে পড়েছে।

বাসুদেবন—নিশাকর ঘোষ, রহিম—একতলায় ব্রজগোপালরা বলে।

—এ্যানাটা মহা পাজি মেয়ে।

এর কিছুদিন পরই খবরটা হঠাৎ হাওয়ায় ভেসে আসে। মিঃ গডার্ড, মিসেস গডার্ড-এর ঘর থেকে চীৎকার, তর্জন গর্জনে-র শব্দ ওঠে। এ্যানাকে ধমকাচ্ছে তারা।

—ইউ ডার্টি সোয়াইন। পিগ্‌! তখনই জানতাম এমনি একটা সর্বনাশা কাণ্ড তুমি ঘটাবে। দূর করে দোব তোকে। ইউ বিচ্‌!

মিসেস গডার্ড তবু ব্যাপারটাকে চাপা দিতে চেষ্টা করে।

বলে এ্যানাকে—যা হয়ে গেছে তার চারা নেই। এখন ওটাকে মুক্ত করে আয় হাসপাতালে। আবার ভালো করে বাঁচার চেষ্টা কর।

মিঃ গডার্ড তবু থামে না। সে চীৎকার করে শুধোয় এ্যানাকে।

—হু ইজ দ্যাট রাস্কেল। টেল মি!

কুমারী এ্যানা মা হতে চলেছে।

সারা হোমের মেম্বারদের মধ্যে সাড়া পড়ে যায়। অনেকেরই মুখ শুকিয়ে গেছে। এমনি সর্বনাশা বিপদে পড়বে এ্যানা এমন জানলে কেউ ওরা তার সঙ্গে মিশতো না।

রহিম বলে বিজয়কে—আল্লার নাম কইরা খইছি আমি ওসবে নাই! ছুড়িটা মহা ইতর।

নিশাকর ঘোষ বিজয়কে বলে।

—তুমিতো জানো বিজয়, ওসব ব্যাপারে আমি থাকি না। ও ছুড়িটা কোথায় কি বাধিয়ে এবার কাকে ফাঁসাবে কে জানে! কি চীজ মাইরি।

বাসুদেবনও নিশাকরকেই বলে।

—ইউ বিলিভ মি নিশাকর। আই নো নাথিং!

ওদিকে এ্যানা মুখ খোলেনি। সে জানে আসল অপরাধী কে। তার নিজের লোভেই এ্যানা তার নিজের সর্বনাশ ডেকে এনেছে। সে স্বপ্ন দেখেছিল নারকেল কুঞ্জ ঘেরা সূর্যকরোজ্জ্বল কোন এক দেশের। সেখানেই ঘরের স্বপ্ন দেখেছিল, রমণ আর সে।

ডাঃ রমন কোন মতে ব্যাপারটা আঁচ পেয়েই দিন সাতেক আগেই এ দেশ থেকে চলে গেছে গোপনে।

খবরটা পায় এ্যানা, তখন দেরী হয়ে গেছে।

মিঃ গডার্ডও অনেককেই সন্দেহ করেছিল, খবরটা শুনে বলে।

—নাও ইউ ফিল দি কনসিকয়েন্স।

তারজন্য এ্যানাও মনে মনে তৈরী হয়েছে। যে আসছে সে কোন দোষ করেনি। এ্যানা তাকে শেষ করতে পারবে না। নিজের ভুলের বোঝা সে নিজেই বইবে।

তারজন্য যা দাম দিতে হয় দেবে।

খবরটা শুনে এবার নিশাকর—রহিম—বাসুদেবনদের এ্যানার প্রতি শ্রদ্ধা বেড়ে যায়। ওদের যে কাউকে সে বিপদে ফেলতে পারতো, কিন্তু এ্যানা তা করেনি।

বরং নিজেই সব কলঙ্কের বোঝা—দায় দায়িত্ব মাথায় তুলে নিয়েছে।

রহিম বলে—হঃ ছেমড়িটা ভালোই। ওরে মজাইছে ওই হালায় রমনডা। কনে গেল ফাগুর পুত, ধরতি পারলি বাবা বলাই ছাড়তাম।

বাসুদেবনও ভস্মালোপিত কপাল কুঁচকে বলে।

—রাইট অ'

নিশাকর ঘোষ বলে বিজয়কে।

—দেখলে তো বিজয়! ওসব কাঁচা কাজে আমি নাই ভায়া। উঃ যা ভাবনাতে ফেলেছিল মেয়েটা।

বিজয়ও ভাবছে এ্যানার কথাই।

হোমের চাকরী, গডার্ড-এর আশ্রয়ও চলে গেছে। কোথায় কোন একটা ছোট্ট বাড়িতে দূর সম্পর্কের কোন আত্মীয়ের দয়ায় আছে। তবে এখানের সরকার এসময় সাহায্য করে, সেই সামান্য সাহায্য সম্বল করেই মেয়েটি তার সন্তানকে বাঁচাতে চায়।

আর ধূর্ত একটা পুরুষ ওকে ভুলিয়ে—এ্যানার সর্বনাশ করে বিদেশী ডিগ্রি নিয়ে দেশে ফিরে গিয়ে জমিয়ে প্রাকটিস করে সমাজের মধ্যমণি হয়ে উঠবে।

আরও লজ্জা লাগে কথাটা ভাবতে—ওই রমণ একজন ভারতীয়। বিজয় চুপ করেই থাকে

বাড়ির চিঠি এসেছে। খবর মোটামুটি ভালো। বৌদিও চিঠি দিয়েছে। পি এইচ ডি করে সে এখনও অধ্যাপনা করছে। তবে এবার কলকাতার কোন বড় কলেজেই আসছে।

সাথীর চিঠি অনেকদিন পায়নি। মাঝে মাঝে মনে পড়ে তার কথা।

লিভারপুলে থেকেও লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে চেষ্টা করছিল সে। তখন চান্স পায় নি।

এবার ওখান থেকে চিঠিখানা এসেছে। ওরা তাকে চান্স দিতে পারে ওই সময়ে।

বিজয়ের মন অহরহ যেন কিসের সন্ধানে ব্যস্ত। এক জায়গায় সে স্থির হয়ে থাকতে পারেনা। কোন গ্রহ যেন তাকে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে এখান থেকে সেখানে।

লণ্ডনই যাবে সে। বৃহত্তম শহর। এককালে ভারতীয়দের কাছে লণ্ডন

ছিল স্বপ্ননগরী। এক মহান সভ্যতার পীঠস্থান।

আজও সেই স্বপ্ন যেন রয়ে গেছে।

রহিমও খবরটা শুনে বলে।

—হালায় জব্বর মারছস বিজয়। লণ্ডনে যাইয়া পড়াশোনাও হইব মেলায় চান্সও মিলবো। চইলা যা। আমি হালায় তো মাথা খুঁড়তাছি তবু লণ্ডনে চান্স পাইলাম না।

বিজয় এখানে কিছু পয়সাও জমিয়েছে হোটেলে কাজ করে। বলে সে—কিন্তু ওখানে তো খুব বেশী খরচ, কাজকর্মও হুট করে পাবে কিনা জানিনা। শেষে বিপদে পড়বো না তো?

নিশাকর ঘোষ অনেক খবর রাখে। কলকাতাইয়া মাল, ঘাঁত ঘোঁত জেনে এসেছে। বলে সে।

—নশা সেনের ডেরায় চলে যাবে। খুব ভালো লোক, সস্তায় থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা হবে, ওর অনেক জানাশোনা আছে একটা কাজও পেয়ে যাবে।

—নশা সেন! বিজয় নামটা শুধোয়।

নিশাকর কিছু বলার আগে রহিম বলে।

—শুনছি। দারুণ মজবুত ডেরা। যাও চইলা। সব ব্যবস্থা হইয়া যাবো। কর্ত্তা গিন্নী দুজনেই খুব ভালো লোক।

নিশাকর ঘোষই ঠিকানাটা দেয় বিজয়কে। বিজয় যাবার আয়োজন করছে। এমনি দিনে খবরটা আসে।

রহিমই জেনে এসেছে হাসপাতালে এ্যানার একটা বাচ্চা হয়েছে।

ব্যাটা ছেলে। এ্যানা খুব খুশী হবে ওরা দেখতে গেলে।

নিশাকর বেশ সাবধানী লোক। এক আধটু জড়িয়ে ছিল এ্যানার সঙ্গে, খুব বেঁচে গেছে। পুনরায় আর জড়াতে চায় না।

তাই বলে—ছাড়ো তো ওসব কথা। ন্যাষ্টি!

তবু যাবার আগে বিজয় গেছল কিছু ফুল নিয়ে এ্যানাকে শুভেচ্ছা জানাতে।

এ্যানা ভাবতে পারে নি যে বিজয় আসবে।

এই তরুণটিকে দেখেছিল সে হোমে, শান্ত নম্র। নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। কোন দিনই তার দিকে চায় নি। এ্যানা বলে।

—বিজয়! তুমি এসেছো? আই এ্যাম সো গ্লাড। আর কেউ আসেনি জানো!

বিজয় ওকে চোখের জল ফেলতে দেখে বলে।

—ওসব কথা ভুলে যাও এ্যানা। আমি তোমার সাহস, প্রেম—মাতৃত্বকে শ্রদ্ধা করি তাই এসেছি। একজন পশুর মত ব্যবহার করে গেছে যে তোমার সঙ্গে,

সে আমার দেশের লোক। তার জন্য আমিও লজ্জিত এ্যানা।

এ্যানা দেখছে ওকে।

বড় কঠিন সংগ্রামমুখর এ জীবন। তবু বিজয়ের ওই স্বীকৃতি আজ তার মনে কি সাহস এনেছে। বলে এ্যানা।

—থ্যাংক ইউ বিজয়! সো কাইন্ড অব ইউ।

বিজয় বের হয়ে এল এ্যানার কাছ থেকে। অসহায় মেয়েটির আজ হোমের আশ্রয় নেই, চাকরী নেই। চ্যারিটির উপরই নির্ভর করে আছে। তবু সেই রমণের প্রতি তার কোন ক্ষোভ নেই, আজ মা হয়ে সে নিজের সন্তানকে কেন্দ্র করে বাঁচতে চায়।

জীবনের এই বিচিত্র প্রকাশ মেয়েদের মধ্যেই সম্ভব।

আজ বৌদি—সাথীদের যেন নোতুন করে মনে পড়ে। সাথীর ভালোবাসা তাকে আজও ভরিয়ে রেখেছে।

মেয়েদের তাই সে শ্রদ্ধা করে। ওই এ্যানা এন্ডারসনকেও। লিজার কথা মনে পড়ে। জার্মানীর কোন নির্জনে আজ সেও হারিয়ে গেছে।

দক্ষিণ কলকাতার কোন বনেদী বংশের ছেলে নশা সেন লন্ডনে ডাক্তারি পড়তে এসেছিলেন। তখন ব্রিটিশের আমল। লন্ডনে ডাক্তারি পড়ার যোগ্যতাও দরকার, টাকারও।

নশা সেনের ওসব ছিল। তাই এদেশে এসে ডাক্তারি পড়া শেষ করে দেশে ফিরে গেছল দেশের মানুষের জন্য কিছু করার মন নিয়ে। দেশের গণ্ডীর মধ্যে থেকে, তার প্রাত্যহিক ছোট খাটো ব্যাপার গুলোর মধ্যে জড়িয়ে পড়ে ঠিকমত দেশকে চেনা যায় না।

সেটা হয় দেশের বাইরে এলে।

তখন দেশের মানুষের ছোট খাটো ভুল স্বার্থগুলোকে নিরপেক্ষ ভাবে দেখে বিচার করা যায়। বাইরের দেশের প্রাচুর্য—নিশ্চিত জীবনযাত্রার বহর দেখে দেশের মানুষের সেই অভাবের জন্য দুঃখই আসে। কিছু করার কথাটা মনে হয়।

নশা সেন দেশের বাইরে এসে বিলাতের তখনকার জীবনমান দেখে সেই কথাটাই ভেবেছিল। ডাক্তার হয়েও সেই মন নিয়েই নশা সেন দেশে ফিরেছিল।

কিন্তু ক'বছরে তাদের পরিবারের মধ্যেও কিছু বিপর্যয় ঘটে গেছে। বাবাও বেঁচে নেই। পরিবারের কর্তা এখন বড়দাদা, আর সংসারের কতৃত্ব মার হাতে নেই। ওটা স্বাভাবিক নিয়মেই বড়বৌদির হাতে চলে গিয়েছে। সুতরাং সংসারের আগেকার সেই শান্তির পূর্ণতা সেখানে নেই।

দীর্ঘদিন পরিবারের মধ্যে না থাকার ফলে নশা সেন যেন আজ তাদের কাছে

অপরিচিত হয়ে উঠেছে।

নশা সেন ডাক্তারি পাশ করে নোতুন মন নিয়ে দেশে ফিরে গেছে। ভালো কাজই পায়। আর বাকী সময় চেম্বারে গরীব রোগীদের বিনা পয়সায় দেখে, ওষুধ পত্রও দেয়। ফলে তার নিজের রোজকার কমে যায়, বাড়ি থেকেও টাকা নিতে হয়। ফলে বড়দা—বৌদি খুব খুশী নন। মনে মনে অখুশী হলেও মুখে কিছু বলতে পারে না।

নশা সেন তখন নিজেই ছোট একটা হাসপাতাল খোলার প্ল্যান করে। তাদেরই জায়গাও আছে। বাড়ি তৈরীর টাকা কিছু চাঁদা থেকে আসবে, বাকীটা নিজেই দেবে। পরিকল্পনাও ঠিক।

কিন্তু বাদ সাধলো তার দাদা।

তিনি বলেন—সম্পত্তি তোমার একার নয়। আমারও। এভাবে বিলিয়ে দিতে পারবো না। আর টাকা এর আগে অনেক নিয়েছো। আর তোমার টাকাও তেমন নেই।

দাদা একটা স্টেটমেণ্টও তৈরী করে রেখেছিল, সেটা বের করে প্রমাণ করে দেয় যে নশা সেনের আর তেমন কিছুই নেই। ওদিকে হাসপাতালের পরিকল্পনা হয়ে গেছে। খবরের কাগজেও বের হয়েছে খবরটা।

নশা সেন বিপদে পড়ে।

তবু বলে—টাকা না দাও, জায়গাটা দাও। আমি কথা দিয়েছি ওদের।

দাদা অটল। তিনি বলেন।

—যে কথার কোন দাম থাকবে না, সে কথা দাও কেন?

বিদেশে থেকে নশা সেন কথার খেলাপ করার অমর্য্যাদাকে চেনে। তাই আজ সবচেয়ে বেশী অপমানিত বোধ করে। তবু অনুনয় করেই বলে কথাটা। কিন্তু দাদার মন টলে না। সে বলে—করতে হয় নিজের চেষ্টাতেই করো কিছু।

নশা সেন অসহায় রাগে স্তব্ধ হয়ে যায়। আজ দাদার জন্য সে দেশের লোকের কাছে অপদস্থ হবে। এই অপমান দুঃখ তারও অপরিসীম।

নশা সেন বলে।

—ঠিক আছে। তাই হবে। তোমার বিষয় আশয় সবই থাক, আমি বিলেতেই ফিরে যাবো, যেভাবে হোক পয়সা রোজকার করে পারি তবে একদিন দেশে ফিরে কিছু করবো।

দাদা খুশীই হয়। নশা চলে গেলে তার সব সম্পদের মালিক হবে সেই ই।

নশা সেনের মানসিক অবস্থাটা কিছু বুঝতে পারে তার বাল্যবন্ধু মিঃ সরকার। মিঃ সরকারের কলকাতায় পাকা ব্যবসাপত্র আছে। নামকরা লোক। খেলাধুলাতে উৎসাহ দেন। নিজে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের নামকরা পৃষ্ঠপোষক। উদারমনা মানুষটির কাছে একটা কথা বার বার মনে হয়েছিল।

নানা কাজে সে বিলাতে গেছে কয়েকবার। সেখানে বাঙ্গালী, এমনকি ভারতীয় ছাত্রদের থাকার জায়গার অভাবটা দেখেছেন, এদেশের ছেলেদের সেখানে গিয়ে কোন ল্যান্ডলেডির বাড়িতে মুখবুজে থাকতে হয় বেশী পয়সা দিয়ে তাদের দয়ায়।

মিঃ সরকার-এর ইচ্ছাটা অনেকদিন থেকেই মনে মনে ছিল, এটাকে কাজে পরিণত করানোর মত যোগ্য লোককে পান নি। নশা সেন সেদিন তার বাড়িতে এসেছে বিদায় নিতে। এ দেশ থেকে চলে যাচ্ছে সে বিলেতে।

এখানে তার কাজ করা হল না, ওদেশে গিয়ে কিছু রোজকার করে ফিরে আসবে, তখন নিজের সামর্থে দেশের মানুষের জন্য কিছু করবে। এখন হল না।

মিঃ সরকার ওকে ফিরে যেতে দেখে বলে।

—তাহলে লন্ডনে দেশের ছেলেদের জন্য কিছু করো।

ওর পরিকল্পনার কথাটা শোনাতে নশা সেনেরও ভালো লাগে। ওদেশে গিয়ে সেও থাকার ভালো জায়গা পায় নি। এটা হলে এ দেশের ছেলেদের জন্য সত্যিকার কিছু করা হবে।

মিঃ সরকার বলে—আমি কিছু টাকা আমাদের ট্রাস্ট থেকে দিচ্ছি। ওই দিয়ে লন্ডনে একটা বাড়ি কিনে ভারতীয় ছেলেদের জন্য একটা আস্তানা গড়ো। ওদের পয়সাতেই আর একটা বাড়ি কেনো। দুটো আস্তানা হবে।

প্রস্তাবটা ভালো লাগে নশা সেনের।

তবু কিছু করা যাবে। মিঃ সরকারের টাকায় নশা সেন লন্ডনে এসে খোঁজ খবর নিয়ে লন্ডন নর্থ ওয়েস্ট তিন এলাকায় তেতাল্লিশ নাম্বার এ্যানসন রোডে একটা তিনতলা বাড়ির সন্ধান পেয়ে সেইটাই কিনে নিয়ে ভারতীয় ছাত্রাবাস বানালেন। লন্ডনে এই প্রথম ভারতীয় ছাত্রদের ন্যায্য দামে থাকা-খাওয়া একটা আস্তানা হল। একটা করে ছোট ঘর লাগোয়া বাথরুম। গরম ঠান্ডা জল, শীতকালে ঘর গরম করার ব্যবস্থা সবই করলেন নশা সেন। নিজেও প্রাকটিশ শুরু করলেন আর বাকী সময় এই দেশ থেকে আগত তরুণদের মাঝে কাটিয়ে নশা সেন নিজেকেও ভুলিয়ে রাখলেন।

তখন মহাযুদ্ধের আগের দিন। ইংরেজরা তখন ভারতে দন্ড মুন্ডের কর্তা। ভারতীয় ছাত্রদের ভিড় বাড়তে সুরু হল, একটা বাড়িতে ঠাঁই হয় না। তখন নশা সেন তার পাশেই পয়তাল্লিশ নাম্বার বাড়িটাও কিনে নিয়ে বেশ জমিয়ে ছাত্রাবাস চালাতে সুরু করলেন। ভারতীয় ছাত্রমহলে নশা সেনের ডেরা নামটা সুপরিচিত হয়ে উঠলো। দু'দশ জন বিদেশী ছাত্র-ছাত্রীও আশ্রয় পায়।

হঠাৎ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল ইউরোপে।

সারা লন্ডনের চেহারাই বদলে গেছে। বহু ছাত্র-ছাত্রী আটকে পড়েছে। এলিজাবেথ ছিল জার্মানীর মেয়ে। অনেক জার্মানকে প্রিজনার অব ওয়ার করা

হোল, অনেকে কোন পথ দিয়ে ডোভার পার হয়ে পালাবার চেষ্টাও করলো।

এলিজাবেথ-এর সেই সাহস নেই।

ভয়ে শিউরে উঠেছে বেচারা। ওকে ব্রিটিশ এবার ধরে নিয়ে যাবে, প্রিজনার অব ওয়ার করে কোন ক্যাম্পের বিশ্রী পরিবেশে কতদিন বন্দী করে রাখবে কে জানে। ভাবতেও পারে না মেয়েটি।

বিদেশে এসে আজ দারুণ বিপদে পড়েছে সে।

নশা সেনও জানে ব্যাপারটা। শান্ত নম্র-মেয়েটিকে দেখেছে এক মনে নিজের পড়া করতে। কোন হৈ চৈও করে না।

তাকে যেতে হবে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের জীবনে।

বাঁচাবার পথ একটা আছে। কোন ব্রিটিশ নাগরিক যদি ওই জার্মান মেয়ে এলিজাবেথকে বিয়ে করে তবেই সে প্রিজনার অব ওয়ার না হয়েও ব্রিটিশের স্ত্রী হয়ে মুক্ত ভাবে থাকতে পারবে।

নশা সেন দু একজনকে বলেছে কথাটা।

তারাও অবাক হয়—বিয়ে করতে হবে! একটু ভাবতে দিন সেনদা।

এর জন্য তৈরী হয়ে আসিনি।

বিয়ে করতে সহজে কেউ চায় না, বিশেষভাবে এমনি ক্ষেত্রে। উটকো ফুর্তি করতে পেলে অবশ্য অনেকেই রাজী। তা যে কোন সময়েই হোক না কেন।

নশা সেন মেয়েটির জন্য ভাবনায় পড়ে।

ওদিকে সময়ও তার হাতে নেই।

নির্দিষ্ট দিনের পর পুলিশ এসে এলিজাবেথকে ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে পুরবে।

এলিজাবেথের সুন্দর মুখটা অজানা ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেছে। ওর চোখে জল নামে। নশা সেনকে কাতর আবেদন জানায় সে।

—কোন রকমে বাঁচাও মিঃ সেন। না হলে আমি মরে যাবো।

নশা সেনও পথ পায় না কিছু। অনেককেই কাতর অনুরোধ করেছে সে, কিন্তু সকলেই তাকে ফিরিয়ে দিয়েছে। নশা সেনের সামনে কোন পথ নেই। একটা অসহায় মেয়েকে সে বাঁচাতে পারবে না কোন মতে, ওকে বন্দী দশাতেই জীবন কাটাতে হবে, কি পরিণতি হবে কে জানে!

এলিজাবেথের দু'চোখে জল। বলে সে।

—তাহলে নিজেকেই মেরে ফেলা ছাড়া আর পথ নেই নশা। ওভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে আমি যে ভাবে হোক নিজেকেই শেষ করবো। নো আদার ওয়ে।

চমকে ওঠে নশা সেন।

এলিজাবেথ বলে—কালই শেষ দিন। ওরা সন্ধ্যায় এসে আমাকে নিয়ে যাবে। তার আগেই দে উইল টেক মাই ডেডবডি। ইউ সি। ওভাবে বাঁচতে আমি

পারবো না। জানি এই শীতে ক্যাম্পের জীবন কত নিষ্ঠুর। গড সেফ মিঃ!

আজ এলিজাবেথের সামনে কোন পথই নেই বাঁচার। কেউ তাকে দয়া করেও উদ্ধার করবে না। তার নিজের মুক্তির পথ তাকেই দেখে নিতে হবে।

নশা সেনও ভেবেছে কথাটা।

ওই অসহায় মেয়েটির চোখের জল তাকে ভাবিত করে তুলেছে।

এ যেন নিপীড়িত কোন মানুষের বুক ফাটা কান্না। বাঁচার প্রয়াস।

নশা সেন আজ হঠাৎ যেন পথ পায়।

সে-ই পারে এলিজাবেথকে বাঁচাতে। সে নিজে ব্রিটিশ নাগরিক, সে যদি ওকে বিয়ে করে তার স্ত্রী হয়ে এলিজাবেথ ব্রিটিশ নাগরিকত্ব লাভ করবে।

তখন আর এ প্রশ্ন থাকবে না।

মেয়েটাকে বাঁচাতে পারবে সে।

রাত্রি নেমেছে।

এলিজাবেথের জীবনে বোধ হয় এই শেষ রাত্রি। আজই এলিজাবেথ নিজেকে শেষ করবে।

তার মনে পড়ে জার্মানীর কথা। ছোট সবুজ জনপদে আবার যুদ্ধের ছায়া নেমেছে। ঘরে ফেরার পথ তার হারিয়ে গেছে।

লণ্ডন সহরেও নেমেছে অমারাত্রির অন্ধকার। সব আলো নিভিয়ে মহানগরী রুদ্ধশ্বাসে কোন শত্রু বাহিনীর বিমান আক্রমণের প্রতীক্ষা করছে। এলিজাবেথও প্রতীক্ষা করছে নিশ্চিত মৃত্যুর।

হঠাৎ দরজায় টোকার শব্দ শুনে চমকে ওঠে এলিজাবেথ। হয়তো পুলিশই এসেছে তাকে ধরে নিয়ে যেতে। দরজাটা খুলে নশা সেনকে দেখে চাইল।

—তুমি!

নশা সেন বলে—একটা পথ পেয়েছি এলিজাবেথ। অবশ্য তুমি যদি রাজী থাকো।

এলিজাবেথ চাইল ওর দিকে।

নশা সেন বলে—যদি তুমি রাজী থাকো আমিই বিয়ে করতে পারি তোমাকে। আমি ব্রিটিশ নাগরিক—

এলিজাবেথ চমকে ওঠে। ওর চোখের সামনে বাঁচার আশ্বাস এনেছে নশা সেন। আবার বাঁচবে সে। সব আঁধার যেন মুছে গিয়ে আবার আলো ফুটে উঠেছে।

এলিজাবেথ বলে—তুমি! তুমি আমাকে বাঁচাবে সেন?

নশা সেন বলে।

—হ্যাঁ। তবে একটি সর্তে। রাজী?

এলিজাবেথ বলে ব্যাকুল ভাবে।

—কি সে সর্ত বলো। আমাকে বাঁচাবার জন্য তুমি এত করেছো, তোমার সর্তও আমি মানবো নশা, ঈশ্বরের নামে বলছি আমি তা মানবো।

নশা সেন বলে।

—বিয়ে তোমাকে আইন মতেই করবো, কিন্তু এটা একটা পরিচয় মাত্র, এর বেশী এই সম্পর্ক নিয়ে আমাদের কারোও কোন দাবী থাকবে না।

স্বামী স্ত্রীর পরিচয়েই থাকবো আমরা।

চমকে ওঠে এলিজাবেথ। তার কুমারী মনে বিয়েকে ঘিরে অনেক স্বপ্নই দেখেছিল।

কিন্তু নশা সেনের কথায় হতাশই হয় সে।

নশা সেন বলে।

—আমারও কোন দাবী থাকবে না। যুদ্ধের পর আবার সব কিছু যেদিন স্বাভাবিক হবে, সেদিন ইচ্ছা করলে এই পরিচয় মুছে দিয়ে তুমি নিজের দেশে ফিরে যেতে পারবে। এখানেই অন্যত্র ঘর বাঁধতে চাও, তাতেও বাধা দেব না।

ওর কোন দাবী নেই। এলিজাবেথকে বাঁচাবার জন্য আজ নশা সেন এগিয়ে এসেছে। এলিজাবেথ ওর কাছে অশেষ কৃতজ্ঞ।

বলে এলিজাবেথ—তাই হবে নশা। তোমার সব শর্তই আমি মেনে চলবো। তোমার কাছে আমি ঋণী, অশেষ ঋণী।

এলিজাবেথ আবার কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে।

পরদিনই ওখানের চার্চে ওদের বিয়ে হয়েছিল। এলিজাবেথ হয়ে গেল মিসেস নশা সেন, এলিজাবেথ সেন।

সে আজ বেশ কয়েক বছর আগেকার কথা।

তারপর যুদ্ধ থেমে গেছে। বহু রক্তাক্ত ইতিহাস পিছনে ফেলে, সেই পথ ধরে জার্মানীর যুদ্ধ মুক্ত প্রান্তর পার হয়ে ডোভার পেরিয়ে ওয়েলস, লিভারপুল হয়ে বিজয় এসে পৌছেছে এই পঁয়তাল্লিশ নাম্বার এ্যানসন রোডের বাড়িতে।

নশা সেনের তখন বয়স হয়ে গেছে।

মাথায় একরাশ রুপালী চুল, দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ। বৃদ্ধ নশা সেন তখন দুটো ছাত্রাবাস সামলাতে ব্যস্ত। ওদিকে কিচেন—ডাইনিং হল, অতবড় দুটো বাড়ির নানা বোর্ডারদের নানা ঝামেলা, এলিজাবেথ সেনও এই কাজে স্বামীর সঙ্গে রয়ে গেছে।

সে তার সর্ত আজও মেনে চলেছে।

মিঃ সেন থাকেন তিনতলার একটা ঘরে খুবই সাধারণ ভাবে, আর মিসেস এলিজাবেথ সেন থাকেন অন্য বাড়ির এলাকার একটা ঘরে।

যুদ্ধ থেমে যাবার পর অবশ্য নশা সেন বলেছিল।

—আর বন্দী হয়ে এভাবে থাকার প্রয়োজন নাই।এলিজাবেথ, তুমি ইচ্ছা

করলে জার্মানীতে ফিরে যেতে পারো।

এলিজাবেথ ওই সদাশিব মানুষটির কাছে কৃতজ্ঞ।

বলে সে—আমি কি তোমার কোন সর্ত ভঙ্গ করেছি নশা? করিনি তো?

নশা সেনও সেটা জানে।

বরং এলিজাবেথ-এর এই হোম গড়ে তোলার কাজে অকুণ্ঠ পরিশ্রম, সেবাকে ও দেখেছে। সেও ভারতীয় ছাত্রদের কাছে মাতৃসমা হয়ে-উঠেছে। নশা সেন তার সুষ্ঠ পরিচালনায় খুশী।

এলিজাবেথ বলে—তবে কেন আমায় চলে যেতে বলছো? এদের নিয়ে এদের মাঝে বাকী জীবনটাও কাটাতে দাও নশা, এর বেশী আর কোন কিছু তোমার কাছে চাইব না। কোনদিনই।

নশা সেন এর পর আর কিছু বলে নি।

এলিজাবেথও রয়ে গেছে এই ছেলেদের সেবা নিয়ে।

কত ছেলে এসেছে, ব্যারিস্টারি—ডাক্তারি—ইন্‌জিনিয়ারিং পাশ করেছে। চলে গেছে। কেউ কেউ দেশে গিয়ে চিঠি দিয়েছে। ক্রমশঃ ভুলে গেছে।

আবার এসেছে অ্যানাসন রোডের বাড়িতে নোতুন ছাত্রের দল। বিজয়ও এসে এলিজাবেথ সেনকে চিনে ফেলেছে।

মিসেস সেনেরও বয়স হয়ে আসছে। ওর নজর সব দিকে।

বিজয়কে বের হতে দেখে বলে মিসেস সেন।

—ইউ লুক স্যাবি বিজয়। চেঞ্জ ইয়োর সুউট। বাইরে বের হবে স্মার্ট হয়ে।

বিজয় চাইল ওর দিকে। মিসেস সেন বলে।

—ইউ নো জ্যোতি! দ্যাট ব্যারিষ্টার বয়। ইয়েস জ্যোতি বসু।

বিজয় ইদানীং তার নামও শুনেছে। দেশে থাকতে ও দেখেছে খবরের কাগজে তার নাম, দেশের শ্রদ্ধেয় নেতাদের তিনি অন্যতম।

মিসেস সেন বলে হাসতে হাসতে।

—জ্যোতিকেও একদিন আমি তোমার মতই ধমকে ছিলাম। দ্যাট জ্যোতি, সিদ্ধার্থরে—সবাই এখানে থেকেই পড়াশোনা করেছে।

বিজয় অবাক হয়। মিসেস সেন বলেন।

—জ্যোতিও ওর পোষাক সম্বন্ধে খুবই কেয়ারলেশ ছিল।

ওকে বলেও পারিনি। ও এখানে থাকতেই রজনী পাম দত্তের কাছে কম্যুনিজমের পাঠ নিচ্ছিল। ও বলতো কম্যুনিষ্টদের নাকি ভালো পোষাক 'পরতে নেই। আমিও ছাড়বো না। আটকে রাখলাম, পোষাক বদলে তবে ক্লাশে যাবে। ব্যাস, দেরীই হয়ে গেল, সেদিন কলেজেই যাওয়া হ'ল না বেচারার'। হাসছে মিসেস সেন।

বলেন—আর সিদ্ধার্থও ছিল ভেরি ব্রিলিয়ান্ট।

ওর ফাদার ইন ল ছিলেন নশা সেনের বন্ধু। নামকরা ডাক্তার। এখানেই সিদ্ধার্থকে দেখে নজরে ধরে যায়, ওর মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেন।

তাই বলছি বিজয়, এখানের উপর ভারতীয় সমাজের নজর আছে। ভালো, স্মার্ট-ব্রাইট বয় হলে চাইকি অর্দ্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যাও জুটে যেতে পারে। তাই বলছি একটু বুঝে সমঝে চলো, হিল্লে হয়ে যাবে।

মিঃ সেন সকালে একটু বেড়িয়ে আসেন।

বয়স হয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে এই বোঝা টেনে যেন তিনি আজ ক্লান্ত। মিঃ সরকার বাংলা মুলুকে কবে এই বোঝা তার ঘাড়ে চাপিয়েছিল, আজ তিনি নেই, কিন্তু নশা সেন এখনও সেই বোঝা বয়ে চলেছে।

ওদের দেখে চাইলেন মিঃ সেন।

বলেন—আবার ও বেচারার মাথাটাও খাচ্ছো এলিজাবেথ।

হাসেন মিসেস সেন। বলেন—না না বিজয় ইজ এ ভেরি গুডবয়। ওর ফিউচার প্রসপেক্টের কথা বলছিলাম।

মিঃ সেন চেয়ারে বসে বলেন।

—আর এমন ফিউচারে প্রসপেকেটর দরকার নেই। পড়াশোনা মন দিয়ে করো বিজয়। ইউ মাস্ট বি এ গ্রেট ম্যান। বড় হতে হবে, দেশের জন্য কিছু সৎ কাজ করতে হবে দেশে ফিরে গিয়ে।

বিজয় ঘড়ির দিকে চেয়ে বলে।

—এখন চলি মিঃ সেন, ক্লাশের দেরী হয়ে যাবে। তারপর চাকরী আছে। মিঃ সেনের খেয়াল হয়।

—হ্যাঁ। রাস অন! ওয়ার্ক ফাস্ট মাই বয়।

বিজয় এখানে পড়াশোনা করছে, কিন্তু যুদ্ধোত্তর ইংল্যান্ডের রূপটিকেও দেখেছে সে।

এতদিন ইংরাজ জাতি অর্দ্ধেক পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের উপর কর্তৃত্ব করেছে, সেই সব দেশ থেকে তাদের সম্পদ এনে নিজেদের দেশকে সমৃদ্ধ করেছে। গড়েছে, নিজেরাও সম্পদশালী হয়ে উঠেছে। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর অনেক দেশই স্বাধীন হয়েছে। ভারতবর্ষও বের হয়ে গেছে।

ফলে ইংল্যান্ডের সম্পদও এখন সীমিত হয়ে উঠেছে। কাতারে কাতারে এসেছে অন্যদেশের লোক। ফলে এখানের সীমিত আয়ে এবার টান পড়তে সুরু হবে।

এদের অগ্রগতি ব্যাহত হতে সুরু হয়েছে, আরও সমস্যা—অভাব—চাকরীর ক্ষেত্রে সমস্যাব ব্যাপারগুলো বাড়বে; তার তুলনায় আমেরিকা এখন সবচেয়ে সম্পদশালী দেশ।

ওদের প্রচুর জায়গা, লোক কম। অগ্রগতি হচ্ছে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে। কাজের অবকাশও প্রচুর। ভবিষ্যৎ গড়তে গেলে এদেশে নয়, ওদেশেই যেতে হবে।

এই কথাটা বার বার মনে হয়েছে বিজয়ের। পড়াশোনার অবসরে বিজয় আমেরিকার খবরও নিচ্ছে।

কলেজের পর চাকরী সেরে বিজয় যখন হোমে ফেরে তখন লণ্ডনের কুয়াশাচ্ছন্ন আকাশে রাত্রির অন্ধকার নেমেছে, কনকনে ঠাণ্ডা-আর কুয়াশাঢাকা পরিবেশ, ধোঁয়া কুয়াশা ছাপিয়ে নামে টিপটিপে বৃষ্টি।

শীতকালে এই বৃষ্টি তুষার হয়ে ঝরে।

পথঘাট ঢেকে যায়। সূর্যের আলোয় মুখ দেখা এখানে ভাগ্যের কথা। মানুষগুলো,, ঘর বাড়ি সব যেন অন্ধকারে হারিয়ে গেছে।

মিঃ সেন ফায়ার প্লেসের সামনে বসে ভাবেন তার অতীত জীবনের কথা। বহু আশাই ছিল তার মনে, একদিন কৃতি হয়ে দেশে ফিরবে। দেশের গরীব মানুষদের জন্য কিছু করবেন।

আজ দেখতে দেখতে বয়স হয়ে গেছে।

সে স্বপ্নই রয়ে গেছে। বিজয়ও এসে বসে এই সময়।

বিজয়ের যেন ওই মানুষটিকে ভালো লেগেছে। জেনেছে সে ওদের ইতিহাস। মিসেস সেনকে দেখে মনে পড়ে তার ফেলে আসা জার্মানীর কথা। লিজার কথা মনে পড়ে।

ওরা কেউ পিছন পানে টানেনা, এগিয়ে যেতে সাহায্যই করে। লিজা কেন সাথীর কথাও মনে পড়ে বার বার। তার দু'একখানা চিঠি পেয়েছে।

বৌদিও এখন কলকাতায় শিক্ষা—সমাজকল্যাণ বিভাগের পদস্থ কর্মচারী। ওরা সকলেই বিজয়কে যেন এগিয়ে দিয়েছে তার পথে।

মিঃ সেন বলেন—জীবনে অর্থ রোজকার করে দেশে ফিরে গিয়ে ওখানের মানুষদের জন্য কিছু করো বিজয়। নাহলে ওদেশের প্রতি ঋণ তোমার রয়েই যাবে। আমিও ভাবছি অনেক হয়েছে আর নয়।

এলিজাবেথ এখানের হোম-এর ভার নেবে, আমি দেশে ফিরে গিয়ে এবার তরাই অঞ্চলে বিরাট একটা ডেয়ারি ফার্ম করবো।

হিমালয়ের কোলে বনঢাকা ছায়াসবুজ তরাই অঞ্চলের কথা মনে পড়ে বিজয়েরও।

বিজয় বলে—ওখানে প্রচুর ঘাস, খড়-পাতাও মিলবে, আর জায়গা নাতি-শীতোষ্ণ। গরুরাও থাকতে পারবে ভালো। তরাই-এর কিছু অঞ্চলে আমিও গেছি।

কুচবিহার—আলিপুর দুয়ার মালজংশনের রেলের পথটা আজও ভোলেনি বিজয়। হঠাৎ যেন সেই ফেলে আসা কিশোর একটি হারানো জগতে ফিরে

গেছে।

মিঃ সেন-এর চোখে কুয়াসাচ্ছন্ন লণ্ডন ছাড়িয়ে আলো ঝলমল তরাই অঞ্চলের ছবিটা ফুটে ওঠে। তিনি খুশীভরে বিজয়ের সমর্থন পেয়ে বলেন।

—ঠিক বলেছো বিজয়। ওখানেই গিয়ে ফার্ম করবো। সস্তায় দুধ পাবে দেশের লোক। তুমিও জীবনে প্রচুর রোজগার যদি করো বিদেশে, বলবো দেশে ফিরে গিয়ে সে টাকা দিয়ে দেশের মানুষের জন্য কিছু করো বিজয়। এই আমার অনুরোধ।

দেখবে—ঠিক দেশে গিয়েই দেখা হবে।

বিজয়ও একদিন দেশে ফেরার স্বপ্ন দেখে ওই ভাবে। কবে তা সম্ভব হবে জানে না।

এলিজাবেথ সেনও অবসর সময়ে এসে বসেন এই ড্রইংরুমে। বিজয়ের এখানের পরীক্ষা হয়ে গেছে। পাশও করবে।

এবার ভাবছে তার ভালো চাকরীর কথা। তার সাবজেক্ট খুবই এ্যাডভান্স সাবজেক্ট।

ইংল্যাণ্ড থেকে এতে খুববেশী সুবিধা পাবে না।

মিঃ সেন বলেন—তাহলে কি করবে ঠিক করলে?

ভেবেছে বিজয় এনিয়ে। বলে সে।

—ভাবছি আমেরিকাতেই যাবো। নিউইয়র্কে দু'একজন পরিচিতকে লেখেছি। ওরা বলেছে—ওখানে গেলে কিছু ব্যবস্থা হয়ে যাবে। ভালো ফিল্ড ওখানে।

মিঃ সেন বলেন – তাই যাও বিজয়। মনে হয় ওরা ঠিকই বলেছে। তবে কথাটা মনে রেখো, বড় হলে দেশে ফিরে যাবে—সেখানে কিছু করতেই হবে। আমার অনুরোধ।

বিজয় ওই প্রবীন লোকটিকে বলে।

—আমিও তাই ভেবেছি সেনদা। আমি দেশে ফিরে যাবো—একটা কারখানাই তৈরী করবো! কিছু লোকের কাজ হবে।

—গুড! গড ব্লেশ ইউ মাই বয়। মিঃ সেন খুশী হন।

মিসেস সেন বলেন মিঃ সেনকে—ওঠো। তোমার শরীরটা ভালো নেই ক'দিন। রাত্রি করো না। যাও শুয়ে পড় গে! ওষুধটা খাচ্ছো তো?

হাসেন মিঃ সেন—হ্যাঁ! চলি বিজয়। গুড নাইট।

রাত্রি নেমেছে। উইক এণ্ডের রাত্রি। দুদিন কাজ নেই। সর্বত্রই ছুটির মেজাজ। আর রাত অবধি লণ্ডন সহরের পাব গুলো খোলা থাকে, হৈ চৈ হয়। হোমের অনেকেও আজ ফাঁক ফোকরে একটু ফুর্তি ফার্তা করে ফেরে। দু'

একজন উইক এণ্ডের ছুটিতেও বাইরে কাছাকাছি কোথাও যায়।

তাই সকালে ঘুম ভাঙ্গে এদের দেরীতেই।

বিজয়ও ঘুমিয়ে পড়েছে। হঠাৎ দরজায় টোকা শব্দ শুনে দরজা খুলে বাইরে এল। রবীন ঘোষ ডাক্তার—ওকে দেখে চাইল বিজয়।

কি ব্যাপার?

রবীন ঘোষ বলে—মিঃ সেন কাল রাতেই হার্ট-এ্যাটাকে মারা গেছে বিজয়।

বিজয় চমকে ওঠে—সেকি!

ওরা দৌড়লো মিঃ সেনের তিনতলার ঘরের দিকে।

বিছানায় স্তব্ধ শান্ত দেহটা পড়ে আছে। মুখে চোখে তখনও তেমনি মিষ্টি হাসির ছায়া।

ও যেন দূরে ভারতের মাটিতে রৌদ্র কিরণোজ্জ্বল তরাই এর কোন সবুজ প্রান্তরে ফিরে গেছে। সবুজ ঘাসঢাকা প্রান্তরে গড়ে তুলেছে তার স্বপ্নের সেই ডেয়ারী ফার্ম। ঘরে ফেরা মিঃ সেন আজ চিরদিনের জন্য কোন অজানা জগতে ফিরে গেছে। আর কোন দিন তাদের মাঝে আসবেন না।

বিজয়ের মন কি অজানা বেদনায় ভরে ওঠে। মনে পড়ে বৃদ্ধের শেষ কথা গুলো—কৃতি হয়ে দেশে ফিরে যাবে বিজয়। দেশের জন্য কিছু করবে। আমি পারি নি—তুমি করো।

বিজয় ভাবছে কথাগুলো।

মিসেস সেনের চোখে জল, আজ দীর্ঘ দিনের সাথীকে তিনি হারিয়েছেন। ওই মানুষটির স্মৃতি নিয়েই কাটাবে তার বাকী জীবন।

এলিজাবেথ সেন বলেন।

—এরপর একা কি করে এসব চালাবো জানিনা, উনি ছিলেন কিছু বুঝতে পারিনি।

ওরাও ভাবছে—নশা সেনের নিশ্চিন্ত আশ্রয় আজ হারাতে হবে বোধ হয়।

বিজয়-এর দুঃখটা যেন মনের গভীরে বেজেছে। ওই মানুষটি কি অজানা স্নেহে কৃতজ্ঞতায় তার মন ভরে দিয়েছে। পরীক্ষাতে পাশ করে গেছে।

এবার যেন লণ্ডনের বাঁধনও কাটছে তার। মিঃ সেন নেই। একা মিসেস সেনও এসব সামলাতে পারছেন না। হোম থাকে কিনা সন্দেহ।

বিজয় কদিন আমেরিকান এ্যামবাসিতে যাতায়ত করে ইণ্টারভিউ দিয়ে এবার ভিসা পেয়েছে।

হঠাৎ একটা পাবের মধ্য থেকে উস্কো খুস্কো পোষাক পরা একজনকে টলতে টলতে বের হতে দেখে চাইল বিজয়।

লোকটাও দেখছে তাকে। বিজয়েরও চেনা চেনা বোধ হয়।

— বড় ভাইয়া! বিজয়ের মনে পড়ে জাহাজের সেই কেবিনের মানুষটিকে।

বড় ভাইয়া—মিঃ আনন্দকে এখানে এভাবে দেখবে তা ভাবেনি?

—একি ব্যাপার! বিজয় অবাক হয়।

মিঃ আনন্দও চিনেছে তাকে। বলে সে জড়িত কণ্ঠে।

—বিজয় না? গুড!

—কেমন আছেন? বিজয় শুধোয়।

টলছে বড় ভাইয়া। মুখে একমুখ দাড়ি। বলে সে।

—খোয়াব ছুট গিয়া ভাইজান। সব কুছ ফোঁত! বাট্ আই এ্যাম রিয়েলি হ্যাপি।

তারপরই বলে—স্পেয়ার মি ওয়ান পাউন্ড! জাষ্ট ওয়ান পাউন্ড! বহুৎ হো গিয়া আভি মুলুক ওয়াপস্ চলে যাবো।

দিস ড্যাম কানট্রি।

বিজয় দেখছে ওকে। যেন একটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে সেই সদানন্দময় বাহারী পোষাক পরা মানুষটি। বিজয় কি ভেবে এক পাউন্ড দিতে বড় ভাইয়া টাকাটা নিয়ে বলে।

—থ্যাঙ্ক ইউ বিজয়। সো লং—

আবার টলতে টলতে সেই বার-এ গিয়েই ঢুকলো।

বিজয় দেখছে ওকে। জীবনের এই বিকৃত ধ্বংসে আজ নিজেও দুঃখ বোধ করে। ওরা যেন হারিয়ে গেছে এই জগতের মোহে।

বিজয় অমনি করে হারাবে না. তার পথ চেয়ে আছে সাথী, বৌদি। মিঃ সেন এর মত লোককেও সে কথা দিয়েছে দেশে ফিরে যাবে কৃতি হয়ে।

তাই এগিয়ে যেতে হবে, আরও আরও অনেক দূরে।

সগৌরবে একদিন দেশে ফিরবে বিজয় তার—প্রস্তুতির জন্য।

কমলা এখন কলকাতার বৃহত্তর জীবনে জড়িয়ে গেছে। ধাপে ধাপে উঠে এসেছে সে। বারাসত কলেজ থেকে পি-এইচ-ডি করে এসেছিল কলকাতার নামকরা কলেজে।

দেশের স্বাধীনতার পর নানা সমস্যাও বেড়েছে। এসেছে সমাজ জীবনে অনেক জটিলতা।

দিন বসে থাকে না।

দিন এগিয়ে যায় দেশও এগিয়ে যায়। ফলে অনেক সমস্যা। আর সেগুলো দূর করার পরিকল্পনাও নিতে হয়।

কমলা সমাজ, শিক্ষা নিয়েই ভেবেছে। তার কিছু অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে সমাধানের পথ নিয়েও আলোচনা করেছে।

সেগুলো সরকারী দপ্তরে পৌঁছানোর পর দু'একজন ভেবেছেন।
কমলাকেও দরকার হয়েছে তাদের।

ফলে কমলা এখন কলেজের শিক্ষার জগৎ থেকে সরকারী দপ্তরে এসেছে সমাজ, শিক্ষার বিভিন্ন পরিকল্পনার রূপায়ণ করতে।

একদিন অতীতে একটি ঘরের বৌ আজ অন্তঃপুরের সীমানা ছাড়িয়ে দেশের বৃহত্তম কর্মকেন্দ্রে এসে নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে সমাজের কাজ করে চলেছে।

কাজের চাপও অনেক, হাঁপিয়ে ওঠে কমলা।

মাঝে মাঝে বিজয়ের চিঠি পায়। ওইটুকুই যেন তার কাছে একটা পরম সান্ত্বনা হয়ে আছে।

সাথীরাও কাছে নেই।

তখন বোলপুরে ছিল, মাঝে মাঝে চলে যেতো ওখানে।

দুটি নারী সংসারের নিজের নিজের কাজের ফাঁকে দূর বিদেশের আর একজনের কথাও ভাবতো।

এখন ওখানে সাথীরাও নেই। দূরে বদলি হয়ে গেছে বিহারের জামালপুর রেল স্টেশনে। বার বার যেতে লেখে সাথীরা। কিন্তু কমলার যাওয়া হয়ে ওঠেনি কাজের চাপে।

এবার কয়েকদিন ছুটি নিয়ে যাবে কমলা। সাথীকে দেখলে আজও মনে পড়ে বিজয়ের কথা।

ছায়াঘন আরামবাগের দিনগুলোর কথাও মনে পড়ে কমলার।

প্রথম ওদেশ থেকে এসে ওখানেই চাকরী নিয়ে গেছল। একা একটি মেয়ে। জীবনের প্রথম পথ চলা শুরু করে সেখান থেকেই।

বিচিত্র সেই পথ। বিজয় আর সাথীর জীবনের নিভৃত পরিচয়টাকে সেখানে দেখেছিল। সেদিন কমলাই চেয়েছিল ওরা সরে যাক্।

আজ মনে হয় কমলার ভুল সে করেনি।

বিজয় দূর বিদেশে গিয়ে আজও তাই তাদের স্মৃতির আলোয় জীবনের পথ চলেছে সঠিক ভাবে।

সাথীর কাছেও সে কৃতজ্ঞ।

বিজয়ের কথা ভেবেই কমলাও নিজের জীবনে একটা স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছে। বারাসতে দেখেছিল ডাঃ দাশগুপ্তকে। জ্ঞানী-বয়স্ক মানুষটির পড়াশোনার জন্যই ঘর বাধা হয় নি।

শান্ত সৌম্য মানুষটির সান্নিধ্যে এসেছিল কমলা।

সন্ধ্যার পর আসতেন তিনি মাঝে মাঝে। এই বয়সে বোধহয় নিঃসঙ্গ বোধ করেন নিজেকে।

আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে কোথাও ওদের মনে যেন অন্য সুরও বেজেছিল।

ছায়া আঁধারে চাঁদ উঠতো বিশাল রোইনট্রি গাছের উর্ধাকাশে, বৃষ্টি ধোয়া সবুজ আলোস্নাত জগৎ। ওর বাগানে সবুজ গাছ ছেয়ে চাঁপা ফুল ফুটতো। রাতের বাতাস ভরে উঠতো সেই সুবাসে।

কমলা দেখেছিল মিঃ দাশগুপ্তকে।

তিনিই একদিন বলেছিলেন—যদি তোমার আপত্তি না থাকে কমলা, হয়তো আবার নোতুন করে ঘর বাঁধতে পারি দুজনে।

চমকে উঠেছিল কমলা।

তার অন্যমন যেন মনের গহণে এমনি কোন স্বপ্ন দেখেছিল। একজনকে অবলম্বন করে বাঁচার স্বপ্ন। জীবনে সে কিছুই পায় নি। এক জায়গায় সে শূন্য ব্যর্থই রয়ে গেছে।

কিন্তু আর এক মন শিউরে উঠেছিল।

কমলা জানে যেখানেই থাক বিজয় তার দিকে চেয়ে আছে, ধ্রুবতারার মত শান্ত উজ্জ্বল দীপ্তি নিয়ে সে বেঁচে আছে বিজয়ের জীবনে একটি প্রদীপ্ত আসনে। নিজের কামনা আর স্বার্থের কালিমায় তাকে সে কালো করে তুলতে পারবে না।

একদিন বিজয়ের জীবন থেকে সে সাথীকে জোর করে সরিয়ে দিয়ে তাকে শুধু নিঃস্বতার জ্বালায় জ্বালিয়ে তুলে দেশছাড়া করেছিল বৃহত্তর কাজের জন্যই।

সে দুঃখটা বিজয়ের বুকে কত বড় হয়ে বেজেছিল তা জানে কমলা।

সাথীর মত মেয়েকে নিয়ে বিজয় সুখী হতো। সেই পরম সুখকে বিজয়ের জীবন থেকে নির্বাসিত করে আজ কমলা নিজে এইভাবে ঘর বাঁধতে পারবে না।

মিঃ দাশগুপ্ত দেখছেন ওকে।

আজ তার অজানাতেই কমলাকে ভালোবেসেছেন তিনি। তাকে স্ত্রী - ঘরের মর্য্যাদা দিতে চান।

কিন্তু আর্তকণ্ঠে বলে কমলা।

—এ হয় না, হতে পারে না মিঃ দাশগুপ্ত। আপনি ভবিষ্যতে একথা কোনদিন ভাববেন না। একথা আমার ভাবাও পাপ। দয়া করে আপনি আমায় ভুল বুঝবেন না।

মিঃ দাশগুপ্ত বলেন—তুমি বিধবা তা জানি। কিন্তু সে তো তোমার দোষ নয়।

কমলা ওসব যুক্তির উর্দ্ধে।

তার মনে ওসব কিছু পাবার স্বপ্নকে সে কঠিন ভাবে নির্বাসিত করেছে বিজয়ের জন্যই।

বলে কমলা—আমাকে ক্ষমা করুন। আপনি যান। দয়া করে যান!

মিঃ দাশগুপ্তকেও সেদিন নির্মমভাবে প্রত্যাখান করে তার জীবন থেকে শেষ বসন্তকেও চিরতরে নির্বাসিত করেছিল কমলা।

তার কিছুদিন পরই ওই ভাবনাগুলোকে এড়াবার জন্যই কমলা বারাসত ছেড়ে কলকাতার কলেজে চলে এসেছিল।

আজও মনে পড়ে সেই কথাগুলো।

কিন্তু কমলার জীবনে ওসবের কোন দাম নেই।

বিজয়ের পথ চেয়ে আছে সে। সেও বিজয়কে দুঃখ দিয়ে তার ভাগ নিজের জীবনেও এনেছে।

কথাটা সেবার সাথীও বোলপুরে বলার চেষ্টা করেছিল।

কমলা ব্যাপারটাকে হাল্কা করার জন্য হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিল কথাটা।

সাথী প্রায়ই লেখে।

কতো বছর হয়ে গেল দেখেনি ওদের। সাথীদের সংসারে আর একজন এসেছে। ওদের সন্তান। সে এখন বেশ বড় হয়ে উঠেছে।

ওদের পূর্ণতার সংসারকেও দেখতে ইচ্ছা করে।

তাই কমলা এত কাজের মধ্যেও ক'দিন ছুটি নিয়ে চলেছে বিহারের সেই রেল সহরে। কলকাতা ইট কাঠ কংক্রিট থেকে যেন ক'দিন মুক্তি পেতে চায় সে।

রাতের ট্রেনটা চলেছে জামালপুরের দিকে, ভোরের আলোয় দেখা যায় সাঁওতাল পরগণার পাহাড়শ্রেণী। শাল মহুয়ার বনে নোতুন পাতার সমারোহ।

গাড়িটা চলেছে। পাহাড়ের ফাঁকের মাঝে পদ্মার বিস্তার দেখা যায়।

ওদিকে কোথায় মালদহের সীমারেখা। কমলার মনে হয় বিজয়কে ওই ছায়া স্নিগ্ধ পরিবেশ থেকে সেই-ই যেন নির্বাসনে পাঠিয়েছে।

সাহেবগঞ্জ, ভাগলপুর পার হয়ে ট্রেনটা চলেছে।

সামনের পাহাড়গুলো এগিয়ে আসছে যেন পথ রোধ করে দাঁড়াবে বলে। একটা টানেলে ট্রেনটা ঢুকে পড়েছে।

টানেলের ওদিকে পাহাড় ঘেরা উপত্যকায় জামালপুর ষ্টেশন। বেশ বড় ষ্টেশনই।

প্রশান্ত এখন ষ্টেশন মাষ্টার হয়ে গেছে। দেহে বয়সের ছায়া, মাথার চুল-গুলোও কিছু উঠে গেছে। প্রশান্ত আর সাথী দুজনেই এসেছে ষ্টেশনে, সঙ্গে একটি ছেলে। কমলা নেমেই ওদের দেখে এগিয়ে যায়।

সাথী বলে—প্রণাম কর নীপু।

কমলা ছেলেটিকে বুকে জড়িয়ে ধরে। ডাগর চোখ, ফর্সা রং—মাথায় একরাশ কোঁকড়ানো চুল, মুখে সলজ্জ বুদ্ধিদীপ্ত হাসি।

ওর প্রণাম করা হয় না, কমলাই ওকে কাছে টেনে নেয়।

সাথী বলে—তোমার মাসীমা হন।

এ যেন সাথীর মুখ বসানো। কমলা দেখছে ওকে। বলে—ওমা! কতবড় হয়ে গেছে! কোন ক্লাসে পড়ো নীপু?

পড়াশোনায় নীপু ভালোই। ফার্স্ট-সেকেণ্ডই হয়। নীপু বলে

—ক্লাশ সেভেন-এ!

—ওমা তাই নাকি! কমলাও খুশী হয়।

সাথীর চোখেও দেখেছে কমলা নোতুন খুশির আবেশ। মাতৃত্বের আনন্দে আরও উজ্জ্বল। আজ মা হয়ে সাথীও যেন এক নোতুন রূপে বদলে গেছে।

সাথী বলে—এই প্লাটফর্মেই থাকবে নাকি বৌদি? চলো, বাড়ি যাবে না?

প্রশান্তকে বলে সাথী—তুমি টাঙ্গা ঠিক করো, মালপত্র ওরা নিয়ে যাচ্ছে।

ষ্টেশন মাষ্টারের অতিথি সুতরাং মালপত্র নিয়ে যাবার লোকের অভাব হয় না তাদের।

রেল লাইনের একদিকে উঁচু পাহাড় শ্রেণী, মাঝে একটু উপত্যকা, অন্য-দিকেও রেল কলোনী। ওদিকে সমতল ক্ষেত। ভুট্টা-বাজরা হয়েছে। দূরে দেখা যায় আমবাগান।

সাথী বলে—ওদিকে গঙ্গা, মুঙ্গের সহর। আমরা লাইন পার হয়ে হিল কলোনীতে থাকি।

ষ্টেশন ছাড়াও এখানে রয়েছে রেলের বিরাট ওয়ার্কশপ। তাই জামালপুর-এর এত নাম ডাক। রেল কলোনীও বিরাট এলাকা জুড়ে।

ওদিকে একটা বিরাট ট্যাঙ্ক। নীপু বলে।

—গঙ্গা থেকে জল তুলে এনে পাম্প করে ওখানে ষ্টোর করা হয়। ওই জল সারা সহরে যায়।

নীপুর সব যেন জানা।

ওদিকে কারখানার বাইরে বাগান ঘেরা জায়গায় রয়েছে একটা বহু পুরোনো রেলইঞ্জিন। বেশ ঝকঝকে করে সাজানো। নীপুই জানায়।

—ওটা প্রথম চলা রেলইঞ্জিন। ওখানে ওটাকে রেখে দেওয়া হয়েছে মিউজিয়ামের মত সাজিয়ে।

কমলা শুধোয়, মিউজিয়াম কাকে বলে জানো?

নীপু বলে—হ্যাঁ। পুরানো সব জিনিষপত্র রাখা হয়। আমি কলকাতায় গিয়ে বাবার সঙ্গে দেখে এসেছি।

তারপরই নীপু বলে।

—আমিও বড় হলে ইনজিনিয়ার হয়ে ইঞ্জিন তৈরী করবো।

হাসে কমলা।

সাথী বলে—দিনরাত ওর সব নানা কথা।

কমলা বলে—স্বপ্ন থাকা ভালো। সেটা সার্থক করার চেষ্টা থাকবে তবেই। দেখবি ও একদিন বড় হয়ে অনেক কিছু করবে, নাম ডাক হবে ওর। দেশবিদেশে যাবে—

সাথী চমকে ওঠে।

একজনের কথা মনে পড়ে। আজ বিজয় কোথায় দূর প্রবাসে হারিয়ে গেছে। বড় হবার নেশায় এভাবে সে নীপুকেও হারাতে পারবে না।

বলে সে—আর বড় হয়ে কাজ নেই বৌদি। বড় হবার জ্বালা যে কতো তা বুঝেছি।

কমলা চমকে ওঠে।

সাথীর বেদনা-বিধুর চাহনিতে আজও সে খুঁজে পেয়েছে বিজয়ের জন্য তার সেই নিবিড় ভালোবাসার কথা। বিজয়কে সে যেন আজও ভোলেনি। তাই নিজের সন্তানকে সে ওই কারণে হারাতে চায় না।

টাঙাটা এসে বাগান ঘেরা একটা কোয়ার্টারের সামনে দাঁড়াতে নীপু লাফ দিয়ে নেমে বলে।

—আমরা এসে গেছি মাসীমণি। নামো—

নীপুই কদিন কমলার শূন্যতাকে পূর্ণ করেছে, সকালে এখানের কোন মিশনারী স্কুলে পড়তে যায় নীপু। এই সময়টা কমলার যেন ছুটি।

সাথী বলে—ও তোমাকে খুব জ্বালায়? না বৌদি?

কমলা বলে—জ্বালাবে কেন? ভালোই লাগেরে। ওকে দেখলে ছেলেবেলার বিজুর কথা মনে পড়ে। বাড়ির এত লোকজনকে ছেড়ে ও আমার কাছেই থাকতো। আমি না পড়ালে ওর পড়াও হতো না। খেতোও না অন্য কারোও হাতে।

বিজয়ের প্রসঙ্গ উঠতে সাথী চুপ করে যায়।

জানে সে বিজয় কমলা বৌদির উপর কতখানি নির্ভর ছিল। আজ দূর বিদেশে কোথায় যেন হারিয়ে গেছে সে। বিজয়ের কথা মনে পড়ে বার বার।

তার আজ সাজানো সংসার। স্বামীও নির্বিরোধী ভালো মানুষ। কোন দিনই কোন প্রশ্নও করেনি। অবশ্য সাথীও সংসারের সবকিছু মেনে নিয়ে তাকে সুখী করার চেষ্টাই করেছে। কোন ত্রুটি রাখে নি কোন দিকে।

তবু তার মনের অতলে অহঃরহ একটা শূন্যতাবোধ তাকে কি হাহাকারে জ্বালিয়ে তুলেছে। তার কোথাও কোন বহিঃপ্রকাশ ছিল না। নীরবে একাই সেই হাহাকার সহ্য করেছে সাথী।

সেই যন্ত্রণাকে কিছুটা ভুলে ছিল নীপু আসার পর। ওই ছেলেটার কলকাকলি সাথীর মনে এনেছিল একটি বিচিত্র সুর। ওকে নিয়েই সাথী তার মনকে সান্ত্বনা দিতে চেয়েছিল।

নীপুও বড় হচ্ছে। তার স্কুল—নিজের জগৎ—বন্ধু বান্ধবও হয়েছে। ক্রমশঃ সেও সরে যাবে তার জীবন থেকে। ক'বছর পরই এখানের পড়া শেষ হলে নীপুকে ডাক্তারি না হয় ইন্‌জিনিয়ারিং পড়াবে সে।

তখন নীপুও চলে যাবে তার কাছ থেকে।

সাথীর মনে অতলের সেই অদেখা বেদনাটা তবু জেগে থাকে। এর থেকে যেন তার মুক্তি নেই।

কমলাকেও এসব কথা জানাতে পারে না। তাই সব কিছু সহ্য করে সাথী এই জীবনকেই মেনে নিয়েছে।

রেল কলোনীর আশপাশের কোয়ার্টারেও যাতায়াত করে। অনেকেই আসে। কমলা ক'দিনে এখানের সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠেছে।

বৈকালে কলোনী ছাড়িয়ে ওদিকে পাহাড়ের দিকেও যায়।

শান্ত পরিবেশ। ওদিকে পাহাড়ের গা বেয়ে একটা পায়ে-চলা পথ উঠে গেছে, উপরে ছায়াঘন একটু পরিবেশ।

নীপু বলে—ওখানে একটা মন্দির আছে মাসীমা। ঝর্ণা আছে। আমরা স্কুল থেকে পিকনিক করতে গেছলাম—সুন্দর জায়গা। যাবে মা মণি?

সাথীও শুনেছে ওই মন্দির—সুন্দর পরিবেশের কথা। দূরে কোন দিগন্তে আছে সেই জগৎ। কিন্তু সাথীর যাওয়া হয়ে ওঠেনি।

ছেলের কথায় বলে।

—তাই যাবো একদিন।

নীপু বলে—তুমি যাবে? এক নম্বর ঘরকুনো তুমি। বাইরের দুনিয়াকে দেখলেই না। আমি বড় হলে অনেক দেশ বেড়াবো দেখো। ইংল্যান্ড, ইউরোপ আমেরিকা সব জায়গা যাবো—

চমকে ওঠে সাথী।

ওর দুচোখে কি চকিত বেদনার আভাষ।

একজন সেই দূর অজানায় কোথায় হারিয়ে গেছে। আবার আজ তার নিজের ছেলেকেও সেই স্বপ্ন দেখতে দেখে চমকে ওঠে সাথী। কমলাও দেখেছে সাথীর মুখে চোখে সেই অসহায় বেদনার ছায়া। সাথী ওই প্রসঙ্গ এড়াবার জন্য বলে।

—চলো নীপু, সন্ধ্যা হয়ে আসছে।

নীপু বলে—কাল তো ছুটি। মুঙ্গের নিয়ে যাবে না মাসীমণিকে? মীরকাশিমের কেল্লা, কষ্টহারিনীর ঘাট এসব দেখাবে না?

সাথীরও খেয়াল হয়। বলে সে।

—হ্যাঁ হ্যাঁ যাবো বৈকি। মনেই ছিল না কথাটা।

বহু পুরোনো সহর মুঙ্গের। একটি হতভাগ্য নবাবের ভাগ্য বিজড়িত মুঙ্গের। নীচে দিয়ে গঙ্গা প্রবাহিত। গঙ্গা এখানে উত্তরবাহিনী। কেল্লার

মজবুত পাথরের দেওয়ালের বহু নীচে গঙ্গা বয়ে চলেছে। মীরকাশিম ইংরেজদের নাগালের কিছু বাইরে এসে এখানে এই কেল্লা গড়েছিল। প্রতিষ্ঠিত করেছিল তখনকার সুবে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নোতুন রাজধানী।

..আজও কেল্লার প্রাসাদ গায়ে হয়তো সেই হারানো ইতিহাসের স্মৃতি কিছু রয়ে গেছে। পিপুলপাতির পথের দুদিকে অশথ গাছের সারি, আজ কেল্লার ভগ্নাবশেষের উপর গড়ে উঠেছে নোতুন সহর।

·ওপাশে কষ্টহারিনীর ঘাট। প্রবাদ আছে—

সীতা রামচন্দ্রের সঙ্গে লঙ্কা থেকে ফেরার পথে ওখানের গঙ্গায় স্নান করেছিল। সব দুঃখ কষ্ট দূর হয়ে গেছল তার। সেই থেকে প্রচলিত আছে ওই ঘাটে স্নান করলে নাকি মানুষের সব দুঃখ কষ্ট দূর হয়ে যায়।

সাথীও প্রথমে এসে জামালপুরে ওই সব কাহিনী শুনে ভেবেছিল একবার স্নান করেই আসবে। অনেক কষ্ট তার। কিন্তু পারেনি। মনে হয় তার অন্য মন বলে—এ কষ্ট থাক, এর সঙ্গে অনেক সুখ স্মৃতিও জড়িত আছে। তাকে হারাতে চায় না সাথী।

কমলা আজ হাসতে হাসতে বলে।

—ভাবছি একটা ডুব দিয়েই যাই। কি রে সাথী?

সাথী বলে—আর কষ্ট মুক্ত হয়ে কাজ নাই বৌদি। ডুব দিয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আবার নোতুন কষ্টগুলো চেপে ধরবে। তবু পুরোনো দুঃখ কষ্টগুলো চেনা, ওগুলোই জড়িয়ে থাক। নোতুনে আর কাজ নেই।

এমনি দিনে চিঠিখানা আসে।

বিজয়ের চিঠি। সেদিন বৈকালে নীপু খেলতে গেছে। ওদের স্কুলের কোথায় ফুটবল ম্যাচ আছে। প্রশান্তও নেই। স্টেশনে কাজে ব্যস্ত।

সাথীর লেটার বক্স থেকে চিঠিখানা এনেছে। বিদেশী স্ট্যাম্প দেখে বলে কমলা—বিজয়ের চিঠি, না রে?

সাথী যেন ঠিক জানাতে চায় নি যে বিজয় তাকে এখনও চিঠি দেয়। সেও জবাব দেয়।

কমলার কথায় কোন মতে মাথা নেড়ে জানায় সে।

কমলা ক'দিন এসেছিল এখানে। ছুটির কটা দিন কলকাতার সেই জীবনকে ভুলে শান্তিতেই ছিল। আবার ফিরতে হবে। গোছগাছ করছে সে।

বিজয়ের চিঠিখানা এগিয়ে দেয় সাথী ওর দিকে।

বিজয় লিখেছে, ইউরোপ ছেড়ে—লণ্ডন ছেড়ে সে চলে যাচ্ছে দূর আমেরিকার নিউইয়র্ক সহরে। সেখানেই এবার নোতুন করে জীবনটাকে গড়বে সে। এখানের পড়া শেষ হয়ে গেছে।

নিউইয়র্ক—আমেরিকায় বিরাট ভবিষ্যৎ। সব সম্ভবনাই সে পাবে সেখানে।

সুতরাং ওদেশেই যাচ্ছে। সেখানে গিয়ে তার নোতুন ঠিকানা জানাবে।

সাথীর মনে হয় বিজয় দূরে থেকে আরও দূরে চলে যাচ্ছে ইচ্ছে করেই। বলে সে।

—এভাবে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে কেন বৌদি? আমরা তো তার উপর কোন দাবী—কোন বাধাই রাখিনি। তবে কেন পালিয়ে বেড়ায়! ঠিকানার পর ঠিকানা বদলাচ্ছে। এক দেশ থেকে অন্য দেশে ঘুরেছে যাযাবরের মত। কেন? কি তার দুঃখ? এতই দোষ করেছি তার কাছে।

কমলা দেখছে সাথীকে।

ওর দুচোখ জলে ভরে উঠেছে কি নীরব বেদনায়।

কমলা ওকে সান্তনা দেবার জন্যই বলে।

ওখানে অনেক বড় ফিল্ড, তাই বোধ হয় চলে যাচ্ছে।

সাথী বলে—জানি, কি ব্যর্থ অভিমানে জীবনটাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে বিজয়। নিজের যা খুশী করুক—আমাদের কি?

কমলা চুপ করে থাকে।

ওরও মনে হয় কোথায় বিজয় কি এক জ্বালা নিয়ে ধূমকেতুর মতই ঘুরছে। তবু বিশ্বাস আছে তার—বিজয় হারিয়ে যাবে না। জয়ী হয়ে সে ফিরবেই।

সন্ধ্যা নামছে। পাখীরা কলরব করে।

আকাশের আঙিনায় দু'একটা করে ভীরু তারার চাহনি ফুটে ওঠে।

কমলা শুধোয়—তুই আমাকে ভুল বুঝেছিস সাথী?

সাথী চাইল ওর দিকে। তার চোখের তারায় আকাশের তারার ম্লান শিহরণ জাগে।

সাথীও কথাটা ভেবেছিল অতীতে। আজ সে সব চুকে গেছে। তবু শুধোয় সে।

—কেন?

কমলা আজ নিজেকে প্রকাশ করে হালকা হতে চায়।

বলে সে—ভেবেছিলি সেদিন আরামবাগে আমিই তোদের পথে বাধা হয়ে ছিলাম না?

সাথী বলে—বাধা হয়ে ছিলে কিনা জানি না। আমার জন্যও ভাবি না বৌদি, দুঃখ হয় বিজয়ের জন্য। এইভাবে সে হারিয়ে যাবে তা ভাবিনি কোন দিন। জানি—ও হয়তো আমাকে কোনদিনই ক্ষমা করতে পারবে না। পারে নি। অথচ—বিশ্বাস করো বৌদি, আমি এ চাই নি। কিন্তু—এছাড়া কোন পথ ছিল না।

সাথী কি ভাবছে। মুখে ওর নিবিড় বেদনার ছায়া।

প্রশান্ত জানে এসব?

কমলার কথায় সাথী বলে।

এসব নিয়ে কোন কথাই কোন দিন বলেনি। আমিও তো কোন অন্যায় করিনি বৌদি। ওদের জন্য সব করেছি।

তবু একজায়গায় —একজনের কাছে আমি ক্ষমা হয়তো পাইনি।

হঠাৎ বাইরে নীপুদের কলরব, জয়ধ্বনির শব্দ ওঠে।

ওরা ফিরছে। নীপুর হাতে বেস্টম্যান প্রাইজ, নীপু খেলার পোষাকে ছুটে এসে মাকে জড়িয়ে ধরে বলে।

শিল্ড পেয়েছি মামণি আমরা। আর আমি পেয়েছি আজকের খেলার বেস্ট ম্যানস্ প্রাইজ। দেখছো মাসীমণি।

দুটি মেয়ে তাদের অতীত জীবনের বেদনাকে ভুলে যেন বর্তমান ভবিষ্যৎকে সাদরে বরণ করে নেয়।

সাথী সেই বেদনাকে চেপে রেখে ছেলের সামনে উৎফুল্ল হয়ে ওঠার চেষ্টা করে। ওকে বুকে ধরে বলে।

—তাই নাকি রে! ওমা!

কমলা দেখছে একটি চিরন্তন নারীর দুটি রূপকে। একটি ওর অন্তরের নিজস্ব রূপ, অন্যটি মায়ের স্নেহময়ী রূপ। দুটির মূল উৎস বোধ হয় এক উৎসমূল থেকেই সঞ্জাত।

তাই নারী বিচিত্র রূপিনী, সর্বংসতা—অপরূপ।

কমলারও মনে পড়ে নীপুকে দেখে কিশোর বিজয়ের কথা। সেবার পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়ে এমনি করেই ছুটে এসে তাকে জড়িয়ে ধরে ওর মনের খুশির সম্ভার প্রকাশ করেছিল।

আজ সে কোথায়, কতদূরে জানে না। যেখানেই থাকুক বিজয়কে তারা ভোলেনি। সন্ধ্যা তারার মত তাদের মনের নিভৃতে সে জেগে আছে।

এতদিনের পরিচিত লন্ডন ছেড়ে তার পুরানো স্মৃতি—নশা সেনের স্মৃতি, জার্মানীর লিজাকে পিছনে রেখে আজ বিজয় হিথরো এয়ারপোর্ট থেকে যাত্রা করছে এ্যাটলান্টিক পাড়ি দিয়ে ওপারে নোতুন মহাদেশের দিকে।

আকাশে কুয়াসা—মেঘের জটলা। প্লেনটা তার মধ্যে ছাড়লো। প্রায় আট ঘন্টার পাড়ি। বিজয় প্লেনের জানলা দিয়ে দেখছে লন্ডনকে। আজ তার এখানের বাস শেষ হয়েছে। আরও দূরে চলেছে ভাগ্য অন্বেষণে।

আমেরিকা ভাগ্য অন্বেষণকারীদেরই দেশ।

প্রায় দুশো বছর আগে থেকেই সারা ইউরোপের জার্মানী নরওয়ে সুইডেন-ইতালী, ফ্রান্স স্পেন ইংল্যান্ড থেকে দলে দলে ভাগ্য বিতাড়িত জনস্রোত তখনকার

দিনে পাল তোলা জাহাজে দিনের পর দিন বিপদসঙ্কুল আটলাণ্টিক সমুদ্রে মাসাবধিকাল ভেসে ভেসে এসে পে'ছিতো এখানে।

চারিদিকে বন, আর রেডইণ্ডিয়ানদের রাজ্য।

গহণ বিপদসঙ্কুল বন, হিংস্র আদিবাসীদের আক্রমণে কতজন প্রাণ দিয়েছে। তবু তারা দল বেঁধে দূর দূরান্তরে গিয়ে বন কেটে বসত করেছে। প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করে নিজেদের বাসস্থান, কৃষিভূমি, সহরের পত্তন করেছে। এই বিশাল বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে আরও মানুষ এসেছে, নানা ভাষাভাষী মানুষ।

ক্রমশঃ একই মাটিতে তারা লড়াই করে নিজেদের ভাগ্য গড়ে তুলেছে। সম্পদ আহরণ করেছে। গড়ে উঠেছে নোতুন একটি মহাদেশ, নোতুন এক জাতি—নোতুন এক রাষ্ট্র।

আজ বহুমানুষের দানে তা ধনে, বিজ্ঞানে, ঐশ্বর্যে পূর্ণ। আজও মানুষ আসছে এই মহাদেশে ভাগ্য অন্বেষণে।

কঠিন পরিশ্রম করে তারাও নিজেদের ভাগ্য গড়েছে। তাই এখানের জীবন আরও কর্মময়, গতিময়, সদা ব্যস্ত।

এখানের আবর্তে মানুষ নিজের সত্বাকে যেন হারিয়ে ফেলে। কিন্তু প্রাচুর্যের সন্ধান সে পেতে পারে।

পৃথিবীর অন্য অনেক মহাদেশ ক্ষয়িষ্ণু, জনসংখ্যার চাপে ধুঁকেছে। এই দেশ তার তুলনায় বর্ধিষ্ণু, বিশাল বিস্তীর্ণ অঞ্চলে জনসংখ্যার চাপ অনুভূত হয় না তেমন।

এখনও বহু প্রাকৃতিক সম্পদ রয়ে গেছে তার ভাণ্ডারে যার শেষ নেই।

একটানা চলেছে প্লেনটা। বহু নীচে নীল আটলাণ্টিক মহাসাগরের বিস্তার। কয়েকঘণ্টা পর প্লেন উত্তর আমেরিকার উত্তরাংশের ভূখণ্ডের উপর দিয়ে উড়ে আসছে।

নীচে দেখা যায় ছোট্ট জনপদ, অরণ্যসীমা—পাহাড়—কোথাও নদীর ধারা। সরু সুতোর মত এঁকে বেঁকে গেছে। বৈকালের রোদের আলো নেমেছে।

লণ্ডন থেকে প্রায় চার ঘণ্টার সময়ের ব্যবধান।

এখন লণ্ডনে রাত্রি নেমেছে। এ্যানাসন রোডের বাড়িতে কেদার, হরেণ—শ্রীনিবাসনরা রয়ে গেছে।

মিসেস সেন বোধহয় ওদের সঙ্গে ফায়ার প্লেসের সামনে বসে গল্প করছেন।

বিজয় চেয়ে রয়েছে নীচের দিকে। প্লেনটা এসে পড়েছে।

এবার কেনেডি এয়ারপোর্টে নামছে। ওদিকে দেখা যায় সমুদ্রের বিস্তার এ্যাটলাণ্টিকের তীরেই এই মহানগরী।

বিরাট এয়ারপোর্ট। ইমিগ্রেশন—কাণ্টমস্ করিয়ে বাইরে এসে দেখে অসিতও এসে গেছে।

লণ্ডনেই পরিচয়। ওখানে ওর আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিল, বিজয়ের সঙ্গে সেখানেই দেখা হয়। পেশায় ইন্‌জিনিয়ার। এখানে নিউজার্সি'র ওদিকে কোন ফ্যাকটরীতে চাকরী করে।

তখন থেকেই ভালো লেগেছিল বিজয়ের অসিতকে। বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা, বহরমপুরে বাড়ি। কলকাতাতে পড়েছিল একই কলেজে। মুখ চেনা ছিল মাত্র।

লণ্ডনে সেই পরিচয়টা ঘনিষ্ট হয়ে ওঠে।

অসিতই বলে ওকে এদেশের কথা। এদেশের কর্ম প্রণালী।

অসিতকে দেখে এগিয়ে আসে বিজয়।

অসিত বলে—এলে তাহলে শেষ অবধি! চলো।

এয়ারপোর্ট থেকে বের হয়ে এল তারা। অবাক হয় বিজয়—গাড়ির বহর দেখে। সামনে বিশাল মাঠটা গাড়ির ভিড়ে ভরে আছে সারবন্দী হয়ে। ঠিকমত গাড়ি বের করার কারোই অসুবিধা হয় না।

আর ইংল্যাণ্ডের মত কিপ্ লেফট্ নয়। কিপ্ টু রাইট। এদের পথ চলার নিয়মটাও ওই রকম। সবই দক্ষিণ পন্থী।

আবহাওয়াও ঝলমলে।

পড়ন্ত বেলায় আলো ঝলমল করে হাইওয়ের দুদিকে পাইন বার্চ ডইলো গাছের মাথায়। মাঝে মাঝে বুনো আপেল গাছে লাল ছোট টুকটুকে ফল পুঁজো ধরে আছে।

ওদিকে জনবসত সুরু হয়েছে। ছবির মত সুন্দর কাঠের বাড়ি, চারিপাশে কিছু বাগান, ঘাসগুলো মাপমত ছাঁটা। সারবন্দী গাড়ির স্রোত হাইওয়ে দিয়ে ছুটে চলেছে।

বিজয় খুঁজছে ছবিতে দেখা সেই নিয়ইয়র্ককে। আকাশছোঁয়া সারবন্দী বাড়ি—সেই কর্মব্যস্ত অঞ্চলকে।

ওদের পথের থেকে দূরে, দেখা যায় সেই বিচিত্র, বিশাল স্কাই লাইনকে। আকাশ ছোঁয়া বাড়ির রাজ্য। অসিত বলে।

—ওই তোমার ম্যানহাটান্ অঞ্চল। নিউইয়র্কের কেন সারা আমেরিকার অর্থনৈতিক জীবনের প্রাণকেন্দ্র। আর প্রথম নিউইয়র্কের পত্তন হয়েছিল ওই দ্বীপেই।

বিজয় ক্রমশঃ কদিনেই নিউইয়র্ককে কিছুটা চিনেছে। তার চাকরীর ব্যাপারেও দু'চার জায়গায় যাতায়াত করছে।

দেখেছে নিউইয়র্ক কয়েকটি দ্বীপে বিভক্ত। তাদের মধ্যে এখনও সমুদ্রের খাঁড়ি—নাহয়, ইস্ট রিভার, ওদিকে হাডসন রিভার রয়ে গেছে।

কুইনস্—ব্রুকলিন—ম্যানহাটান—ব্রনস্ক—স্ট্যাটেন আইল্যাণ্ড ছাড়াও এখন

সহব বাড়ছে ওদিকে লং আইল্যান্ড, কোনি আইল্যান্ডের বেলাভূমির দিকেও।

ওপাশে সুরু হয়েছে জার্সি সিটি, নিউজার্সি অঞ্চল।

সারা সহরের নীচে দিয়ে চলে গেছে অসংখ্য ডালপালা মেলা সাবওয়ে। ট্রেনও চলে দিন রাত। বাসও।

লণ্ডনের তুলনায় এ সহর প্রাণউচ্ছ্বাসে ভরপুর, বর্ণময়। কিন্তু এর অতলের জীবনকেও এবার চিনেছে বিজয়।

ইউরোপের জীবনের সঙ্গে এর কিছুটা মিল থাকলেও এখানে কাজই বড় কথা।

সারা সহর দিন রাতেও ঘুমোয় না।

দিনরাত সাবওয়ে ট্রেন, বাস—গাড়ি চলাচল করে।

অপিস সুরু হয় সকাল থেকেই। তখনও রাতের আঁধার থাকে।

এর মধ্যে সে একটা অপিসে কাজ পেয়েছে।

তার বিষয়ে কাজ এখানে সন্ধান করতে হবে। জমানো টাকা বেশ কিছু রয়েছে তার।

কিন্তু বিজয় তার থেকে খরচ করতে চায় না।

মান্হাটান অঞ্চল নিউয়র্কের প্রাণকেন্দ্র।

এদিকে হাডসন্ নদী ওপাশে ইষ্টরিভার গিয়ে পড়েছে সমুদ্রে।

অন্যদিকে হার্লেম নদী, একটা দ্বীপই।

নিউইয়র্ক কয়েকটা দ্বীপের সমষ্টিই। এদিকে কুইনস্ এলাকা, ওপাশে ব্রুকলিন, একদিকে ম্যানহাটন, নদীর ওপারে ব্রঙ্কস আর ষ্ট্যাটন আইল্যাণ্ড নিয়েই নিউইয়র্ক, এখন এদিকে সমুদ্রের খাঁড়ির ধারে গড়ে উঠেছে কোনি আইল্যাণ্ড ওপাশে লং আইল্যাণ্ড, আর ষ্ট্যাটন আইল্যাণ্ডের পর নিউজার্সির সুরু।

বিরাট বিস্তীর্ণ এর বিস্তার।

তারমধ্যে ম্যানহাটনই প্রাণকেন্দ্র। আকাশ ছোঁয়া বাড়িগুলো মাথা তুলেছে আকাশে।

অতীতে সেই জাহাজ ভর্তি ইমিগ্রান্টের দল একদিন দীর্ঘ জাহাজ যাত্রার পর এখানে নেমেছিল। আদিবাসীদের সঙ্গে লড়ে তাদের প্রতিষ্ঠা কায়েম করেছিল। শোনা যায় দুই এলাকার মাঝে নিরাপত্তার জন্য একটা পাঁচিল তুলেছিল। সেই পাঁচিল আজ শুধু নামেই পরিণত হয়েছে। ওয়াল ষ্ট্রীট আজ পৃথিবীর ব্যবসাজগৎ নিয়ন্ত্রিত করছে। ওপাশেই রকিফেলার দের বিরাট প্রাসাদ এলাকা।

আলো ঢোকে না এখানে, দুদিকে বাড়ির সারি। ওদিকে চীনাদের এলাকা। এই অঞ্চলের কাছে একটা ছোট হোটেলে উঠেছে। ক্লিফেটন হোটেল বহু

ভাগ্যান্বেষী ভারতীয়দের আস্তানা। সপ্তাহে কয়েক ডলারের বিনিময়ে আশ্রয় মেলে।

বিজয়ও এখানে এসে জুটেছে।

অসিত থাকে দূরে।

শীতও পড়ছে।

এর মধ্যে একটা হোটেলেই কাজ পেয়েছে বিজয়।

ক'বছর আগে জার্মানীতে ডিস্ ধোয়া সুরু করেছিল, বার্মিংহামে হোটেলের ওয়েটার-এর অভিজ্ঞতাও কাজে লেগেছে। ঘণ্টায় সাত ডলার মজুরী, দিনে প্রায় ষাট ডলার মাইনে আর ট্রিপস্ অর্থাৎ বকশিষও মেলে প্রায় তিরিশ ডলার অর্থাৎ সর্বসাকুল্যে আশি নব্বুই ডলার রোজকার। দিনে প্রায় ভারতীয় মুদ্রায় তেরশো টাকা রোজকার।

টাকা আছে, কিন্তু একাজে মন বসে না বিজয়ের।

সকলেই এখানে এমনি কিছু কাজ করে, কলেজ পড়াশোনা করে, নিজের ভবিষ্যৎ গড়ার জন্য।

বিজয় তার ম্যানেজমেন্টের অভিজ্ঞতা দিয়ে কাজের সন্ধান করে, কিন্তু তেমন সুবিধামত জোটে না।

জুটলো কোন ব্যাঙ্কে একটা চাকরী।

এ তবু একটু ভদ্রস্থ কাজ। মাইনেও মন্দ নয়।

ক্লিভটন হোটেলে ফেরে। তখন সন্ধ্যা নামছে। শীতের সন্ধ্যা। পথঘাট জনহীন হয়ে যায়। রাস্তায় বরফ পড়ছে, সেণ্ট্রাল পার্কের গাছের সব পাতা ঝরে গেছে। পত্রহীন ডালগুলো তীব্র হাওয়ায় কাঁপে। পা ডুবে যায় নরম বরফে।

...বিজয়ের মনে কোথায় নীরব হাহাকার জাগে।

দূরে প্রবাসে এমনি একটা চাকরী আর শুধুমাত্র বাঁচার সন্ধানে সে আসেনি। তার আরও কিছু করার দরকার। কিন্তু পথও পায়নি সে।

হোটেলে কয়েকজন ভারতীয় বাঙ্গালীও আছে।

অনেকেই এই হোটেল থেকে চাকরী বাকরী নিয়ে কেউ ফ্ল্যাশিং, কেউ কুইনস্ কেউবা নিউ জার্সি অঞ্চলে বাড়ি কিনে চলে গেছে। দেশ থেকে পরিবারবর্গকে এনে ঘর সংসার পেতেছে।

বিজয়, অসিত, শিবপুরের বসন্ত—কলকাতার নরেনবাবুদের ও দেখেছে। এরা বাড়ি— গাড়ি করে এদেশের রোজকারে এখানেই বসত গড়েছে।

ছেলেমেয়ে হয়েছে দু'একজনের। তাদের ছেলেমেয়েরাও এদেশের ইস্কুলে পড়ছে। ইংরাজী বলছে। এদেশের রীতি নীতিই শিখে অন্যজাতে পরিণত হতে চলেছে।

ডঃ রায় এসেছে বংলামুলুক থেকে।

অবশ্য কিসের ডক্টরেট তা অনেকেই জানে না। ডঃ রায় কোথাও কোন একটা অপিসে চাকরী করে। বলে।

—ভারতবর্ষ ন্যাষ্টি কাণ্ট্রি ; নোংরা—লোকগুলো হাড় হাভাতে। এখানেই থেকে যাবো। দেশ থেকে মিসেসকেও আনাচ্ছি। এবার কুইনস্-এ বাড়িও কিনবো। ওদেশে আর ফিরবো না।

বিজয় বলে—ওদেশ কি দোষ করলো রায় দা।

ডঃ রায় এর মধ্যে এক আধটু হুইস্কিও ধরেছে। গেলাসে চুমুক দিয়ে বলে—ওটা আবার দেশ নাকি? জঙ্গল—ফরেষ্ট। ওখানে আবার মানুষ থাকে?

বিজয় চুপ করে যায় ওর কথায়। কারো মুখের উপর কোন কড়া কথা বলতে সে চায় না।

প্রশান্ত এখানে এসে এখন কোন ফার্মে চাকরী পেয়েছে।

তার এখানের চাকরীতে কোথাও কোন স্থিতি নেই। হায়ার করতেও যতক্ষণ আবার কর্মচারীকে ফায়ার করতেও এদের এতটুকু বাধেনা। কোথাও এখানে মানবিকতার কোন দাম নেই। বাঁধনও নেই।

এটা অপিস কাছারীতেই নয়, বাড়িতেও।

এদের পারিবারিক জীবনকেও দেখেছে প্রশান্ত। এর মধ্যে অপিসের দু' চারজন কর্মীদেরও দেখেছে।

ভোরেই বের হয় বাড়ি থেকে। কর্ত্তা একটা অপিসে চাকরী করে। গিন্নীও স্বাধীন ভাবে বাঁচতে চায়। সেও চাকরী করে কোথাও। কর্ত্তা অপিসের পর আর একজায়গায় কোন ষ্টোরে পার্ট টাইম চাকরী করে। সেখানে থেকে বাড়ি ফেরে রাত্রি দশটার পর গিন্নীও ফেরে তখনই।

দুজনে কিছু খেয়ে নিয়ে বাকী রাতটুকু কাটিয়ে আবার ভোরে দু'জন দু' দিকে সরে যায়। এই ওদের স্বামী-স্ত্রীর জীবন।

উইক এণ্ড শনি—রবিবার দুজনে দেখা হয়। তাও এভাবে জড়িয়ে গেছে তারা যে তার ভাবনাতেই কাটে সেই দুটো দিন।

মর্টগেজে বাড়ি কিনেছে, তার জন্য মাসিক সুদ আসল দিতে হয়, ওদিকে গাড়ির সুদ, আসল। ইনসিওরেন্স, গ্যাস—বিজলির টাকা, টাক্স সব দিয়ে থুয়ে হাতে কিছু থাকে না।

একটা ছেলে হলে তার পিছনে আগলাবার লোক—বেবি সিটারের দরকার। তার খরচা অনেক। ফলে অভাব টেনশন আর দুশ্চিন্তা বাড়ে। দুজনে বাধে ঝগড়া তারপর একদিন দুজনে দুদিকে চলে যায়, সংসার সিকেয় তুলে।

আরও দেখেছে মিঃ মর্গানকে।

বিজয়ও দেখেছে তাকে। তাকে কেন পার্কে দেখেছে অন্যদেরও। নিঃসঙ্গ মানুষ। কোথাও কেউ নেই। ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে চাকরী নিয়ে যে যার ঘর পেতেছে। ফলে বুড়ো বুড়ির কেউ নেই।

দুজনেই থাকে।

আর বুড়ি মরে যাবার পর মিঃ মর্গান একাই থাকে এ্যাপার্টমেণ্টে। সরকার থেকে বুড়ো বুড়িদের দেখে কিন্তু মানসিক নিঃসঙ্গতাকে দূর করা যায় না।

বিজয়ও দেখেছে তরুণ সমাজকে।

কোন বাঁধন নেই, প্রেম—ভালোবাসার নামে মেতে ওঠে।

কিন্তু জীবনের কোথাও যাদের স্থিতি নেই, তাদের ভালোবাসাও তাই ঠুনকো। সহজেই ভেঙ্গে যায়।

দু'জনে দুদিকে চলে যায়।

ডঃ রায় এদের বাইরের জীবনের চটকটাকে প্রাচুর্যকে দেখে মজে গেছে। তাই এ দেশ তার কাছে স্বর্গ।

বিজয় তবু দেশের নিন্দা করতে দেখে ডঃ রায়কে বলে।

—তাহলে এতদিন সেই জঙ্গলে ছিলেন কি করে?

ডঃ রায় বলে—থাকতে বাধ্য হয়েছিলাম। এবার বাড়ি করে চলে যাচ্ছি। একদিন তোমাদের হাউস ওয়ার্মিং পার্টি দেব।

হোটেল থেকে ডঃ রায় চলে গেছে। এসেছে নোতুন এক ডাক্তার—সুবিনয় সেন। এখানে এসেছিল অনেক নাম শুনে। এবার বিপদে পড়েছে।

দেশের এম-বি, বি-এস ডিগ্রীর কোন দামই নাই এখানে।

এদেশে ডাক্তারী করতে গেলে এখানের এম, ডি, ডিগ্রী নিতে হবে, পরীক্ষা দিতে হবে। তাতে কমাসই লাগবে।

ডঃ রায়কে কথাটা জানিয়ে ছিল সুবিনয়।

—যদি আপনার বাড়িতে একটা ঘর দেন—ভাড়া কিছু দেব?

ডঃ রায় কোন কথায় কান দেয়নি। এদের কাছ থেকে সরে যেতেই চায় সে, তাই এড়িয়ে গেল।

বিজয় বলে—দেখছি, অন্য কেউ যদি ভাড়া রাখে। তবে ততদিন তোমাকে চাকরী একটা খুঁজে নিতে হবে সুবিনয়। চাকরীর টাকায় খরচ চলবে। যে কোনো চাকরী?

সুবিনয় অবাক হয় যে—কোনো চাকরীই করতে হবে? দেশেতো ওসব করিনি?

—এখানে করতে হবে। এজেন্সী অপিসে চলো আজ! বিজয় বলে।

বিজয় এজেন্সী অপিসগুলোকে চিনে গেছে। ওখানে প্রথম গেলে ওরাই একটা ইণ্টারভিউ নেয়। এফিসিয়েন্সি টেস্ট, অঙ্ক টঙ্ক করার বিদ্যে এসব

দেখে নেয়। তারপর তাদের পিছনে লেগে থাকলে যে কোন অপিসে একটা 'অড্' জব মেলে।

কিন্তু তার পরমায়ু শেষ হবার আগেই অন্য কোথাও চাকরীর জন্য ওদের পিছনে লেগে থাকতে হয়। একটা চাকরী ছেড়ে অন্যটা ধরে।

বিজয়ের ম্যানেজমেণ্ট লাইনে হঠাৎ একটা ভালো চাকরীর খোঁজ মেলে। তবে নিউইয়র্কের বাইরে নিউজার্সিতে। কোন কেমিক্যাল ফ্যাক্টরীতে কণ্ট অ্যাকাউণ্টসের আর ম্যানেজমেণ্টের অধীনে চাকরী।

ওখানে চাকরী হলে কোয়ার্টারও মিলবে।

বিজয় কারখানার ঠিকানা নিয়ে যায়, আর সুবিনয়েরও ভালো হলো, বিজয় যদি ওখানে চাকরী পায়, বর্তমানের বিজয়ের চাকরীটা সুবিনয় পেতে পারে।

তবে সুবিনয় যে ডাক্তার একথা প্রকাশ করা চলবে না। ওরা জানতে পারলে ডাক্তারকে এসব কাজ দেবে না।

সুবিনয়ও রাজী।

যে ভাবে হোক তাকে বাঁচতে হবে এখানে। নিজের প্রকৃত পরিচয়ে দাঁড়াবার লড়াই করতে হবে।

সুবিনয় বিজয়ের কাছে কৃতজ্ঞ। এদেশে সহজে কেউ কাউকে সাহায্য করতে পারে না। সকলেই একটা কঠিন নাগপাশে বন্ধ। তবু তার মাঝে বিজয় তার জন্য কিছু করেছে।

সুবিনয় বলে—তোমার কাছে ঋণী বিজয়।

বিজয় বলে - জীবনে আমিও বাইরে এসে অনেকের কাছে দুঃখ, বেদনা পেয়েছি। আবার অনেকেই সাহায্য করেছে।

ওর মনে পড়ে বৌদি, সাথী, জার্মানীর লিজা, লিভারপুলের এ্যানা, লণ্ডনের ন্যাশা সেন, মিসেস সেনের কথা। এখানেও অসিত তাকে অনেক সাহায্য করেছে। তাদের প্রতিদান কিছু দিতে পারে নি। সুবিনয়কে সাহায্য করে বিজয় যেন তাদের প্রতি সেই ঋনের কিছুটা লাঘব করতে চায়।

বিজয় বলে—তোমাকে সাহায্য কিছুটা করতে পারলে আমার ঋণের বোঝাও কিছু কমবে সুবিনয়। আর বলবো, জীবনে যদি কোনদিন বড় হতে পারো মানুষকে সেদিন সাহায্য করো।

নিউইয়র্ক সহরের থেকে একটা ব্রিজ পার হলেই নিউজার্সী কিন্তু এ একটা ভিন্ন প্রদেশ।

নিউইয়র্কের লাগোয়া। তবে এখানে আকাশছোঁয়া বাড়িও কম। আর বসতিগুলো বেশ পরিষ্কার। ছোট ছোট বাগান ঘেরা বাড়ি। ওদিকে শুরু হয়েছে কিছু কারখানা।

ম্যাপেল, পাইন, বার্চ—ওক্ গাছের ভিড়।

বিজয় কারখানার অপিসে এসেছে সকালেই। এখানে কাজ সুরু হয় ভোরেই।

মিঃ ফুলটনই কারখানার মালিক। ওদিকের লনের একপাশে পার্কিং লনে গাড়ির ভিড়। শ্রমিক থেকে সুরু করে সুপার ম্যানেজার মালিক সকলের গাড়ি আছে। আর কাজেও এসে যায় সকলেই সময়মত।

ডিসিপ্লিন, কর্মনিষ্ঠা এদের মজবুত। কাজ ভালো না লাগলে এভাবে খাটতে পারা যায় না।

এদের নীতি হচ্ছে—লাভ ইট অর লিভ ইট!

হয় কাজকে ভালোবেসে প্রাণপণ খাটো, ভালো না লাগে ছেড়ে চলে যাও। সে কাজের জন্য অন্য ভালো লোক আসবে।

বিজয় রিসেপসনে গিয়ে সেখানের মহিলাটিকে চিঠিটা দেখাতে সে ফোন করে কি যেন জেনে নিয়ে বলে।

—ভিতরে যাও। দিস্ ওয়ে।

বিজয়ের মনে একটা চাপা উত্তেজনাও রয়েছে। এখানের পরিবেশটা তার ভালো লেগেছে, কারখানাটাও সুন্দর। ওদিকে অপিস বিলডিং-এর বড় হল ঘরে অনেকেই কাজ করছে।

ছোট ছোট কম্পিউটার মেশিনের পর্দায় সাদা অক্ষর গুলোয় কি সব হিসবে বের হচ্ছে। বিজয়ও এর মধ্যে বাইরে কাজ করে ওসব মেসিনে রপ্ত হয়ে গেছে।

এখানে চাকরীটা নাহলে আবার নিউইয়র্কের ম্যানহাটনের সেই অন্ধকার হোটেলে ফিরতে হবে।

মালিককে এভাবে দেখবে তা ভাবেনি বিজয়।

ওদিকে একটা টেবিলে বসে কয়েকজন কর্মচারীর সঙ্গে কথা বলছিলেন মিঃ ফুলটন।

বিজয়কে কাকে ওর নামে খোঁজ করতে দেখে বলেন তিনি।—ইট ইজ মি।

বিজয় চমকে ওঠে বৃদ্ধকে দেখে।

বয়সের ছাপ ওর মুখে, চুলগুলো সব রুপালী হয়ে গেছে' তবু বেশ বলিষ্ঠ দীর্ঘ দেহ। ওর থেকে চিঠি নিয়ে ওকে বলেন।—আমার সঙ্গে এসো।

নামেই একটা চেম্বার। ওদিকে বোর্ড মিটিং-এর হল। মিঃ ফুলটন ওকে বলে—ইউ ফ্রম বেঙ্গল? হাসিমারা চেনো?

বিজয় চাইল ওর দিকে।

হাসিমারার নাম শুনেছে সে, দু'একবার ট্রেনে কুচবিহার থেকে মালদহ আসার পথে ওই লাইন দিয়ে এসেছে। একবার স্কুল থেকে ওরা জলদাপাড়া বেড়াতে যাবার পথে হাসিমারায় থেমে ছিল। চারিদিকে সবুজ চা বাগান, একদিকের দিগন্তে হিমালয়ের সীমা। এখানেই দেখেছিল মিলিটারী প্লেনের সারি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকেই এসব অঞ্চলে হাওয়াই আড্ডা গড়েছিল আমেরিকানরা।

বিজয় বলে হ্যাঁ! আমাদের ওদিকেই।

মিঃ ফুলটন কি ভাবছেন। হঠাৎ বুড়োর বয়সটা যেন বেড়ে গেছে। ওর মুখের কুঞ্চন রেখাগুলো স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। ওর ঘরে নেমেছে স্তব্ধতা। সেই স্তব্ধতার মাঝে বুড়ো যেন কি ভাবছে।

বিজয় একটু অবাক হয়।

হঠাৎ বুড়ো মিঃ ফুলটন যেন আবার ধাতস্থ হয়ে এ জগতে ফিরে আসেন। বলেন তিনি।

—ওয়েল। আমাদের ফ্যাক্টরীতে জয়েন করছো তাহলে?

মিঃ সিটন তোমাকে সব দেখিয়ে দেবে, চলো, তার সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিই। তোমার কাজ বুঝে নেবে।

ফুলটন নিজেই বিজয়কে নিয়ে বের হয়ে এল।

ওখানে অকারণে কেউ কাউকে ডাকাডাকি করে সময় নষ্ট করে না। দরকার হলে নিজেরাই তার কাছে চলে যায়।

ফুলটন নিজে কোম্পানীর চেয়ারম্যান হয়েও বিজয়কে নিয়ে চলেছেন তাঁর অধঃস্তন কর্মচারীর কাছে।

বিজয় এখানের কাজের ধারার সঙ্গে সহজেই পরিচিতি হয়ে যায়। সারা কারখানার কাজের পদ্ধতিটাকেও দেখেছে সে এর মধ্যে ঘুরে ঘুরে। বিভিন্ন সেকসনের হিসাবপত্র, তাদের কোন ব্রান্ডের ওষুধের কত প্রডাকশন, মার্কেটিং সেকসনের কাজ, পার্চেজিং সেকসনের বিলিং সবই আসে তাদের সেন্ট্রাল সেকসনে।

বিজয় দেখছে সব কিছু।

তার ফাইলিং—ডেটা প্রসেসিং-এর অর্জিত বিদ্যাকে এবার কাজে লাগাতে পেরেছে সে। আর আধুনিক কম্পিউটার মেসিনে সে কাজ আরও সহজ হয়ে উঠেছে এখানে।

মিঃ ফুলটনও দেখেছেন বিজয়কে।

ছেলেটির তীক্ষ্ম বুদ্ধির পরিচয়ও পেয়েছেন তিনি। কারখানার সমস্ত ছবিটা তার মনে এসে গেছে।

সেদিন বিজয় বলে মিঃ ফুলটনকে কথাটা।

ফ্যাক্টরীর ওদিকেই বেশ কিছুটা জায়গা পড়ে আছে। দূরে দূরে আরও কিছু কারখানা গড়ে উঠেছে।

বিজয় বলে—ওই ফাঁকা জায়গাগুলো আমরা কেন কিনে নিই নি?

এতদিন ওর কোন প্রয়োজনও বোধ করে নি কোম্পানী। আর মিঃ ফুলটনও

তাঁর জীবনের একটা চরম দুর্ঘটনার পর থেকেই ব্যবসাতে আর তেমন উৎসাহ পান নি। আজ বিজয়ের কথাটা শুনে বলেন তিনি।

—কেন বলো তো? ওসব ফাঁকাই পড়ে আছে। আমাদের দরকার হয়নি। বিজয় বলে—শুনলাম অন্য কোম্পানী ওই সব জায়গা নিতে চাইছে। তাহলে ভবিষ্যতে আমরা বিপদে পড়বো। অন্য কোন রিয়েল এস্টেট প্রপার্টি যদি ওসব জায়গা কিনে হাউসিং প্ল্যানে বাড়ি করে, তখন প্রবলেম হবে আমাদেরই। এয়ার পলিউশন-এর প্রশ্ন তুলে বিপদে ফেলবে।

কথাটা ভাবেন মিঃ ফুলটনও।

মিঃ মুলার—মিঃ ডসন এখানের পুরানো পদস্থ কর্মচারী। ওরাও ভাবেনি কথাটা। বলে—তার জন্য জায়গাটা কিনতে হবে? আমরা কি রিয়েল এস্টেটের জমির ব্যবসা করবো?

বিজয় বলে—আমাদের কারখানার স্বার্থে করা দরকার।

মিঃ ফুলটনও কথাটা ভেবেছেন।

এখন সহর বাড়ছে, লোকালয় এগিয়ে আসছে। জায়গার দামও বাড়ছে। কি ভেবে তিনি বলেন।

—ঠিক বলেছো বিজয়। পারচেজ দ্যাট ল্যান্ড। পরে আমাদের কাজে লাগবে।

মিঃ মুলার এত গুলো টাকা জড়াতে রাজী নয়।

তিনি বলেন—ইট ইজ সিম্‌প্লি ফর নাথিং।

তবু জায়গাটা কেনা হয়ে গেল। মিঃ মুলার মনে মনে এবার বিজয়ের উপর চটে গেছে কারণ বেশ বুঝেছে মিঃ ফুলটন যেন বিজয়ের উপর বেশী নির্ভরশীল হয়ে উঠেছেন।

আর এটা তাদের পক্ষে ক্ষতিকরই হতে পারে।

মিঃ মুলার এতদিন ধরে এই কারখানার সব কিছুতেই উৎসাহ দেখিয়ে এই কারখানার কাজ চালিয়ে এসেছে।

বিশেষ করে মিঃ ফুলটনের পারিবারিক দুর্ঘটনার পর বৃদ্ধ এই কারখানার অনেক কাজের ভারই মিঃ মুলারের উপর ছেড়ে দিয়েছিলেন।

পারচেজিং—মার্কেটিং সেকসনের ভারও ছিল মুলারের উপর।

বিজয়ও দেখেছে সেটা।

আরও দেখেছে বিজয় মিঃ মুলারকে চটিয়ে এখানে কেউ কাজ করতে পারে না।

সেলস্‌-এর মিঃ রবার্টস্‌কে দেখেছে উৎসাহী বুদ্ধিমান কর্মী। সেলস্‌-এর সব কিছু তার নখদর্পণে। বিজয় আগেকার কাগজপত্র দেখে বুঝেছে কবছর আগে ওদের বেশ কিছু ব্রান্ডের মালের বাজার ছিল সারা আমেরিকা জুড়ে। বাইরের দেশেও প্রচুর রপ্তানী হতো।

হঠাৎ সেই সব ব্রাণ্ডের মালের চাহিদা যেন কমে আসছে। বাইরের বাজারে রপ্তানীর পরিমাণও কমে গেছে। তাছাড়া পারচেজিং সেকশনে হিসাবপত্রে দেখেছে বেশ কিছু কাঁচা মালের দামও বেড়ে গেছে।

দু-তিনটি কোম্পানী তাদের মালপত্র সাপ্লাই দেয়। হঠাৎ তারা প্রতিটি মালের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে।

বিজয় মিঃ মুলারকে এ নিয়ে প্রশ্ন করে সঠিক তেমন কোন উত্তর পায় নি। যা উত্তর পেয়েছে সেটা কেমন ভাসা ভাসা।

বিজয় তাই সেদিন মিঃ রবার্টস্-এর ওখানেই গেছে।

কারখানার শেডের ওদিকে ওর অপিস। রবার্টসও চেনে বিজয়কে। ওকে পছন্দ করে রবার্টস।

বিজয় ওকে কাগজপত্র দেখিয়ে আজ জিজ্ঞাসা করে।

এই সব মালের চাহিদা হঠাৎ কমে গেল কেন?

রবার্টস একটু অবাক হয় ওকে এই সব প্রশ্ন করতে দেখে। বলে সে।

এসব কোম্পানীর উপরের ব্যাপার বিজয়।

বিজয় চাইল ওর দিকে। সে যেন কিসের গন্ধ পেয়েছে।

বিজয় বলে—এভাবে চললে কোম্পানীই বন্ধ হয়ে যাবে রবার্টস। এটা তুমিও জানো। মিঃ ফুলটনকে এসব খবর ঠিক মত জানানোও হয়নি। অর্থাৎ কেউ চান এই কারখানা বন্ধই হয়ে যাক? তুমি নিশ্চয়ই তা চাও না?

রবার্টস চমকে ওঠে বিজয়ের কথায়।

রবার্টস পুরানো লোক। মিঃ ফুলটনকে দেখেছিল আগে কি উৎসাহ নিয়ে তিনি এই কারখানার পত্তন করেছিলেন। বড় করেছিলেন। কিন্তু এখন যেন তাঁর সেই উৎসাহ আর নেই। সব ভার নিয়েছে মিঃ মুলার, তারপর থেকেই এই ব্যাপার সুরু হয়েছে।

কারণটা কিছু জানে রবার্টস। তারজন্য সে ভাবনায় পড়েছে। কিন্তু একা তার করার কিছুই নেই। জানে প্রতিপক্ষ অনেক শক্তিমান।

বিজয়কে দেখেছে আজ সেই কথা বলতে।

রবার্টস বলে—অনেক প্রশ্ন আছে বিজয়। আশাকরি তুমিও বুঝতে পারছো।

বিজয়ের মনে সন্দেহ ঘনীভূত হয়।

বলে সে—তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পারো রবার্টস।

রবার্টস বলে—তা কাঁর বিজয়। কিন্তু এসবে অনেক গলদ আছে! কারখানার মালপত্রও ঠিক মত প্রডাকশনের হিসাবে আসে না। আর পারচেজিং সেকশানেও গোলমাল আছে।

বিজয়ও অনুমান করেছে সেটা।

বলে সে—সাপ্লাই কোম্পানীদের দরকার হলে বদলাতে হবে। বাজারে অন্য কোম্পানী অনেক কম দরে মাল কিনছে তা জানি। তবে আমরা কেন সেই মাল বেশী দামে কিনবো। যে সস্তা দিতে পারবে তার কাছেই কিনবো।

রবার্টস বলে—সাপ্লাই কোম্পানীর মালিক ওই মল্লারের শ্যালক! ওদের হটাতে পারবে না বোধ হয়।

বিজয় ক্রমশঃ দেখছে ব্যাপারটা।

তার হাতে এর মধ্যে কিছু কাগজপত্রও এসে গেছে যা দিয়ে এসব তথ্যকে বিজয় প্রমাণ করতে পারবে।

কারখানার একটু দূরে মিঃ ফুলটন-এর বাংলো।

বিজয় এর আগেও দু একবার গেছে ওর বাড়িতে।

মিসেস ফুলটনকেও দেখেছে সে। বুড়িও এসে পরিচয় করেছে তার সঙ্গে।

কেন জানে না বিজয় বুড়িও তাকে হাসিমারার কথাও শুনিয়েছে। তাকে জিজ্ঞাসা করেছে তার বাড়ি থেকে কতদূর ওই জায়গা। চা না খাইয়ে ছাড়েনি।

আজ মিঃ ফুলটন ছুটির দিনে নিজেই তার বাগানে লনমোয়ার দিয়ে ঘাস কাটছিলেন। বিজয়কে দেখে বলেন।

—এসো বিজয়। হঠাৎ বুড়োকে দেখতে এলে?

বিজয় বলে—তাই-ই।

জানে বিজয় এদেশের বুড়োদের নিঃসঙ্গতার কথা। বিশেষ করে মিঃ ফুলটনের পারিবারিক বেদনাময় ইতিহাসটাকেও জেনেছে সে। তার একমাত্র ছেলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে পাইলট হয়ে যুদ্ধে গেছল। কোথায় মারা গেছে প্লেন ক্রাশ করে! সে আর তার বাবামায়ের কাছে ফিরে আসেনি।

আজ নিঃসঙ্গ শোকাতুর বুড়ো ফুলটন এত সম্পদ সত্ত্বেও সেই নিঃস্বই রয়ে গেছে এক জায়গায়। মিঃ ফুলটন বলেন।

—এসো! এক কাপ চা খেয়ে যাবে।

মিসেসও এসে হাজির হয়।

বিজয় একথা সে কথার পর আসল কথায় আসে। কাগজপত্র বের করে বলে—আপনি তো সবই করেছেন নিজের হাতে, তারপর আর দেখেন নি তত গভীর ভাবে। কিন্তু এর মধ্যে এইসব ব্যাপার ঘটে চলেছে। কোম্পানীর অবস্থাও খারাপ হয়ে আসছে।

মিঃ ফুলটন ছেলের ভবিষ্যৎ-এর জন্যই এই কারখানা করেছিলেন। আজ ছেলেও নেই। তাঁর যা আছে তাই দিয়েই বাকী জীবন তাদের ভালোভাবে চলে যাবে।

মিঃ ফুলটন যেন ওই কারখানার ব্যাপারে আর উৎসাহ বোধ করেননি এতদিন। কিছুদিন ধরেছেন বিজয়কে। তার কাজে উৎসাহ দেখেছেন, দেখেছেন সব

বিষয়েই বিজয়ের কিছুটা জ্ঞানও আছে।

মিঃ ফুলটন তাই আজ ওর কথায় বলেন।

—কিছুটা জানি বিজয়। কিন্তু আমি বড় ক্লান্ত। পাশে কেউ নেই।

—বিজয় দেখছে বৃদ্ধকে।

বিজয়ও তা জানে।

মিসেস ফুলটনও শুনছে ওর কথা গুলো। বিজয় বলে।

—আপনি চাইলে পাশে অনেককেই পাবেন, যারা কোম্পানীকে বাঁচাবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করবে। আর আপনারও দায়িত্ব আছে মিঃ ফুলটন। প্রতিষ্ঠানকে এভাবে নষ্ট হতে দিতে পারেন না। সাপ্লাই কোম্পানীর বিল বানিয়ে একদিকে কোম্পানীকে ঠকাবে, অন্য দিকে প্রডাকশন প্ল্যাণ্ট থেকে বেশ কিছু মাল সরে যাবে, আপনি জানবেন না, এভাবে চললে কতদিন বাঁচবে কোম্পানী ?

এইসব কাগজপত্র রেখে গেলাম, আপনি দেখলেই বুঝতে পারবেন।

মিসেস ফুলটনও কোম্পানীর পার্টনার।

বুড়ি এককালে নিজে অপিসে বসতো। এখন আর বিশেষ যায় না। তবু এসব কথা শুনে বলে।

—ওসব কাগজ পত্র রেখে যাও বিজয়। আমি দেখবো।

বিজয় বলে—ঠিক আছে। তবে এসব কাজ তদন্ত খুব গোপনেই করা দরকার। অপরপক্ষ জানতে পারলে বিপদে ফেলবে কোম্পানীকে, আমাদেরও।

বুড়ি বলে—ও নিয়ে তুমি ভেবোনা।

মিঃ ফুলটন তখনও ভাবছেন কথাটা। ক্রমশঃ ব্যাপারটা দেখে সবই বুঝেছেন তিনি। কোম্পানীর লাভ লোকসানের বেদনার চেয়েও তার মনে বেজেছে মিঃ মুলারের ব্যবহারটা।

এভাবে বন্ধুত্বের সুযোগ নিয়ে তাঁর বিশ্বাসের অমর্যাদা করতে পারবে মিঃ মুলার এটা ভাবেননি তিনি।

বিজয় বলে—আর কোম্পানীর আশপাশের ওই জায়গাগুলো তিনিই সেবার কিনতে বাধা দিয়েছিলেন, কেন জানেন ?

চাইলেন মিঃ ফুলটন।

বিজয় বলে—ওর রিয়েল এষ্টেট কোম্পানীই চেয়েছিল ওগুলোকে কিনে নিয়ে কোম্পানীকে দরকার হলে বিপদে ফেলতে পারবে, তেমন একটা ব্যবস্থায় জন্যই আমি তা হতে দিই নি।

মিঃ ফুলটন চমকে ওঠেন।

—তাই নাকি ? ষ্ট্রেঞ্জ !

বিজয় বের হয়ে এল কাগজপত্রগুলো ওদের দিয়ে।

মিঃ ম্লার ক'বছর ধরেই বন্ধ্যের স্যোগ নিয়ে নিজের আয় পয়ই বাড়িয়েছে নানা ভাবে। মিঃ ম্লার এর মধ্যে নিজে টেক্সাস এর দিকে বেশ বড় সড় র‍্যাঞ্চ ও করেছে। ফার্ম কিনেছে ওই দিকেই। সেখানে ছেলেও দেখা শোনা করে।

আর এদিকে মিঃ ম্লার তার সাম্রাজ্য বাড়িয়ে চলেছে।

কিন্তু হঠাৎ তার সাম্রাজ্যে ফাটল ধরতে দেখে এবার চমকে উঠেছে। ও ভাবেনি যে এভাবে ওই ছেলেটি তার এতদিনের অন্ধকারের কাজ গুলোকে ধরে ফেলবে।

মিঃ ম্লারেরও কিছু আপনজন এই কারখানাতে আছে। তাদের যৎসামান্য কৃপাদান করে মিঃ ম্লার নিজেই এখানের সিংহভাগ দখল করছিল।

তাদেরই একজন খবরটা আনে।

রবার্টস যে বিজয়কে অনেক খবর দিয়েছে এটাও জেনেছে মিঃ ম্লার।

মিঃ ম্লার তাই এবার প্রথমে রবার্টসকেই দেখতে চায়।

এখানে কর্মচারীকে বরখাস্ত করা খুবই সহজ। তার জন্য ম্যানেজমেন্টকে কোন কারণও দেখাতে হয় না। তাদের পছন্দ না হলে চাকরীতে তারা রাখবে না। তার জন্য যে কোন একটা ছুতোই যথেষ্ট।

মিঃ ম্লার সেদিন রবার্টসকে তার অপিসে ডেকে চিঠিখানা ধরিয়ে দেয়। রবার্টস একটু অবাক হয়। বলে সে।

আট বছর কাজ করছি এখানে।

মিঃ ম্লার রাগটা চেপে রেখে বলে।

—সো হোয়াট? কোম্পানী এখন খরচ কমাতে চায়, আমরা কিছু লোককে ছাঁটাই করছি বাধ্য হয়ে!

রবার্টস ফিরে আসে।

খবরটা ছড়িয়ে পড়ে কারখানায়। বিজয়ও খবরটা শুনে এসেছে রবার্টস-এর ওখানে।

এই চাকরীটা ভালোই লেগেছিল রবার্টস-এর।

হঠাৎ এমনি করে এ চাকরীও চলে যাবে তা ভাবতে পারেনি।

আজ অসুবিধাতেই পড়েছে সে। এতদিন এখানে ছিল, এখানেই চাকরী না পেলে দূরে কোথায় চাকরীর সন্ধানে যেতে হবে এ বাড়ি ছেড়ে। নানা ভাবনায় পড়েছে রবার্টস্।

বিজয়কে দেখে চাইল। রবার্টস বলে।

—ওরা আমাকে স্যাক করেছে বিজয়। আমার জন্য ভাবছি না, তুমিও রেডি থাকো তোমাকেও ওরা ছাড়বে না। বিদেয় করবেই!

বিজয় সেটা ভাবছে না।

মিঃ ফুলটন কি জানেন এসব কথা? না, মিঃ ম্লার তার নিজের পথ পরিষ্কার

করার জন্য এইসব করছে।

বিজয় বলে—তুমি বাড়িতে থাকবে রবার্টস। আমি মিঃ ফুলটনকে এ নিয়ে জিজ্ঞাসা করে খবর দিচ্ছি। যদি তেমন দেখি আমিও ব্যবস্থা করবো।

মিঃ ফুলটন এর মধ্যে কাগজপত্রগুলো সব দেখেছেন, নিজেও দু'চার জায়গায় খোঁজ খবর নিয়ে জেনেছেন আরও অনেক কিছু। তার সিকিউরিটি ডিপার্ট-মেন্টও হঠাৎ একটা লরী বোঝাই কিছু বিশেষ ব্র্যান্ড-এর মাল বের হয়ে যাবার সময় ধরেছে। তাদের কোন আসল চালানও ছিল না।

মিঃ ফুলটন কি ভাবে এগোবেন তাই ভাবছেন, এমন সময় বিজয়কে আসতে দেখে চাইলেন।

বিজয় বলে—রবার্টস-এর চাকরী গেছে। মিঃ মুলার ওকে স্যাক্ করেছে। ও নাকি মালপত্র নিজে চালান দেখে ছাড়তে চেয়েছিল, এই তার অপরাধ!

মিঃ ফুলটন দেখছেন ওকে।

বিজয় বলে—যদি এই কারণে কোন সৎ কর্মচারীর চাকরী যায় তাহলে এখানে কাজ করা সম্ভব হবে না কারোও। আমিও তাই চলে যাবো ভাবছি।

ওকে উত্তেজিত ভাবে এসে রবার্টস এর চাকরী যাওয়ার কথা শোনাতে মিঃ ফুলটন অবাক হন।

—সে কি! এসব কথাতো মুলার আমাকে বলে নি।

বিজয় বলে—বলার দরকার বোধ করেনি। ওরা থাকলে মিঃ মুলারের অসুবিধা হবে, তাই রবার্টসকে যেতে হয়েছে। অথচ হাতে নাতে বেআইনীভাবে ট্রাক ভর্তি মাল পাঠানোর অপরাধে স্টোর কিপারের কোন শাস্তি হয় নি। এটাও বোধহয় আপনি জানেন না!

—স্ট্রেঞ্জ! মিসেস ফুলটন মন্তব্য করেন।

বুড়ি বলে মিঃ ফুলটনকে।

—এখনও তুমি চুপ করে থাকবে? এত বড় প্রতিষ্ঠানের শেষ দেখবে চুপ করে? ডু সামথিং!

মিঃ ফুলটন বলেন।'

—দেখছি কি করা যায়!

মিসেস ফুলটন বলে—দি সুনার দি বেটার। দেরী হলে মুলার আরও অনেক ক্ষতি করবে।

কি ভেবে বুড়ি ফুলটনক বলে।

—রবার্টস এর অর্ডার তুমি বাতিল করে দাও। কাল থেকে আমরাও কারখানায় রেগুলার যাবো। ওই অর্ডার বাতিল করলে যদি মুলারের কোন আত্মসম্মান জ্ঞান থাকে ও পদত্যাগ করবে।

মিঃ ফুলটন কি ভেবে বলেন।

—যদি না করে?

মিসেস ফুলটন বলে—ওকে তার জন্য পস্তাতে হবে। বিজয় তুমি এরমধ্যে একটা পুরো স্টেটমেন্ট তৈরী করো, কত পরিমাণ টাকা কোম্পানী লোকসান করেছে ওই মুলারের জন্য। কালই ওটা পেলে ভালো হয়।

বিজয় খুশী হয়েছে এবার দুই মালিকের টনক নড়েছে দেখে। আর রবার্টস-এর চাকরী খতমের হুকুমকেও রদ করিয়েছে। এইটা সে চেয়েছিল।

রবার্টস্ জানেনা তার কি হবে, হঠাৎ বেল বাজতে দেখে বের হয়ে এসে দরজা খুলে সামনে বিজয়কে দেখে চাইল।

বিজয় ভিতরে এসে বলে।

—ওই অর্ডার ফুলটন ক্যানসেল করেছে রবার্টস। তুমি চাকরীতে যেমন আছো থাকবে।

বিজয়ের কথায় অবাক হয়, রবার্টস।

—কি বলছো বিজয়?

বিজয় চিঠিখানা দেখিয়ে বলে।

—মুলারকেও পাঠিয়েছে এই চিঠি। তার যদি সম্মানজ্ঞান থাকে তবে এরপর সে রিজাইন করবে। নইলে মিসেস ফুলটনই ব্যবস্থা করবেন। তার আগে তোমারও সাহায্য চাই রবার্টস, আমাকে একটা স্টেটমেণ্ট তৈরী করতে হবে আজ, এখুনিই। কালই দরকার ওটা।

রবার্টস্ সব কথা শুনে খুশী হয়ে বলে।

—নো প্রবলেম বিজয়। ওসব হয়ে যাবে। আমি আমার আর এক বন্ধুকেও ডাকছি। আমার বিশ্বস্ত বন্ধু। তাকে তুমিও চেনো, তার উপর ভরসা করতে পারো।

ওরা তিনজনেই কাজে নেমে পড়ে।

মিঃ মুলার রবার্টসকে বিদায় করে এবার ভাবছে বিজয়কে তাড়াবার কথা। একটা বিদেশী এসে তার সাম্রাজ্যে হানা দেবে ভাবতেই পারেনি। মুলার এর মধ্যে তার ক্ষেত্র তৈরী করে রেখেছে।

শুধু বিজয় নয় তার ব্যাডবুকে আরও যে কজন আছে যারা তার এই অন্ধকারের খবরটা কিছু কিছু জানে। তাদের সবকটাকেই এবার তাড়াবার পাকাপাকি ব্যবস্থাই করেছে।

এমন সময় মিঃ ফুলটনের চিঠিখানা পেয়ে চমকে ওঠে মিঃ মুলার। তার হুকুমেই এতদিন এই কারখানা চলেছে।

মিঃ ফুলটন তার কোন কিছুতেই অমত করেনি।

আজ এভাবে তার হুকুম বাতিল করে দিতে দেখে চমকে উঠেছে মুলার।

চতুর লোক সে।

বেশ বুঝেছে এভাবে আর চলবে না।

বিজয়ই ওখানে গিয়েছে, তারপরই মিঃ মুলারকে মিঃ ফুলটন এই চিঠি দিয়েছেন। রাগে, অপমানে মুলার যেন ক্ষেপে ওঠে।

তখুনিই ফোন করে মিঃ ফুলটনকে সে।

মিঃ ফুলটন ক্রমশঃ তার আগেকার সেই সত্তাটাকে ফিরে পেয়েছে।

এভাবে ঠকতে তিনি রাজী নন।

তাই মুলারের ফোন পেয়ে মিঃ ফুলটন বলেন।

—আমি যা ভালো বুঝেছি করেছি মুলার। আমি জানি—তুমি আমার অর্ডার মানবে, আর কাল বোর্ড মিটিং ডেকেছি বেলা তিনটায়।

তখন তুমি থাকবে।

মুলারকে আর কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়েই মিঃ ফুলটন ফোনটা নামিয়ে দিলেন। মুলারের কণ্ঠস্বরেই বুঝেছেন মিঃ ফুলটন মুলার কেমন যেন ঘাবড়ে গেছে।

মিসেস ফুলটন বলে – কি বলছিল ও?

মিঃ ফুলটন স্ত্রীর কথায় বলেন – ওর হুকুম কেন মানা হয়নি তাই ফোন করছিল।

মিসেস ফুলটন রেগে উঠেছেন। বলেন তিনি।

—এত বড় সাহস ওর? কারখানার মালিক ভেবেছে নিজেকে?

এখনও তুমি বিশ্বাস করো ও অনেস্ট এ্যাণ্ড শিনসিয়ার? বিজয়কে তুমি বিশ্বাস করো না?

মিঃ ফুলটন বলেন—কাল অবধি দেখতে দাও জুলি? তারপর আমি জানি কি ব্যবস্থা করতে হবে।

বিজয় নিখুঁত ভাবেই সব কাজ করেছে।

রাত্রি হয়ে গেছে। এবার খেয়াল হয়, তার বাড়িতে ফিরতে হবে।

কোম্পানী থেকে একটা ছোট বাসাও তাকে দেওয়া হয়েছে। শীতের রাত্রি। বরফ পড়েছে ক'দিন আগে। এখনও রাস্তায় কিছু বরফ জমে আছে। ম্যাপেল বার্চ গাছের পত্রহীণ ডালগুলো আলোয় যেন হাড়কণ্ঠা বের করে দাঁড়িয়ে আছে।

দু একটা পাইন গাছের সবুজ পাতায় বরফের আস্তরণ। মফঃস্বল সহরের পথ ঘাটে লোক চলাচলও বন্ধ হয়ে গেছে এখন, বিজয় ফিরছে তার বাসার দিকে।

ওর মনে একটা সান্ত্বনা জাগে রবার্টসকে চাকরী ফিরিয়ে দিতে পেরেছে।

কোম্পানীকে একটা চরম বিপদের হাত থেকে বাঁচাতে পারবে।

রাত্রিতে বাড়ি ফিরে ফ্রিজ থেকে পাউরুটি ডিম মাখন চীজ বের করেছে। ওই দিয়েই কোন রকমে রাতের খাওয়া সেরে নেবে। আজ আর ভাত রান্নার করার উৎসাহ নেই।

এখানে ওই এক সমস্যা।

নিজের সব কাজই নিজেকে করতে হয়। জামাকাপড় কাচা-ইস্ত্রি করা ঘর সাফ্ করা, খাবার তৈরী করা, বাসন ধোয়া সবই। মায় শনিবার রবিবার বাগান সাফও করতে হয়। বাড়ির সামনে বরফ পড়লেও গ্লাভস পরে স্যাভেল হাতে সাফ্ করতে বের হতে হয়।

কাজের লোকজনের খুবই অভাব।

আর তাদের মজুরীও আকাশ ছোঁয়া। ঘণ্টায় বারো, পনেরো ডলার তো চাইবেই। অর্থাৎ একদিনে মজুরী দিতে হবে শত খানেক ডলারের মত। ভারতীয় টাকায় প্রায় দেড় হাজার টাকার মত।

বিজয় টোস্ট করছে।

হঠাৎ বাইরে বেলটা বাজতে শুনে এগিয়ে যায়।

এসময় কেউ আসবে তা ভাবেনি। বের হয়েছে সে। হঠাৎ কিছু ভাববার আগেই কে যেন তার উপর লাফিয়ে পড়ে। বিজয়ও এর মধ্যেই ওই শব্দে সরে গেছে ওপাশে।

অন্য লোকটা তাকে ধরে ফেলার চেষ্টা করে। কিন্তু বিজয়ের ধাক্কায় পিছল জমাট বরফের উপর ছিটকে পড়ে সে।

বিজয়ও সেই অবসরে খোলা দরজা দিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকে যেতে চেষ্টা করে। ওরাও ততক্ষণে উঠে পড়েছে। বিজয়ও কোনরকমে কাচের দরজাটা বন্ধ করে দেয়।

ওকে ধরতে না পেরে গুলিই করেছে ওদের একজন।

গুলিটা কাচের দরজা ভেদ করে ছিটকে এসে বিজয়ের বাঁ হাতে লেগেছে। বিজয় ততক্ষণে কাঠের দরজাটা বন্ধ করে ভিতরে এসে ফোন করেছে পুলিশকে।

হাঁপাচ্ছে সে উত্তেজনায়।

ভাবতে পারেনি এভাবে রাতের অন্ধকারে কেউ বাড়ি চড়াও হয়ে তাকে আক্রমণ করবে এভাবে।

রবার্টস্-এর কথা মনে পড়ে।

ওকেও ফোন করে বিজয়।

ততক্ষণে পুলিশও এসে পড়েছে। কাঁচের ভাঙ্গা দরজাটাও দেখে তারা। বিজয়ের হাতে গুলি লেগেছে, তবে আঘাতটা তত গুরুতর নয়। বুলেটটা

হাতের চামড়ার উপর দিয়ে বের হয়ে গেছে।

রবার্টস, মিঃ ফুলটনও এসে পড়েছেন।

ওরাই ওকে হাসপাতালে নিয়ে যায় তখুনিই।

রবার্টস বলে—এভাবে বাড়ি চড়াও হয়ে এই কাজ করতে আসবে কেন? নিশ্চয়ই এর পিছনে কারণ আছে।

মিসেস ফুলটনও বিজয়ের আহত হবার খবর শুনে হাসপাতালে এসেছে। বুড়ি বলে—কারণটা আমি অনুমান করতে পারি বিজয়। তুমি সত্যিকার কিছু ভালো কাজ করতে চেয়েছিলে, যাদের ক্ষতি হবে এতে তারাই এ কাজ করেছিল। গড সেভড্ ইউ।

পুলিশও এবার তৎপর হয়ে ওঠে।

মিঃ মুলার এর মধ্যে সব খবরই পেয়েছে।

ওর নিজস্ব আলমারি থেকেও কিছু জরুরী কাগজ বিল, চেক সব বের হয়ে গেছে। তাতে তার বিপদই হবে। আর বিজয় যে সব করেছে সেটাও জেনে মুলার চেয়েছিল বিজয়কে সরিয়ে দিতে।

তাই গোপনে কয়েকজনকে পাঠিয়েছিল মিঃ মুলার।

ভেবেছিল ওরা যদি কাজটা নিরাপদে শেষ করতে পারে—মুলারের বিরুদ্ধে প্রমাণ পাওয়ার প্রধান অভিযোগকারী আর থাকবে না। তারপর মুলার নিজের সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখার ব্যবস্থা করবেই।

তাই আশা করেছিল এবার বিজয় সরে যাবে।

কিন্তু তা না হতে দেখে এবার সেই-ই বিপদে পড়েছে। পুলিশ নাকি সন্দেহের বশে এখান ওখান থেকে দুতিনজনকে ধরেছে। তাদের মধ্যে কেউ যদি মুলারের নাম করে দেয় বিপদে পড়বে সে।

অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছে।

ওই খবর শুনে যেন ব্যাকুল হয়েই বিজয়কে দেখতে ছুটে এসেছে মিঃ মুলার।

মিসেস ফুলটন ওর সঙ্গে কথাই বলে না।

রবার্টসও দেখছে মুলারকে। মুলার বলে।

—আই এ্যাম সরি বিজয়। কারা এভাবে চুরি করতে ঢুকেছিল? গড সেভড ইউ।

বিজয় চুপ করেই থাকে।

মুলার কোন রকমে দু'চারটে কথা বলে চলে গেল। বেশ বুঝেছে মুলার আজ যেন ওদের কাছে সে অবাঞ্ছিতই।

তবু চলে যাবার উপায় নেই।

এ সময় চলে গেলে হয়তো পুলিশ তাকেও সন্দেহ করবে।

মুলার তাই ডাইরেক্টস মিটিং-এও এসেছে।

নিজেই আগে থেকে কোম্পানীর আর্থিক সংকটের কথা নিয়ে বক্তব্য রাখতে সুরু করে কোম্পানীর হিতৈষী বন্ধুর মত। দুর্যোগে সমাধানের পথও বাৎলায় মুলার। তার প্রথম পথ হিসেবে সে কিছু কর্মচারী ছাঁটাই করতে চায়। তাই করেছিল সে।

মিসেস ফুলটন শুনছেন কথাগুলো।

তার হাতে সব কাগজপত্র, মায় মুলারের ওই সাপ্লাই কোম্পানীর কমিশন বিলের কপিও রয়েছে। এখানের ইউরিয়া এ্যামোনিয়া ট্রাক ভর্তি হয়ে গেছে টেক্সাসের ফার্মে, তার চালানও আছে।

মিঃ ফুলটন বলেন।

—কিন্তু কোম্পানীর ড্রেনেজ হচ্ছে অন্যদিকে। ক্যান ইউ এক্সপ্লেন অল দিস মুলার?

এবার ওর সামনে মিঃ ফুলটন সেই চালান, বিল, কমিশন-এর কপি সব হাজির করে। মুলারের সই, কোনটায় অন্য কারো সই।

মুলার চমকে ওঠে।

এবার তার ফার্মের খবর সবই পেয়েছে ওরা।

ওই বিজয়, রবার্টস যে এইভাবে গোপনে কোম্পানীকে বাঁচাবার জন্য এই কাজ করেছে এতদিন ধরে মুলার তা ভাবতেই পারেনি।

আজ তার সবকিছু ধরা পড়ে গেছে।

তার এতদিনের সাম্রাজ্যে আজ ধ্বস নেমেছে অতর্কিতে।

মিঃ ফুলটন বলেন।

—জবাব দাও মুলার।

মুলার লজ্জায়-রাগে-অপমানে জ্বলছে। ওদিকে বসে আছে মিসেস ফুলটন, মিঃ কেলী আরও দু একজন। এতদিন তাদের সঙ্গে কাজ করেছে মুলার। তারাও তাকে সম্মান করেছে।

কিন্তু আজ ওদের চোখে দেখেছে মুলার ঘৃণার ছায়া। একদিনে ওদের রূপ বদলে গেছে।

মিসেস ফুলটন বলে।

—তোমার জন্য কোম্পানী এত হাজার হাজার ডলার লোকসান করেছে, লোকসানই নয় কোম্পানীকে তুমি চিট করেছো।

মিঃ মুলার-এর মুখ চোখ লালচে হয়ে উঠেছে রাগে অপমানে, তার জবাব দেবার কিছুই নেই। তবু বলে মুলার।

—ব্যবসাতে লোকশান হয়।

মিঃ ফুলটন বলেন—তাই এসব কাগজপত্র ধরা পড়ার আগেই তুমি রবার্টসকে

তাড়িয়ে ছিলে, বিজয়কেও শেষ করার চেষ্টা করেছিলে।

তুমি ঠক্—প্রতারকই নও, খুনীও।

মিঃ ফুলটন বলে।

—পুওর বয়, কোম্পানীকে বাঁচাবার অপরাধে তোমার হিটম্যানদের হাতে শেষ হয়ে যেতো। আমি পুলিশকে সব কথা জানাবো।

ইউ পে ব্যাক দি ম্যানি, বিজয়ের ক্ষতি পূরণ দেবে। না হলে পুলিশ যা করার করবে।

মিঃ মুলার ভাবতে পারে নি এ ভাবে নিজেই এতবড় বিপদে জড়িয়ে পড়বে।

আজ তার বাঁচার কোন পথ নেই।

কাতর স্বরে বলে মুলার—বাঁচান মিঃ ফুলটন। আমি কোম্পানীর লোকসান করিনি, ওটা হয়ে গেছে। আমি এখান থেকে চলে যাবো।

হাসছেন মিঃ ফুলটন ঃ তাহলে এসব করেছো স্বীকার করছো ?

কাগজটা এগিয়ে দিয়ে বলেন মিঃ ফুলটন।

—কনফেস ইট, দেন লেট মি স্যাক্ ইউ। তুমি এখান থেকে চলে যাবে। ভবিষ্যৎ-এ আমার কোন কর্মচারীর গায়ে হাত পড়লে তুমিই দায়ী থাকবে। লিখে দাও। তবেই তোমাকে যেতে দেব। নাহলে আমি পুলিশে দেব তোমাকে।

মিঃ মুলার আজ নিজেকে বাঁচাবার জন্যই ওই সব কথাই লিখে দিল।

খবরটা সারা কোম্পানীর কারখানার অপিসে ছড়িয়ে পড়েছে। এবার যেন কোম্পানী রাহু মুক্ত হয়েছে।

মিসেস ফুলটন হাসপাতালে গেছে বিজয়কে দেখতে।

বিজয়ও কিছু দিনের মধ্যে এই বৃদ্ধ-দম্পতির অনেক কাছে এসে এখানের মানুষের নোতুন একটি রূপ দেখেছে।

এ দেশে এসে দেখেছিল এখানের মানুষের মনের শূন্যতাকে। স্নেহ মায়া বাঁধন যেন কিছুই নেই। কাজের চাপে, অর্থের নেশায় আর ক্ষণিক আনন্দের জন্য এরা সব কিছুকেই হারিয়ে শূন্যগর্ভ হয়ে চারিদিকে দিশাহারা হয়ে ছুটছে।

কিন্তু সর্বত্রই একই। বিমর্ষ ছবিটাই সত্যি নয়।

মানুষ এক জায়গাতে এখনও তার মানবিক বৃত্তি ওই ভালোবাসা, স্নেহকে হারায়নি। আজ সর্বত্রই মানুষ তার সন্ধান করে।

আর পেলে তাকে কৃতজ্ঞ চিত্তে গ্রহণ করে।

মিঃ আর মিসেস ফুলটনকে দেখেছে।

ওদের একমাত্র ছেলে মারা যাবার পরও তাদের সেই মন মরে নি।

ক্রমশঃ ওদের অজানতেই বিজয় তাদের কাছে এসে গেছে।

মিসেস ফুলটন হাসপাতালে আসে রোজ, ফুল আনে। আজ এসে শুধোয় —কেমন আছো বিজয় ?

বিজয় বলে – ভালোই আছি।

বুড়ি বলে—তাড়াতাড়ি সেরে ওঠো, আমরা কাল থেকেই দুজনে কারখানায় বের হচ্ছি। মিঃ মুলার আজ চলে গেল। এবার সামনে অনেক কাজ। বুড়ো বুড়িকে মারতে চাও কাজের চাপে ? তাড়াতাড়ি সেরে ওঠো।

হাসে বিজয়।

মিঃ মুলারকে বিদায় করে এবার নিজেরাই কোম্পানীর ভার নিয়েছে শুনে খুশী হয় সে।

বিজয় বলে কাগজপত্র রবার্টস আনবে, আমি কদিন এখানে বসেই সব দেখে দেব। সেরে উঠেই কারখানাতে যাবো, এখানে ভালো লাগছে না।

মিসেস ফুলটন বলেন এবার।

তা জানি। যে কদিন পারো একটু বিশ্রাম নাও। এরপর তো তোমার আসল কাজ সুরু করতে হবে। আমরা নোতুন প্লান্ট বসাচ্ছি। ইউরিয়ার। এখন বিরাট মার্কেট বাড়ছে। আর কেন জানো ?

বিজয় চাইল ওর দিকে।

মিঃ ফুলটন বলেন—তোমার বুদ্ধির জন্যই এবার আর একটা বিরাট সর্বনাশ থেকে বেঁচে গেছি।

বিজয় চাইল ওর দিকে।

সে হাসপাতালে। ক'দিনের বেশ কিছু পরিবর্তন ঘটে গেছে এখানে কারখানার জগতে।

সারা দেশের মধ্যে এই এলাকাতেই মেডিকেল ফ্যাক্টরীর সংখ্যা অনেক বেশী। এখানের তৈরী ওষুধপত্র হেভি কেমিক্যালস আমেরিকায়, এদেশের বাইরে, ল্যাটিন আমেরিকার বাজার রেখেছিল। এই অঞ্চলের আকাশ বাতাস এই সব কারখানার ধোঁয়ায় বিষাক্ত বাতিল পদার্থের জন্য ক্রমশঃ বিষিয়ে উঠতে থাকে।

এদিকে লোকালয়ও বাড়ছে।

ফলে এবার শুরু হয়েছে বায়ু দূষণের জন্য নানা ধরণের অসুখ, বিসুখ। এই অঞ্চলের মানুষ, সহর কর্তৃপক্ষও এবার তদন্ত করে এতদিন ধরে চেষ্টা করছিল আসল কারণটাকে বের করতে। এবার চেষ্টা করে ওরা আইন করেছে প্রতিটি কারখানার চারিদিকে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ ফাঁকা জায়গা ফেলে রাখতে হবে।

গাছপালা রাখতে হবে। যাতে তাদের পরিবেশ সেই জায়গাটার জন্য দূরে আর বিষিয়ে তুলতে না পারে।

সেই আইনকে এবার কাজে পরিণত করতে চায় তারা।

তাই ওই এলাকার বহু কেমিক্যাল কোম্পানীকে সহর কর্তৃপক্ষ নোটিশ দিয়ে তাদের ওই ব্যবস্থা করতে বলেছে।

কিন্তু অনেকের আর সে উপায় নেই।

জায়গাও আর খালি নেই। সহর বাড়ছে। ঘর বাড়ির সীমানা এসে কারখানার গায়ে ঠেকেছে।

সুতরাং সহর কর্তৃপক্ষের আদেশে তাদের ওই সব হেভি কেমিক্যাল তৈরী করার কাজ বন্ধ করতে হয়েছে। কেউ কেউ তাদের ফ্যাক্টরী আরও দূরে সরাবার কথা ভাবছে, অনেক প্রতিযোগী কোম্পানীর প্রডাকসন বন্ধ।

ফলে বাজারে মালের চাহিদা বেড়ে গেছে, একমাত্র ফুলটন কমিক্যালস্-ই এখন এই এলাকাতে ওই আইনের আওতায় পড়ে নি।

কিছুদিন আগে বিজয়-এর কথা মতই মিঃ ফুলটন ওই মুলারের কথা আগ্রহ্য করে কি খেয়াল বশে কয়েকশো একর বন কিনেছিলেন! আজ তাদের সেই জায়গাটাই বাঁচিয়ে দিয়েছে।

শুধু বাঁচিয়েই দেয়নি, বরং নোতুন করে কারখানা গড়ে তোলার পরম সুযোগও এনে দিয়েছে। মিঃ ফুলটন বলেন।

—তোমার ওই কথা সেদিন না শুনলে বিপদে পড়তাম। আজ কোম্পানীর সব থেকে চালু প্রডাকশন বন্ধ করে দিতে হতো। তুমিই কোম্পানীকে বাঁচিয়েছো বিজয়। কোম্পানী আজ তোমার কাছে ঋণী, আমরাও।

বিজয় চুপ করে থাকে।

আজ ওদের বিপদ মুক্ত করতে পেরেছে সে কথাটা ভেবেও নিজে তৃপ্তি পায়।

মিঃ ফুলটন বলেন।

—তাই আমাদের নোতুন প্ল্যাণ্ট বসাতে হবে। প্রডাকশন বাড়াতে হবে। নাহলে এত অর্ডার সাপ্লাই করা সম্ভব হবে না। সামনে আমাদের অনেক কাজ। আর তাই তোমাকে বেশী করে দরকার।

বিজয়ও ভাবছে কথাটা।

আজ এত বড় কোম্পানীর একটা বিশিষ্ট স্থানে এসেছে সে নেহাৎ ভাগ্যের জন্যই।

একদিন জার্মানী, লিভার পুল, লণ্ডনে ঘুরেছে।

বহু কষ্ট সহ্য করে পরদেশে বাঁচার জন্য লড়াই করেছে। দেশের কথা মনে পড়ে।

বাবা—মা—বৌদি—সাথীর কথা।

ওদের সে জানাতেও পারে নি কত কষ্ট সহ্য করে কত রকম বিচিত্র কাজ করে

সে তার বাঁচার রসদ সংগ্রহ করেছে এতদিন ধরে সেই নির্বান্ধব দেশে।

জানতে পারলে ওরা দুঃখ পেতো।

দেশের মানুষ ভাবে বিদেশে যেই যায় সেই-ই সেখানে রূপার চামচ মুখে দিয়ে ঘোরে। প্রাচুর্য-গাড়ি-বাড়ি সবই পায়। কিন্তু তাদের জীবনের কঠিন সংগ্রামের দিকটা তাদের অজানাই থেকে যায়। ভাবে অনেক আরামেই আছে তারা।

আজ বহু সংগ্রামের পর বিজয় পায়ের নীচে মাটি পেতে চলেছে। তাকে এই মাটিটুকুকে কঠিনতর করে তুলতে হলে আরও কঠিন সংগ্রাম করতে হবে। কাজ করতে হবে।

নাহলে এদেশে মানুষের কোন দাম নেই। কাজ চাই।

বিজয় সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে বের হয়ে কারখানায় যোগ দিয়েছে। রবার্টস্ এগিয়ে আসে—হ্যালো বিজয়, নাউ ও কে? লট অব ওয়ার্ক বিজয়!

মিসেস ফুলটন বলেন।

এবার নোতুন প্ল্যান্ট ইরেকশন, ডেভেলাপমেণ্টের চার্জ নাও বিজয়।

আমাদের ইমিডিয়েট প্রডাকশন শুরু করতে হবে।

ফ্লোরিডা, ক্যালিফোর্ণিয়াতে প্রচুর ফলমূল, শাকবজী হয়। সারা দেশকে খাওয়ায় তারা। টেক্সাস-এ গম-মকাই-এর ফার্ম ভার্জিনিয়ার তামাক সারা পৃথিবীকে যোগান দেয়। তাদের জন্য চাই উৎকৃষ্ট সার। দক্ষিণ আমেরিকারও ফলমূল অনেক। তাদেরও সারের, ইনসেকটিসাইড-এর প্রচুর চাহিদা।

এখন ফুলটন কোম্পানীর সামনে তাই উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ।

বুড়ো বুড়ি আবার কি নেশায়, নোতুন ফ্যাক্টরী গড়ছে।

এদিকে প্রডাকশনও বেড়ে চলেছে।

বিজয়ের সময় নেই।

ভোরেই বের হয়ে যায় গাড়ি নিয়ে। নিজেই গাড়ি চালাতে শিখে গেছে।

এখানে গাড়িটা বিলাসিতা নয়, প্রয়োজন। বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে কাজ, তাছাড়া সহরের বিভিন্ন অফিস দূর-দূরান্তরে ছড়ানো, যাতায়াতের যানবাহন তেমন নেই।

তাই নিজেকেই গাড়ি চালাতে হয়। ড্রাইভারের মাইনেও অনেক।

ভোরে কোন রকমে ব্রেকফাস্ট সেরে বের হয়ে যায় কারখানায়, ওখান থেকে নোতুন প্ল্যাণ্টে কাজে ডুবে যায়।

দুপুরে আবার লাঞ্চ করে অফিসে এসে বসে। তখন সব প্ল্যান প্রোগাম হয়। এছাড়া মিটিং তো আছেই।

সেদিন ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে বাড়ি ফিরে বিজয় ডাকবাক্সে চিঠিটা পায়। বেশ কিছু দিন দেশের চিঠি পায়নি।

বৌদির চিঠি অবশ্য পায় কলকাতা থেকে। তাতে দেশের খবরও থাকে না। কারণ বৌদির জগৎ এখন আলাদা। বৌদিও জানে না খবরটা।

মাঝে মাঝে সাথীর চিঠি আসে, তাও কম আসছে।

মানুষের ধর্ম হয়তো এইটাই।

ক্রমশঃ মানুষ তার পারিবারিক কাজের চাপে, নানা সমস্যায় জড়িয়ে যায় পথ চলতে চলতে। একদিন যে পথ ধরে দুজনে চলেছিল দুজনের সেই পথ ক্রমশঃ দুদিকে সরে যায়।

প্রথমে মনে পড়ে পরস্পরকে।

বিচ্ছেদ ব্যথাটা মনেও বাজে। ক্রমশঃ সেই পথের ব্যবধান যত বাড়ে সেই বিচ্ছেদের বেদনাটাও তত কমে আসে। একদিন হয়তো দূরে সরে যায়;

বিজয় ভেবেছে সাথীও হয়তো স্বাভাবিক নিয়মেই তাকে ভুলে গেছে তার নিজের সংসারের চাপে। বিজয়ের মন তবু তাকে ভোলেনি।

জীবনে সাথী ছাড়াও আরও অনেকে এসেছে।

জার্মানিতে লিজার কথা মনে পড়ে। লিজাও ভালোবেসেছিল তাকে। বিজয়ের নিঃসঙ্গ মন সঙ্গী পেতে চেয়েছিল। কিন্তু সাথীকে।

হারাতে পারে নি সে।

তাই সরে গেছল সেখান থেকেই লিজাকে পিছনে ফেলে। লিভারপুলে দেখেছিল অ্যানাকে। বিচিত্র সেই মেয়েটি তার কাছে আসতে চেয়েছিল। কিন্তু তাকে গ্রহণ করতে পারেনি বিজয়।

লণ্ডনেও দেখেছিল দু'একজনকে।

তাদের নিয়ে বিজয় সে দেশেই ঘর বাঁধতে পারতো। কিন্তু তার মনের সেই জাগরূক সত্বা তাকে সে দেশের বাঁধন ছিড়ে উধাও করেছিল এ্যাটলান্টিকের এপারে।

বিজয় আজ একদিক থেকে কিছুটা সার্থক হয়েছে। ভালো চাকরী, ভালো মাইনে সে পায়। দেশের অংকে বৎসরে কয়েক লক্ষ টাকাই তার রোজকার জমেও অনেক টাকা। কিন্তু সাথী যেন তার মনে একটা গভীর ক্ষত-চিহ্ন রেখে গেছে যেটাকে অনেক চেষ্টা করেও ভুলতে পারে নি বিজয়।

ফোনটা বাজছে।

ফোনের সঙ্গে বাঁক্ষার লাগানো। এদেশে ফোন করার জন্য ফোনের কাছে যেতে হয় না। ফোনের সঙ্গে যন্ত্রটা লাগানো থাকে, একটা ছোট যন্ত্র থাকে পকেটে। তাতেই কথা বলা যায়।

—হ্যালো। বিজয় সাড়া দেয়।

ওদিকে একটা সুরেলা গলায় সুর ভেসে ওঠে।

—জেনিফার বলছি ! কি করছো ?

বিজয় চমকে ওঠে। তাদের অফিসের পাবলিক রিলেশনের সেক্রেটারী। সুন্দরী মেয়েটি মিসেস ফুলটনের নিকট আত্মীয়া। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্রী।

আর এদেশের মেয়েদের মত নয়। শান্ত ভদ্র। বিজয় দেখেছে কিছুদিন থেকে জেনিফারও তার অপিসে কারণ অকারণে আসে। হেসে কথা বলে।

আজ বাড়িতে ওকে ফোন করতে দেখে একটু অবাক হয় বিজয়।

—কি ব্যাপার ?

জেনিফার বলে, খুব বোর ফিল করছিলাম একা একা, তাই ভাবলাম তোমার সঙ্গে একটু কথা বলি।

বিজয় কি বলবে জানে না। বলে—ধন্যবাদ।

হাসছে জেনিফার। বলে সে।

—তুমি বোর ফিল করছো না ? আর কেউ আছে নাকি ওখানে—এনি বডি ?

হাসছে বিজয়। বলে সে—না। সে ভাগ্য আমার নেই। গুড নাইট !

ফোনটা যেন কি আতঙ্কে নামিয়ে রাখে বিজয়।

ওই জেনিফারকেও আজ বিচিত্র বোধ হয়।

বিজয় চিঠিগুলো খুলছে।

হঠাৎ মেজদাদার চিঠিখানায় বাবার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে চমকে ওঠে। বাবা আর নেই। বয়সও হয়েছিল। ক'দিনের জ্বরে ভুগে বাবা হঠাৎ মারা গেছেন মালদহের বাড়িতেই।

স্তব্ধ হয়ে যায় বিজয়।

মনে পড়ে সেই ছেলেবেলার চাঁপাই নবাবগঞ্জের দিনগুলোর কথা। মহানন্দার তীরে বিশাল বাড়ি—সেই মেজদা, বুলু, নিপুদের সঙ্গে কাটানো দিনগুলোর কথা।

মহানন্দার বালুচরে তাদের খেলা, ছায়াঘন আমবাগানে সঙ্গীদের সঙ্গে পাখীর বাচ্ছা ধরা, মহানন্দার বুকে ডিঙ্গি নিয়ে ভেসে যাবার কথা। খেতুদার সঙ্গে বাজারে যেতো।

বাবার সেই রাশভারি গম্ভীর চেহারাটা তার মনে পড়ে বহু দূর থেকে।

সেখান থেকে এসেছিল মালদহে।

বাবার মুখখানা মনে পড়ে। আজ সবকিছু স্মৃতিতে পরিণত হয়েছে। বাবা বেঁচেছিলেন। একদিন মাথা উঁচু করে দেশে ফিরতো বিজয়। কিন্তু বাবা আজ নেই।

দেশের সেই ব্যাকুলতাটাও যেন হঠাৎ হারিয়ে গেছে। একটা বনস্পতির মৃত্যু ঘটে গেল।

কি ব্যর্থ বেদনায় বিজয়ের দু'চোখ জলে ভরে আসে।

খেয়াল হয় বেলটা বাজছে। কে যেন ডাকছে। বিজয় উঠে এসে বাইরে দেখে অবাক হয়।

জেনিফার এসেছে।

দরজাটা খুলে দিতে এক ঝলক খুশীর মত ঢুকেছে জেনিফার।

হ্যালো বয়, হঠাৎ ফোন কেটে দিলে তাই দেখতে এলাম কি ব্যাপার?

কিন্তু বিজয়ের অশ্রু সজল চোখের দিকে চেয়ে অবাক হয় জেনিফার।

—কি ব্যাপার বিজয়? এনিথিং রং?

বিজয় দেশের চিঠিখানা দেখিয়ে বলে।

—দেশের চিঠি পেলাম। বাবা আর বেঁচে নেই।

জেনিফারও চুপ করে যায়। ওর খুশি ভরা ডাগর দুই নীল চোখে কি বিষন্নতার আভাষ জাগে। বলে সে।

রিয়েলি! সরি বিজয়! তোমার বাবা ছিলেন এতদিন। মা-ভাইরা আছেন। আমি বাবা মাকে কবে হারিয়েছি। কেউ নেই।

জেনিফার আরও বলে, এখন কি করবে? দেশে গিয়েই বা কি করবে এখন?

বিজয়ের সামনে অনেক কাজ।

দু'সপ্তাহের মধ্যে তিন সিফটে কাজ করে প্রডাকশন চালু না করলে এত অর্ডারে ক্যানসেল হয়ে যাবে। কোম্পানীর প্রচুর লোকসান হবে।

খবরটা মিসেস ফুলটনও শুনেছেন।

মিঃ ফুলটন চুপ করে কি ভাবছেন। বিজয় জানে ওর ভাবনার কথা। বলে সে—এ সময় দেশে আর গিয়ে কি হবে? যা হবার তাতো হয়ে গেল। বরং এখানে থেকে প্রডাকশন চালু করে দিই। পরে একটু সময় করে দেশে যাবো।

মিঃ ফুলটন বিজয়ের কথায় চাইলেন।

তিনিও এইটা চাইছিলেন সারা মন দিয়ে। কিন্তু ওর বাবার মৃত্যুর খবর শুনে ওকে দেশে ফিরতে বাধা দিতে পারেন নি মানবিক কারণেই। এখন বিজয়কে এই সিদ্ধান্ত নিতে দেখে ওরা দুজনেই খুশী হয়।

বলেন মিঃ ফুলটন।

—এ সময় তোমার উপর কোন জোর করবো না বিজয়। আমিও তোমার দুঃখে সমবেদনা জানাই। তুমি যা ভালো বোঝো করো। তবে এই সিদ্ধান্ত নেবার জন্য আমি এবং আমার এই প্রতিষ্ঠান তোমার কাছে ঋণী। এখন খুবই কাজের সময়—কোম্পানীকে বাঁচাতে পারলে কোম্পানীও তোমাকে নিশ্চয়ই দেখবে।

মিসেস ফুলটন আরও বলেন।

—ইট ইজ আপ টু ইউ বিজয়। এই সিদ্ধান্তের জন্য ধন্যবাদ জানাই।

বরং বাড়িতে এ সময় কিছু টাকা পাঠিয়ে দাও। কোম্পানীই সেটা দেবে তোমার হয়ে।

বিজয় চাইল ওদের দিকে।

কাজ আর কাজ। বিজয়ও যেন নিজের অজান্তে এদেশের কাজের আবর্তে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে।

ওয়ার্ক শেডে কাজ দেখছে বিজয়।

ওদিকের অপিসেও নানা কাজ আছে। হঠাৎ জেনিফারকে আসতে দেখে চাইল। কিছু প্রেসের লোকজনরা এসেছে, টি ভি-র ক্যামেরাম্যানও আছে। ফুলটন কোম্পানীর নোতুন সম্প্রসারণ নিয়ে তারা নিউজ কভার করতে চায়, তাই ওদের এনেছে জেনিফার।

ওই-ই পরিচয় করিয়ে দেয় ওদের সঙ্গে বিজয়ের।

—এন্ এফিসিয়েণ্ট ব্রেন ইন্ দিস ফার্ম।

ওরা বিজয়ের ছবি, ওর ইনটারভিউও নেয়। আজ ফুলটন কোম্পানীর বিরাট সুনামের সঙ্গে বিজয়ের নাম, ছবি আর তার কাজের দৃষ্টিভঙ্গীর কথাও ওরা ছাপাতে চায়।

বিজয় এসব প্রচার চায় নি।

কিন্তু জেনিফার বলে—ইউ ডিজার্ভ ইট বিজয়। তোমার এই কাজের প্রতি নিষ্ঠাকে আমি শ্রদ্ধা করি। ইউ আর রিয়েলি সিরিয়াস। তাই মনে হয় তোমাকে বিশ্বাস করা যায়। আজ কেউ কাউকে আমরা বিশ্বাস করতে পারি না। তাই আমাদের এত সমস্যা। ব্যক্তিগত জীবনেও।

জেনিফার যেন কি ভাবছে!

বিজয় ফিরছে বাড়ির দিকে। জেনিফারই ওকে লিফট দেয় আজ।

বিজয়ের গাড়িটা গ্যারেজে। ক'দিন আগে একটা ছোট খাটো এ্যাকসিডেণ্ট করেছিল।

জেনিফার বলে—ক'দিন গাড়ি চালিয়ো না বিজয়।

বিজয় বলে—তাহলে যাতায়াত করবো কি সে?

জেনিফার কি ভেবে বলে—যদি তোমার আপত্তি না থাকে আমি তোমায় লিফট দেব।

বিজয় দেখছে ওকে।

জেনিফার বলে—আপত্তি আছে নাকি?

বিজয় হাসে—না। আপত্তি করলে তুমি ছাড়বে না তা বুঝেছি।

জেনিফার হাসে। হাসলে ওকে সুন্দর দেখায়।

বলে সে—আমাকে ভয় কবো নাকি?

বিজয় বলে—মেয়েদের বরাবরই আমি ভয় করে চলি।

জেনিফার চাইল ওর দিকে। শুধোয় সে।

—ভয়ের কারণটা জানতে পারি কি? কেউ বোধ হয় তোমাকে দারুণ আঘাত দিয়েছে কোনদিন, না।

বিজয় চুপ করে যায়।

সাথী তাকে আঘাত দেয় নি। সেদিনের পরিস্থিতি সেদিনের তার বেকার জীবনের জন্যই সে আঘাত পেয়েছিল। সাথীর বিরুদ্ধে আজও বিজয়ের কোন অভিযোগ নাই। বলে বিজয়—না। না। আঘাত কেউ আমাকে দেয়নি, যদি দিয়ে থাকে তা আমার ভাগ্য।

জেনিফার বলে—তুমি খুব সিরিয়াস বিজয়। তাই অতীতের কাউকে আজও ভুলতে পারোনি। তোমরা ইণ্ডিয়ানরা প্রেমের ব্যাপারে খুবই সিরিয়াস। তাই তোমাদের সংসারে হয়তো বাঁধন, শান্তি, ভালোবাসা আজও আছে। যা আমাদের এই ছন্নছাড়া জীবন থেকে একেবারে হারিয়ে গেছে।

বিজয় কি ভাবছে।

শীত আসছে। পথের ধারে সবুজ ম্যাপেল বার্চ-এর পাতায় লালচে রং ধরেছে। আগামী শীতের বাতাসে কোথাও হলুদ হয়ে উঠেছে। ঝরছে পাতা গুলো। আপেল গাছে তখন দু-চারটে লালচে বুনো আপেল রয়েছে।

বিজয় শুধোয় জেনিফারকে।

—তুমিও কি ভালোবেসেছিলে কাউকে নাহলে ভালোবাসার সম্বন্ধে এসব তত্ত্ব জানলে কি করে?

হাসে জেনিফার। ওই প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে বলে।

—এটা জানা যায় বিজয়। দেখছি অনেকের জীবনেই। পথে ঘাটে দেখো না—কত ভালোবাসা প্রেমের প্রকাশ। কিন্তু জানবে ওটা বহিরঙ্গই। যে কোনদিন এরা দুজনে দুদিকে চলে যাবে মায় ছেলে মেয়েদের ফেলে রেখেই।

এটা অবশ্য এখনই বেশী ঘটছে, কিন্তু আগে তা ছিল না।

মিঃ ফুলটন, মিসেস ফুলটনকে দেখে সেটা নিশ্চয়ই বুঝেছো। বিজয় ওই দম্পতীকে দেখেছে। ভারতীয়দের মতই নিষ্ঠাভরে ওরা আজও এখানে স্বামী স্ত্রীর ভূমিকা পালন করে চলেছে। কোথায় যেন তাদের হারানো ছেলের জন্য আজও বেদনার গভীর বেদনা রয়ে গেছে। দূর প্রবাসে তাদের একমাত্র সন্তান হারিয়ে গেছে, তাকে আজও ভোলেনি।

বিজয়কে এখন নিউইয়র্ক নিউজার্সির বাঙালী সমাজের অনেকেই চেনে। অসিতদাও আসেন মাসে মাসে।

আজ বিজয়ের উন্নতিতে তিনিও আনন্দিত।

আর প্রায়ই ফোন করে ডঃ রায়। নিউজার্সির ওদিকেই রয়েছে সে।

এখন চাকরী করছে, আর পাকা সাহেব হয়ে গেছে। বলে সে—বাঙালীদের

একদম পাত্তা দিও না বিজয়। হতচ্ছাড়া জাত। কেবল দলবাজি আর হিংসা নিয়ে থাকে। পুজো কমিটি থেকে আমাকে শ্রেফ ক্লিক করে তাড়ালো। কেন জানো ?

বিজয়ের ওসব জানার সময় নেই।

ডাঃ রায় বলে—তোমার প্রশংসা করি তাই। তাহলে আমার ভাইপোটাকে পাঠাই একদিন। তোমাদের কোম্পানীতে ঢুকিয়ে দাও।

ডঃ রায় এরমধ্যে দেশ থেকে তার অনেক আত্মীয়কে এনেছে।

বিজয় বলে—দেখি। এখন তো ভেকেন্সী নেই।

ডঃ রায় বলে—কিন্তু সুবিনয়-এর ভাইকে নিয়েছো শুনলাম। বিজয় ওর খবরাখবর পাবার ব্যাপারে অবাক হয়। তবু বলে সে—সে কেমিক্যাল ইন্‌জিনিয়ার, ভালো ছাত্র তাই নিয়েছি। পরে দেখবো যদি কোন অড জব থাকে।

ডাঃ রায় একটু ক্ষুণ্ন হয় মনে মনে।

জানে বিজয় এবার অন্যত্র গিয়ে ডঃ রায় তার নামে উল্‌টো পাল্‌টা কিছু বলবে।

সেদিন অসিতদা এসে হাজির।

খবরটা শুনে অবাক হয় বিজয়। অসিতদা নিপাট ভালোমানুষ। ওর নামেই ডঃ রায় নাকি মামলা রুজু করেছে।

বিজয় বলে—সে কি! কি হয়েছিল ? এক জায়গার ছেলে আপনারা। অসিত আর বিজয় যাদবপুর থেকেই এসেছে। আগে ওরা ঢাকুরিয়ার কোন স্কুলে পড়তো।

অসিতদা বলে—ছেলেবেলায় ওকে স্কুলে বোঁচা বলে ডাকতাম। একটু রেগেই যেতো। ওর নাকটা বোঁচা ছিল তাই। সেদিন বিজয়ার দিন কোলাকুলি করতে গিয়ে ওকে ওই বোঁচা বলে ডেকেছিলাম সকলের সামনে, আর ও কিনা মামলা করে দিল। মানহানি ক্ষতি পূরণের মামলা—

এখানের লোক মামলাকে সত্যিই ভয় করে। এখানে তুচ্ছ কারণেই এ ওর নামে মামলা করে ক্ষতিপূরণ আদায় করে। রোগীরা ডাক্তারের বিরুদ্ধে প্রায়ই মামলা করে। মক্কেলও মামলা ঠুকে দেয় উকিলের নামে। তার বোকামির জন্য মামলায় হেরেছে সে। এইসব বৃত্তির লোকদের জন্য তাই প্রফেসন্যাল ইন্‌সিওরেন্স' থাকে। ক্ষতিপূরণের টাকা দেবে ইনসিওর কোম্পানী।

কিন্তু ডঃ রায়ের এই বিচিত্র ব্যবহারে অবাক হয় বিজয়। এদিকে বিচারকও বোঁচা শব্দর অর্থ যে খারাপ, গালাগাল এতে মান সম্মান চলে যায় এটা আবিষ্কার করার চেষ্টা করছেন।

বিজয় বলে, আপনি লড়ে যান অসিতদা। ও মামলা টিকবে না, আর ডঃ

রায়কে আমি দেখছি।

ফোন তুলে ডঃ রায়কে বলে বিজয়।

—এসব কি করেছেন? অসিতদার নামে মানহানির মামলা!

ডঃ রায়ও ফুসে যায়।

—ও একটা ইতর!

বিজয় বলে—আপনার ভাইপোর জন্যে একটা কাজের ব্যবস্থা করেছিলাম, কিন্তু মামলা করা দেখে ঘাবড়ে গেছি। যদি আমার নামেই মামলা করেন তাই ওপথে আর এগোচ্ছি না। চাকরীতে অন্য কাউকেই নেব।

ডঃ রায় গলে জল। বলে সে।

—একি বলছ ভায়া! তুমি কৃতি পরোপকারী ছেলে। তুমি যখন বলছো মামলা তুলে নিচ্ছি আজই। ছিঃ ছিঃ এমনি ভাবলে আমাকে।

বিজয় বলে—মামলা তুলে নিয়ে আমাকে জানান। আর ভাইপোকে পরে পাঠাবেন।

ফোনটা রেখে বিজয় বলে।

—ওষুধ দিয়েছি আপনার বোঁচা রায়কে, এবার মামলা তুলতে পথ পাবে না।

হাসে অসিতদা। বলে—বাঁচালি ভাই। ওসব কোর্ট-ঘর ভালো লাগে না।

মামলা ডঃ রায় তুলে নিয়েছে। বিজয় ওর ভাইপোকে চাকরীও দিয়েছে। কিন্তু অলক্ষ্য পথে ডঃ রায়, বাঙ্গালী সমাজে বোঁচা রায় বলেই চালু হয়ে গেল। প্রথম দিকে চটতো, কিন্তু শেষ অবধি ওটাকে মেনেই নিয়েছে সে। বিজয় তার কাজের মধ্যে ডুবে যায়।

দিন-মাস-বছর আসে, প্রকৃতির নিয়মে আসে গ্রীষ্মের দাবদাহের পর আষাঢ়ের ঘনঘোর মেঘের ছায়া। বর্ষা নামে ধূসর পাংশু মেঘ ছেয়ে। শূন্য মৃত্তিকার বুক সবুজ ফসলে ভরে ওঠে।

আসে শরতের মেঘমুক্ত নীল আকাশের নীচে দিগন্তপ্রসারী কাশবনের ক্ষেত। উত্তরী বিছানো দিন, শ্বেত মাঠে সোনা ধানের মঞ্জরী। শিষ দেয় দোয়েল শালিকের দল। বাতাসে আসে শীতের আমেজ। শীতের দিন শেষে আবার আসে কিশলয়, ফুল ফোটার দিন। আসে পলাশ ফুলের যৌবন নিয়ে বসন্ত।

বছরের পর বছর প্রকৃতি আপন নিয়মে তার খেলায় মেতে থাকে। কেউ সেদিকে নজর দেয়, কেউ দেয় দেয়না।

বছরগুলো এমনি নানা বৈচিত্র নিয়ে আসে আবার হারিয়ে যায়। আবার আসে নোতুন বছর।

বনস্পতির গভীরে তার কাণ্ডে বছরের এই বিগত স্মৃতির এক একটি রেখা

পাত করে যায়। বাইরে থেকে তার কোন চিহ্নই থাকে না। তবু এই পরিবর্তন ঘটে।

আর এমনি পরিবর্তন ঘটে মানুষের মনের গভীরেও।

কমলা আজও দিন গোনে। তার নিঃসঙ্গ জীবনে আজও বিজয় হারিয়ে যায়নি।

কমলা এখন পদস্থ কর্মচারী।

সমাজ এবং শ্রমিক কল্যাণ দপ্তরের কিছুটা দায় দায়িত্ব তার উপর। বিজয়ের চিঠিও পায়।

খুশী হয়েছে কমলা। বিজয় সেখানে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে নিজের যোগ্যতা দিয়ে। একটা কারখানার অনেক দায়িত্ব তার উপর।

কমলাও তার চিঠিতে ওদেশের শ্রমিকদের অবস্থা, মাইনে, কাজের রীতির কথা শুনেছে।

এ দেশ থেকে স্বতন্ত্রই।

সেখানে মাইনে ভালোই দেয়। সাম্যবাদের মূল নীতি শ্রমিকের কল্যাণের কিছুটা সেখানে আছে। ইঞ্জিনিয়ার আর শ্রমিকদের মাইনেতে তেমন পার্থক্য নেই।

যে যত শারীরিক পরিশ্রম করবে তার মাইনে তত বেশী, কিন্তু কোন ভবিষ্যতের ব্যবস্থা কারখানায় নেই। কাজ করলে মাইনে, না করলে মাইনে নেই।

আর চাকরীর স্থিরতাও নেই।

সেটা মালিকের মর্জির উপর কিছুটা নির্ভর করে। ভুল করলে, প্রডাকশন কম হলেই বিদায় করে দেবে। কোম্পানীর ক্ষতি হলে কোম্পানী কাজ বন্ধ করে দেবে।

তারপর বেকার শ্রমিকের দায়িত্ব সরকারের। সে সাহায্য পাবে, বাড়ি ভাড়া পাবে, ফুড কুপন পাবে।

এখানে সরকারের দায়িত্ব তত নেই। সবটাই মালিকের উপরই রয়ে গেছে। চাকরীর স্থায়িত্ব, বাসা, তার চিকিৎসা শিক্ষার ব্যয়, ভ্রমণ অবধি বইতে হবে কোম্পানীকে। তার ফলে কোম্পানী লোকসান দিতে দিতে দরজা বন্ধ করে দেয়। শ্রমিক তখন ঝাণ্ডা নিয়ে পথে নামে। তার কোন পথই আর নেই। কমলার মনে সমস্যাগুলো ক্রমশঃ জটিল হয়ে আসে।

তবু বিজয়ের কথা মনে পড়ে। ওর অভিজ্ঞতা দিয়ে যদি এখানে সে কিছু করতে পারে হয়তো নতুন পথে সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত আসবে।

কিন্তু বাবার মৃত্যুর পরও বিজয় দেশে ফিরতে পারেনি। কমলাকেই সে সব কথা জানিয়েছিল। অন্য কেউ ভুল বুঝলে বিজয়ের তত বাজবে না মনে, বৌদি যেন তাকে এ ব্যাপারে ভুল না বোঝে। কমলাও বুঝেছিল তার

অবস্থাটা।

বিজয় লিখেছে—এবার সে একবার দেশে ফিরবে কিছুটা কাজের চাপ সামলে। অনেকদিন দেশে যায় নি। বড় মন টানছে।

আজ কত বছর পার হয়ে গেছে তা জানে কমলা।

তার অন্তহীন পরীক্ষার সেই বছরের হিসাবগুলো কি ভোলেনি সে।

আরামবাগ—বারাসত-এর দিনগুলোর কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে সাথীর কথা। মিঃ দাসগুপ্তকে ফিরিয়ে দিয়েছিল কমলা। আজও তার শূন্যজীবনে সে দিন গোণে কবে বিজয় ফিরবে আবার তার কাছে।

বিজয়ের কাছে তার অনেক দাবী।

কমলার এতদিনের সমস্যা সমাধানের মন্ত্র যেন রয়েছে বিজয়ের কাছেই। তাই তাকেই দরকার।

সাথীরও চিঠি পান নি অনেকদিন।

সাথীও ব্যস্ত। প্রশান্ত অফিস নিয়ে ব্যস্ত। সাথীর নিঃসঙ্গতা বেড়েছে। তার একমাত্র সন্তানও কাছে নেই। কলকাতায় শিবপুরে ইন্‌জিনিয়ারিং পড়ছে। ভালো ছেলে নৃপেন। পরীক্ষাতেও ষ্ট্যাণ্ড করে জয়েণ্ট এনট্রান্স দিয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করে শিবপুরে চান্স পেয়েছে।

দেখতে দেখতে দিনগুলো যেন হাওয়ায় হারিয়ে যায়। সাথীর মনে পড়ে নৃপেনের কথা। বিদেশে রয়েছে। ছেলেকেও কাছে রাখতে পারেনি।

তার স্বামী প্রশান্ত বলে, দিনরাত এত কি ভাবো? কত লোকেরই ছেলে কোথায় দূরে দূরান্তরে রয়েছে। তোমার ছেলেতো দেশেই আছে। কয়েক ঘণ্টার পথ। তার জন্য এত ভাবনা কেন?

সাথীর মনে পড়ে বিজয়ের কথা।

সে আজ কোথায় কতদূরে রয়েছে। তাই আজ নৃপেনকে কলকাতায় রেখে তার এত ভাবনা।

সাথী সেটাকে চাপবার জন্য বলে।

—বা রে! আমি ভাবছি নাকি? চার বছর তো হয়ে গেল, আর দু'বছর পরই আসছে। তুমি বাপু এখানের রেল কারখানাতেই চেষ্টা করো ওর জন্য।

প্রশান্ত হাসে। বলে সে, ওতো কেমিক্যাল ইন্‌জিনিয়ারিং পড়ছে। কলকাতার কাছেই চাকরী নিতে হবে কোন কেমিক্যাল ফ্যাক্টরীতে। অবশ্য আমারও চাকরী শেষ হয়ে আসছে। এবার কলকাতাতে ট্রান্সফার নিয়ে ওদিকেই ফিরে যাব তাই ভাবছি।

সাথীও খুশী হয়। বলে সে।

—তাই করো বাপু। এ দেশে আর ভালো লাগছে না। তাহলে ওদিকে

গিয়ে যদি বোলপুরে বাড়িটা করতে পারি দিব্যি শান্তিতে থাকা যাবে।

প্রশান্তও সেই স্বপ্ন দেখছে। বলে সে, দেখি, সেই চেষ্টাই করছি।

নৃপেন শিবপুরেই হোস্টেলে রয়েছে। পড়াশুনা নিয়েই ব্যস্ত থাকে। এবারও ছুটিতে মায়ের কাছে যেতে মা বলেছিল—কলকাতায় কমলা মাসীমার কথা। ঠিকানাও দিয়েছিল। কিন্তু শিবপুরের একপ্রান্ত থেকে বালিগঞ্জ অনেক দূর পথ।

যাই যাই করেও গিয়ে উঠতে পারেনি নৃপেন।

সেদিন জানতে পারে ওর এক সহপাঠীর বাড়িও বালিগঞ্জের ওই অঞ্চলেই। তাই নৃপেন ওই ঠিকানাটা বলতে তার বন্ধু বলে।

—ওতো আমাদের পাড়ার কাছেই। ম্যাণ্ডোভিল গার্ডেনস্-এর কাছেই। বেশতো এই রবিবার চল। গিয়ে দেখা করে আসবি।

বন্ধুই উপদেশ দেয়।

—রাইটার্স-এর পায়াভারী কর্মচারীদের সঙ্গে জানা চেনা থাকা ভালো বুঝলি, অনেক সময় অনেক কাজে লাগে।

ওর টানেই যেন চলেছে নৃপেন কমলা মাসীর কাছে। আবছা মনে পড়ে ভদ্রমহিলাকে। বোলপুরে থাকতে, জামালপুরেও একবার গিয়েছিল তাদের বাড়িতে।

এতদিন পর তাকে চিনতে পারবে কিনা কে জানে!

তবু কি কৌতূহল বশেই চলেছে নৃপেন।

ট্রামলাইনের ওদিকে বাড়িটা। তিনতলার ফ্ল্যাটে থাকেন কমলা মাসীমা। নীচে নেমপ্লেটও রয়েছে। কি ভেবে নৃপেন উপরে উঠে গেল।

কলিং বেল বাজাতে কাজের মেয়েটি দরজা খুলে দেয়। সে জানে অনেকেই অফিসের কাজে আসে তার দিদমণির কাছে। তার দিদিমণি যে একজন কেউ কেটা তাও জানে সে।

তাই নৃপেনকে বসতে বলে শুধোয়।

—কোথা থেকে আসছেন? কি বলবো ওকে?

নৃপেন বলে, বলো শিবপুর থেকে আসছি। ওর সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই।

কমলা প্রথমে ঠিক বুঝতে পারে না, তাই বাইরের ঘরে এসেছে। পরণে তাঁতের সাদা খোলের একটা শাড়ী, তার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠেছে। মাথার চুলে এবার রুপোলী আভা এসেছে। তাতে যেন ওর ব্যক্তিত্ব আরও ফুটে উঠেছে।

নৃপেন প্রণাম করতে চাইল কমলা।

চমকে উঠে। এ যেন সাধ্বীর মুখই বসানো। এমনি কোমল মুখ, গভীর

চাহনি ভরা দুটো চোখ।

কমলা বলে—তুমি নৃপেন না? জামালপুরের নৃপেন। নৃপেন বলে, হ্যাঁ।

—তবে যে বল্লে শিবপুর থেকে আসছো? কমলা শুধোয়।

নৃপেন বলে, শিবপুর ইন্জিনিয়ারিং-এ পড়ছি, ফোর্থ ইয়ার শেষ হলো। তাই!

কমলা অবাক হয়।

সেদিনের জামালপুরে দেখা সেই ছোট ছেলেটা আজ কত বড় হয়ে গেছে। ইন্জিনিয়ার হতে চলেছে। বছরগুলো কিভাবে তার অজানতে কেটে চলেছে তা খেয়াল করেনি। সেই বর্ষ পারের ছায়াগুলো তাদের মুখে এনেছে পরিবর্তন। চুলগুলোও কখন রুপালী হয়ে গেছে।

নিজের দেহমনের এই দিন বদলের ছায়াটাকে আজ অনুভব করে ওই নৃপেনকে দেখে।

সেদিন আরামবাগে বিয়ে হয়েছিল সাথীর, আজও মনে হয় যেন সেদিনের কথা। এর মধ্যে এতগুলো বছর পার হয়ে গেছে। এসেছে তাদের জীবনে সম্ভাবনাময় আর একটি যৌবন।

এ যেন বিজয়ের কথাই তার স্মরণে আনে।

বিজয় হারিয়ে গেছে দূরে, তার জায়গায় এসেছে নোতুন যৌবন জীবনের সব রূপ রস পূর্ণতা নিয়ে।

কমলার হুঁস হয়, কি যেন ভাবছিল সে।

বলে সে—তোমার মা-বাবা ভালো আছেন? কতদিন ওরা চিঠি দেয় নি।

নৃপেন বলে—দোষ আমারই। প্রতিবার বাড়ি গেলে মা বলে এখানে আসার কথা।

হাসে কমলা—আর পাঁচ বছর পর ছেলের মনে পড়লো মাসীমাকে।

নৃপেন বলে, আসা হয়ে ওঠেনি! দোষ আমারই মাসীমা।

কমলা এর মধ্যে খাবার দিয়েছে।

নৃপেন চমকে ওঠে—এত খাবো কি করে? কিছু কমিয়ে নিন।

কমলা অনেকদিন পর যেন সাথী আর বিজয়কেই অনুভব করেছে। আজ বিজয় বিয়েও করে নি।

তারও তাহলে এমনি কেউ আসতে পারতো। তবু সাথীর জীবনে পূর্ণতা এসেছে। কমলা খুশী হয়েছে।

বেলা হয়ে আসে।

নৃপেন বলে—আজ চলি মাসীমা।

কমলা অবাক হয়—সেকি! খাওয়া দাওয়া করে যাবে। আজ তো ছুটি।

নৃপেন বলে—বৈকালে হোস্টেলে ফিরতে হবে। এখানে এক বন্ধুর কাছেও

যেতে হবে। পরে আবার আসবো।

কমলা বলে—মন দিয়ে পড়াশোনা করো। ফার্স্ট ক্লাস পেতেই হবে।

নৃপেন প্রণাম করে বলে।

—চেষ্টা তো করছি। দেখা যাক কি হয়।

কমলা বলে—আবার আসবে কিন্তু।

নৃপেন চলে গেছে।

কমলা কি ভাবছে। আজ তাদের পর আসবে নোতুন এক যৌবন। সাথী-সে—বিজয় যেন পিছনের সারিতে পড়ে গেছে।

বিজয়ও আজ নৃপেনকে দেখলে হয়তো খুশী হতো।

একদিন তার মত সন্তানও হতে পারতো বিজয়ের। সংসারও। কিন্তু তা হয়নি।

সাথী আর কমলাই যেন বিজয়কে ওই সামান্য শান্তির আশ্রয় থেকে বৃহত্তর অশান্তির জগতেই নির্বাসিত করেছে। এসব কথা তাই বিজয়কে জানায়নি সাথী।

বিজয় জানে না সাথীর ছেলের কথা।

কমলাও জানাতে চায় না। একটা অধ্যায়কে হয়তো ভোলার দরকার। সাথী যখন বিজয়কে ভুলতে পেরেছে, তখন কমলাও আর এসব কথা স্মরণ করিয়ে দুঃখ দিতে চায় না।

বিজয় নিজের জগৎ নিয়েই সুখী থাকুক। মনে হয় কমলার বিজয় যদি সেখানে কাউকে নিয়ে সুখী হতে পারে হয়তো ভালোই হবে।

কমলা তাকে সেই জীবন থেকে বঞ্চিত করতে পারবে না। এই চলমান জীবনে কেউ কোথাও কারোও জন্য বসে নেই। থাকা যায় না। তাই আজ বিজয়ের বঞ্চিত জীবনের জন্য কমলারও দুঃখ হয়। হয়তো একটা ভুলই করছে সে।

বিজয় এখন ক'বছরেই কোম্পানীকে এগিয়ে নিয়ে গেছে অনেকখানি। মিঃ ফুলটনই এখন বিজয়কে কোম্পানীর পার্টনার করে নিয়েছেন। বিজয় এটা চায় নি।

বলে সে—এ আপনার পক্ষে ঠিক হবেনা মিঃ ফুলটন।

মিসেস ফুলটন দীর্ঘ ক'বছরে দেখেছে বিজয়ের কর্মনিষ্ঠা আর বুদ্ধিকে। সারা কারখানায় সে জনপ্রিয়। আর তাদের প্রডাকশন এখন সারা ইউরোপ-আমেরিকা—দক্ষিণ অমেরিকার বাজারে চাহিদা এনেছে। মিঃ ফুলটন বলেন।

—আমরা বুড়ো হয়ে গেছি বিজয়। তোমার উপর বিশ্বাস করতে পারি। দেখেছি ভারতীয়রা সব ব্যাপারে সিরিয়াস, ঈশ্বর বিশ্বাসী। জানি এ

প্রতিষ্ঠানকে টিকিয়ে রাখতে হলে তোমাকে চাই। তাই পার্টনার করে সেই দায়িত্ব দিতে চাই।

বিজয় বলে—এ আপনাদের ফ্যামিলি বিজনেস। এখানে আমাকে আনবেন না।

হাসে বুড়ি। বলে সে।

—তুমি কি ফ্যামিলির বাইরে বিজয়? ইউ আর লাইক মাই সন্। আজ আমার ছেলে বেঁচে থাকলে তোমার বয়সিই হতো।

মিঃ ফুলটন বলেন।

—সেই অন্ধ স্নেহের বশেই তোমাকে আনতে চাইছি না। ম্যানেজমেণ্ট, তোমার যোগ্যতা, কর্মনিষ্ঠা দেখেই এই কথা ভেবেছি। আশাকরি তুমি আমাকে নিরাশ করবে না। ইউ হ্যাভ আর্নড ইট।

বিজয়, আর কথা বলতে পারে নি।

ওরা আইনগত ভাবে বিজয়কে পার্টনার করে নিয়েছেন।

রবার্টস্ এসে পড়ে—কনগ্রেচুলেসন্ সানি।

আরও অনেকেই খুশী হয়েছে ওর এই পদোন্নতিতে।

বিজয়, আজ ওদের কাছে কৃতজ্ঞ। মনে পড়ে বিজয়ের বড়বৌদির কথা।

আজ তার আশীর্বাদ সত্য হয়েছে বিজয়ের জীবনে।

কারখানাতেও আজ নোতুন পার্টনারের সমর্থন বিশেষ পাটির আয়োজন হয়েছে কারখানার কম্যুনিটি হলে।

মিঃ ফুলটন, মিসেস ফুলটনও এসেছেন।

অনান্য অনেক অতিথিরাও এসেছে। কর্মচারীরাও রয়েছে। আজ বিজয়ের জীবনের যেন একটা স্মরণীয় দিন। অতীতে কয়েক বৎসর আগে একটি অপরিচিত তরুণ এসে নিউইয়র্কের আবেগহীন উত্তাপহীন এই পরিবেশে হাজির হয়েছিল ভাগ্য অন্বেষণে।

বিভিন্ন হোটেল, রেস্তেরায় কাজ করছে। কোন অপিসে সামান্য মাইনের চাকরী করে দিন কাটিয়েছে। আর স্বপ্ন দেখেছে একদিন সে প্রতিষ্ঠা অর্জন করবে। বড় হবে।

আজ তার জীবনের সেই স্বপ্ন সফল হতে চলেছে।

একটা কারখানার সে অংশীদার হয়েছে নিজের পরিশ্রমে।

অসিতদাকেও আমন্ত্রণ করছে বিজয়। সুবিনয় এখন এখানে ডাক্তারী পাশ করে কোন হাসপাতালে রয়েছে। সেও এসেছে। এসেছে ডঃ রায়ও।

ডঃ রায় বলে—কনগ্রাচুলেশন্ বিজয়। জানতাম তুমি একদিন বড় হবেই। তোমাকে কেউ আটকাতে পারবে না। আর বাঙ্গালী জাতটাই কর্মবিমুখ! তুমি তার থেকে স্বতন্ত্র।

ডঃ রায় অবশ্য আড়ালে বলে।

—বিজয় নাম্বার ওয়ান তেলবাজ। শ্রেফ তেল দিয়ে ওই ফুলটন সাহেবকে ভিজিয়েছে। ব্যস। কিল্লা মেরে দিল।

বিজয় ওদের এসব কথায় কান দেয় না।

পার্টির ব্যাপার চুকে গেছে।

অতিথিরা ফিরে গেছে। তখনও হলে দু'চারজন রয়েছে। উৎসবের ক্লান্তি নেমেছে।

বিজয় বের হতে গিয়ে চাইল।

জেনিফার তখনও রয়েছে। এতক্ষণ জেনিফারও পার্টির কাজে ব্যস্ত ছিল। এবার বিজয় বলে।

—এখনও যাও নি তুমি ?

জেনিফার এগিয়ে আসে। বলে সে।

—তোমার সঙ্গেই যাবো। গাড়ি আনিনি আমাকে নামিয়ে দিয়ে যাবে।

বিজয় আর জেনিফার ফিরছে।

রাত্রির নির্জনতা নেমেছে। জিনিফার একটা ঘড়ি বের করে বলে।

—ওখানে এটা দিতে পারি নি, এটা তুমি পরবে। আজকের দিনে এটা তোমাক আমার প্রীতি উপহার হিসেবে দিলাম।

বিজয় দেখছে ওকে। ঘড়িটা দেখে বলে।

—এতো অনেক দামী।

হাসে জেনিফার। হাসলে ওর গালে সুন্দর টোল পড়ে।

জেনিফার সুন্দরীই। ওর চোখ মুখে কি নিবিড় প্রীতির ছায়া নামে।

জেনিফার ওর কাছে এড়িয়ে এসে বলে।

—তুমিও কি কমদামী বিজয় ? আমার কাছে তোমার দামও অনেক।

বিজয় দেখছে ওকে।

জেনিফার বলে—তোমার এই কৃতিত্বে আমিও কম সুখী হইনি বিজয়। যোগ্য লোকের হাতেই ফুলটন এই ভার দিয়েছেন।

জেনিফার-এর হাত দুটো ওর হাতে, মেয়েটা হঠাৎ যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে। বিজয়ের মুখখানা কাছে টেনে নিয়েছে সে।

জেনিফারের উষ্ণ নিঃশ্বাস ওর গালে, বিজয়ের সারা মনে কি ঝড় ওঠে।

—জেনি !

হাঁপাচ্ছে জেনিফার। ওর দুচোখ কি আবেশে বুজে আসে।

ভেবেছিল জেনিফার বিজয় তাকে কাছে টেনে নেবে। ওর উষ্ণ ঠোঁট বিজয়ের উষ্ণ ঠোঁটের স্পর্শ পেতে উন্মুখ, আগ্রহী।

কিন্তু তা হয় নি।

বিজয়-এর মনের অতলের ঝড়টাকে সে অনুভব করেছে।

বিজয় জেনিফারের উষ্ণ দেহের ব্যাকুল আমন্ত্রণে সাড়া দিতে পারে না। মনে পড়ে একজনের কথা।

—কি হল বিজয় ?

অবাক হয়ে দেখছে জেনিফার ওকে।

বিজয়-এর মুখে নীরব বেদনার ছায়া নামে। বিজয় কি ভাবছে।

জেনিফার বলে।

—আই এম সরি বিজয়। কোন অন্যায় করেছি ?

বিজয়ও জানে তার মনের দৈন্যের কথা। বলে সে।

—না জেনিফার ? তোমার কোন দোষ নেই।

জেনিফার দেখছে ওকে বিস্মিত চাহনি মেলে।

বিজয়ের জীবনের কোন ব্যর্থতার সন্ধানই সে পেয়েছে। আজ জেনিফার রাগ করে নি. বিজয়ের জন্য হয়তো সমবেদনাই বোধ করে।

গাড়িটা ওর বাড়ির কাছে আসতে জেনিফার শুভ রাত্রি জানিয়ে নেমে গেল। বলে জেনিফার।

—সাবধানে যেও ! এত কি ভাবো কে জানে !

বিজয় বাড়ি পেঁৗছেছে। ফোনটা বাজছে।

বোধ হয় কারখানার কোন জরুরী ফোনই হবে। মাঝে মাঝে তাকে নির্দেশের জন্য ফোন করে ওরা।

বিজয় ফোনটা তুলে জেনিফারের গলা শুনে অবাক হয় ?

—তুমি !

জেনিফার বলে—ঠিক মত পেঁৗছেছো তো ?

মাঝে মাঝে যে তোমার কি হয় কে জানে। এত কি যে সমস্যা তোমার জানি না। আমাকেও বলতে পারবো না ?

বিজয় চুপ করে থাকে। কি ভেবে বলে সে।

—আমার জন্য হঠাৎ এত ভাবতে শুরু করলে যে ?

জেনিফার-এর কথাগুলো শোনা যায় না। হয়তো সেও ভাবছে।

বলে জেনিফার—সেটা আমিও ভাবছি বিজয়। জানি না হঠাৎ আমারও কি হয়ে গেল। গুড নাইট বিজয়।

বিজয় ফোনটা নামিয়ে রাখে।

জেনিফারের মনেও ঝড় উঠেছে।

আজ সেও ভাবছে বিজয়ের কথা। কিছু দিন থেকেই জেনিফার যেন মনের অতলে একটা আকর্ষণ অনুভব করেছে। আজ ফেরার সময় ক্ষণিকের জন্য নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিল। কিন্তু দেখেছে বিজয়ের মনে কোথায় যেন একটা বাধাই রয়ে গেছে। সে সাড়া দিতে গিয়েও পারেনি।

বিজয়ের মনের অতলে হয়তো কোথাও একটা বেদনাই রয়ে গেছে। জেনিফারকে ও সেটা বলেনি বিজয়। হয়তো বলতে তার কোথাও বেধেছে।

ওর মত সিরিয়াস ছেলে বোধ হয় সহজে কোন দৈহিক সম্পর্কে আসার রাজী নয়।

তাই এড়িয়ে গেছে।

জেনিফারের মনে তাই সেই প্রশ্নটা রয়ে গেছে।

বিজয় আর জেনিফারের ঘনিষ্ঠতার খবর মিসেস ফুলটনের কাছে গোপন থাকেনি, বুড়ি দেখেছে ওদের দুজনকে একত্রে।

জেনিফার ওর সম্পর্কে নাতনী হয়। বুড়ি এ দেশের ছেলেদের দেখেছে। দু'চারদিন ভালোবাসার নামে ঘর বেঁধে সেই ঘর সহজেই ভেঙে ওরা দুজন দুদিকে সরে যায়। এদের ভালোবাসাটা যেন চোখের নেশা। অন্তরের কোন সায় থাকে না।

বিজয়ের মত ছেলের সঙ্গে তাই জেনিফারকে মিশতে দেখে বুড়ি অমত জানায় নি।

সেদিন বুড়িই কথাটা বলে বিজয়কে।

বিজয় একটু অবাক হয়।

মিসেস ফুলটন বলে—জেনিফার মেয়ে হিসেবে খুবই ভালো বিজয়। খুব সিরিয়াস ধরণের। আরও পাঁচজন আমেরিকান মেয়েদের মত ও হাল্‌কা নয়। যদি তোমরা রাজী থাকো বিয়ে থা করো।

বিজয় ভাবেনি—কথাটা এভাবে মিসেস ফুলটনই তাকে বলবে। আজ বিয়ে করার সামর্থ তার আছে' আর জেনিফারও ভালো মাইনে পায়। দুজনের ঘর বাঁধায় বাধা নেই।

কিন্তু বিজয় একথা ভাবেনি। জেনিফারকে তারও ভালো লাগে। মেয়েটি সুন্দরী, কিন্তু সংযত। উদ্ধত নয়। ওর স্বভাবে কোথায় একটা স্নেহশীলতা নম্রতা রয়েছে। কিন্তু বিজয় তাকে বিয়ে করার কথা ভাবেনি।

তাই মিসেস ফুলটনকে একথা বলতে দেখে বিজয় বলে—এসব কথা কিন্তু আমি ভাবিনি। জেনিফার-এর সঙ্গে পরিচয় আমার আছে। কিন্তু কোন সম্পর্ক গড়ার মত তেমন কিছুই নয়। বন্ধুত্বের সম্পর্কই আছে আমাদের।

মিসেস ফুলটন দেখছে বিজয়কে।

বিজয় যে সত্যি কথাই বলেছে এটাও বিশ্বাস করেন মিসেস ফুলটন।

মিসেস ফুলটন একটু অপ্রতিভের স্বরে বলে।

আমিই এমনি বলছিলাম কথাটা বিজয়। অবশ্য এটা তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। এতে আমার কোন কথা বলা উচিত নয়।

বিজয় বুড়ির কথায় বলে।

—না, না। একথা বলার অধিকার তোমার আছে। তুমি আমার মায়ের মতই। এতে আমি কিছু মনে করিনি। তাই যা সত্যি সেই কথাটাই তোমাকে জানালাম।

বুড়ির চোখ ছল ছল হয়ে ওঠে বিজয়ের মুখে ওই মাতৃত্বের কথা শুনে। মনে হয় তার ছেলের কথা।

সে বেঁচে থাকলে আজ বিজয়ের বয়সীই হতো।

বার বার সেই দূর প্রবাসে হারানো ছেলের কথা মনে পড়ে।

বিজয় বলে—তাহলে আসি?

বুড়ি মাথা নাড়ে মাত্র।

ওর মনের অতলের সেই ঝড়টাকে আজ যেন বিজয় আবার নোতুন করে জাগিয়ে দিয়েছে ওই মাতৃ সম্বোধন করে, তাদের ছেলের জন্মদিনও এগিয়ে আসছে।

সামনে মার্চ মাসেই তার ছেলের জন্মদিন?

বিজয় বের হয়ে নিজের প্লাণ্টে এসেছে।

কাজের ভিড়ে আর মনে নেই সেই কথাগুলো। ক'বছরেই নোতুন প্ল্যাণ্ট চালু হয়ে গেছে।

ওদিকে একাউণ্টস্-এর কাজও দেখতে হয়।

সব সেরে বের হতে তখন রাত্রি হয়ে যায়।

শীতের রাত্রি নামে। চারিদিকে বরফ পড়ছে।

গাছপালা বরফে ঢেকে গেছে। অপিসটা অবশ্য গরম করা থাকে হিট দিয়ে। বিজয় জেনিফারকে দেখে চাইল।

কাজ সেরে সেও যেন তার জন্যই অপেক্ষা করছিল।

জেনিফার এসে ওর গাড়িতে উঠলো।

বিজয় দেখেছে মাঝে মাঝে জেনিফার এই কাজই করে।

আর বুড়ির কাছে বোধ হয় এমনি সব খবর কেউ পোঁছে দিয়েছে, তার ফলে আজ বুড়িও এইসব কথা বলেছে তাকে।

জেনিফারকে তাই যেন আজ এড়াবার চেষ্টা করেছিল বিজয়।

কিন্তু বেপরোয়া মেয়েটি নিজেই যেন কোন সহ-যাত্রিনীর দাবী নিয়েই তার গাড়িতে এসে উঠেছে।

নিজেই শুধোয় জেনিফার—কি ব্যাপার! চলো। বাড়ি যাবে তো?

বিজয় গাড়িটা ষ্টার্ট করে বের হয়।

জেনিফারের চোখে মুখে দুষ্টুমির আভাস ফুটে ওঠে।

শুধোয় জেনিফার—আজ বুড়ি দিদিমা কি বল্লো? বুড়ির নজর কিন্তু সব দিকেই। ঠিক ধরে ফেলেছে।

বিজয় বলে ওঠে—দয়া করে তুমি আমাকে নিশ্চিন্তে থাকতে দেবে ?

মিসেস ফুলটন আজ তো লাইফ হেল্ করে দিয়েছিল।

বলে কিনা জেনিফার ভালো মেয়ে—

হাসছে জেনিফার খিল খিল করে।

বিজয় গাড়ি থামিয়ে ওকে দেখছে। অসহায় কণ্ঠে বলে বিজয়।

—আমি তোমার কোন ক্ষতি করেছি, বলো তো ?

জেনিফার বলে—কোন মেয়ের ক্ষতি তুমি কোনদিনই করতে পারবে না। বরং ভয় হয় কোন মেয়ে বোধ হয় তোমার চরম ক্ষতিই করে গেছে। যার জন্য আজও তুমি সেই স্মৃতির বোঝা বয়ে বয়ে চলেছো। নিজের জীবনকে শূন্য করেই রেখেছো।

বিজয় দেখছে ওকে।

জেনিফারের চোখের চাহনিতে কি যেন সমবেদনার ছায়া।

আজ বিজয়ও ভাবে সাথীর কথা। সেই স্মৃতিই তাকে আজও ব্যাকুল করে তোলে। সব মেয়ের মধ্যে সে যেন সেই সাথীরই সন্ধান করেছে।

কিন্তু ব্যর্থ হয়েই সরে এসেছে।

একদিক থেকে বিজয় সেই নিঃস্বই রয়েছে। সেটা জেনিফারের কাছেও আজ ধরা পড়ে গেছে।

বিজয়ের মনে হয় মানুষের জীবনে প্রেম একবারই আসে। প্রেম যেন শতদলপদ্মের মতই! একবার জীবন থেকে রূপ রস বর্ণ সব কিছু আহরণ করে তিলে তিলে সে পদ্মের মত পুষ্ট হয়ে বিকশিত হয়। সব সুষমা, ঐশ্বর্যে প্রকৃত ভালোবাসে সেই একবারই, সেই একজনকেই।

তারপর তাকে হারিয়ে সেই প্রেমের শতদল ব্যর্থ বেদনায় বিবর্ণ হয়ে ঝরে পড়ে। থাকে কিছু স্মৃতির সুরভি। বাকী জীবন ভরে সেই স্মৃতির অনুকরণ তুলে বার বার সে খুঁজে ফেরে সেই নারীকে নানারূপের মাধ্যমে।

কিন্তু ব্যর্থ হয় সেই অন্বেষণ। সে শূন্যতা থেকেই যায়।

রাত্রি নেমেছে।

হিটারের ষ্টিম-এর একটানা শব্দ ওঠে। ঘরটা নিস্তব্ধ। জেনিফার আর বিজয় বসে আছে।

আজ বিজয় জেনিফারকে জানিয়েছে সেই সাথীর কথা, তাদের ভালোবাসার ব্যর্থ কাহিনী। জেনিফারের নীল চোখের সায়েরে কি তুফান জাগে। ওর রুপালী গুচ্ছ চুলে আলোর স্নিগ্ধতা। ওর নরম সুন্দর মুখে বেদনার ঘন ছায়া নামে।

জেনিফার বলে—সেই মেয়েটিকে আজও ভোলোনি বিজয়।

আমিও ভেবেছিলাম একদিনের বেদনাই তোমাকে আজ এক জায়গায় নিঃসঙ্গ

করে রেখেছে।

তোমাকে জোর করবো না বিজয়। এ মিসেস ফুলটনের কথা নয়। আমার কথাই বলছি। এমন প্রেমকে আমিও শ্রদ্ধা করি। যদি কোনদিন কাছে ডাকো সেদিন আমি নিজেকে ধন্য মনে করবো। তার জন্য—ব্যাকুল হয়ে থাকবো।

আর না হলেও তোমাকে বন্ধুর মত পাওয়াও ভাগ্যের কথা। আশা করি সেটুকু থেকে আমাকে বঞ্চিত করবে না। এর বেশী দাবীও কোনদিন করবো না।

বিজয় দেখছে ওকে।

ওর নরম হাতখানা বিজয়ের হাতে কি উষ্ণতা এনেছে।

আজ বিজয় এদেশের কামনার বন্যার মাঝেও কি যেন ভালোবাসার পবিত্র একটি রূপকে দেখেছে।

মনে হয় মানুষের অন্তরে এখনও সৎ—ভালো কিছু রয়ে গেছে। আজকের সভ্যতার নির্মম কাঠিন্য তাকে সব জায়গাতে হত্যা করতে পারেনি।

জেনিফার বলে, রাত্রি হয়ে গেছে। গিয়ে আবার রান্না করতে হবে তোমাকে, তার চেয়ে যা আছে চলো খেয়ে যাবে।

বিজয় আজ অমত করতে পারে না।

জেনিফার ঘরের মেয়ের মতই আজ দু'জনের খাবার সাজিয়ে বসে। বিজয়ও নিশ্চিন্ত হয়েছে। আজ জেনিফার তাকে ভুল বোঝেনি।

কারখানার কাজও ভালোভাবেই চলেছে। কোম্পানীও এখন অনেক সুনাম বাড়িয়েছে।

মিঃ ফুলটনও আগে ভেবেছিলেন কথাটা। এবার তাই মিসেসের মুখে সেই কথা শুনে চাইলেন তিনি। মিসেস ফুলটনের বহুদিনের ইচ্ছা ছিল সেই দূর দেশে গিয়ে ছেলের জন্মদিনে ছেলের কবরে ফুল দেবে। সেদিন ওর কবরের পাশে গিয়ে প্রার্থনা করবে সেইখানে।

এতদিন সে সুযোগও আসেনি। সময়ও পায় নি।

বিজয়-এর মুখে ক'বছর আগে সেই হাসিমারার খবরও নিয়েছিল।

এবার বলে মিসেস ফুলটন তার মনের কথাটা।

একবার চলো সেই হাসিমারায়। জনের জন্মদিনে সেখানে যেতে চাই।

মিঃ ফুলটন স্ত্রীর কথায় বলেন—বেশতো। বিজয় ওখানেরই ছেলে। হাসিমারাও চেনে ও। ওকেও বলছি। ও চলুক কিছুদিনের জন্য আমাদের সঙ্গে।

তাই মিঃ ফুলটন আজ কথাটা জানান বিজয়কে।

বিজয়-এর আজ মনে পড়ে দেশের কথা। দীর্ঘ দিন—বহুকাল প্রায় পঁচিশ

বছর সে দেশ ছাড়া। একটি তরুণ সেদিন দেশ ছেড়ে বোম্বাই-এ কোন ইতালির জাহাজে চেপে পাড়ি দিয়েছিল, সেই জাহাজের কেবিনের কথা মনে পড়ে। আশীষ, মলয়রা কে কোথায় আজ ছিটকে পড়েছে। বড় ভাইয়াকে দেখেছিল লন্ডনের কোন পার্ক-এর বাইরে মাতাল অবস্থায়।

ইতালী হয়ে জার্মানী, সেখানের সেই রাইড-এর দিনগুলোর কথা মনে পড়ে। কারখানার সেই সঙ্গীদের কথা। ফ্রাউলিন জুলির কথা, সেখান থেকে ওয়েলস্, তার পর লিভারপুল, যেখান থেকে লণ্ডনে নশা সেনের আশ্রয়ের কথাও ভোলে নি।

মনে পড়ে নশা সেনের কথা।

পিতৃতুল্য সেই মানুষটির একান্ত ইচ্ছা ছিল দেশে ফিরে কিছু করবে দেশের মানুষের জন্য। তরাই-এর সবুজ প্রান্তরে একটা ডেয়ারি করবে, ছোট্ট একটা ঘর বাঁধবে।

কিন্তু সেই উদ্দেশ্য তার পূর্ণ হয় নি। ও বার বার বলেছিল বিজয়কে —দেশের মানুষের জন্য কিছু করবে বিজয়? বড় হলে তাদের কথা ভুলো না।

বিজয় আজও যেন নশা সেনের কথা মনে করতে পারে।

আজ মনে হয় বিজয়ের, দেশে কিছু একটা করার চেষ্টা করবে সে। তখন মিঃ ফুলটনকে রাজীও করাতে পারে। ফুলটন কেমিক্যালস্-এর সেও একজন পার্টনার।

তার দেশে কেমিক্যাল ফ্যাক্টরী করতে পারলে ব্যবসা ভালোই চলবে। তাদের তৈরী জিনিষ পৃথিবী বিখ্যাত, দেশে তারা কম দামে সেই সব মাল তৈরী করতে পারবে। বেশ কিছু লোকের উপকারও করা যাবে। নশা সেনের কথাগুলো ভোলেনি সে।

ভোলেনি বউদির কথা। বউদি বার বার বলতো, বড় হয়ে দেশে ফিরে ওখানের মানুষের জন্য কিছু করবে এই জ্ঞান দিয়ে।

বিজয়ও ভেবেছে কথাটা।

নশা সেনের স্ত্রী এলিজাবেথ সেনের চিঠি মাঝে মাঝে পায় বিজয়।

মিসেস সেন ইংলণ্ডের পাট তুলে আবার জার্মানীর ডুসেলডর্ফের কোন নির্জন গ্রামে ফিরে গিয়েছেন। আজও নিঃসঙ্গ মিসেস সেন বিজয়কে চিঠি দেন। বলেন মিঃ সেনের শেষ স্বপ্নের কথা। আর কেউ তা পূর্ণ করতে পারে নি, বিজয় যদি করতে পারে তিনি সুখী হবেন।

ওখানের এখন চিফ মিনিস্টারও চেনেন তাকে।

বিজয়ও শুনেছে তাঁর কথা। নশা সেনের ডেরাতে থেকেই তিনিও বিলেতে পড়াশোনা করেছেন। সুতরাং সরকারী সহযোগিতা পাবে। তা ছাড়া বৌদিও সাহায্য করতে পারবে।

বিজয় সবদিক ভেবে মিঃ ফুলটনকে বলে।

চলুন। আরও একটা কাজ করতে চাই। আপনার ছেলের স্মৃতিও থাকবে জড়ানো।

বলো। মিসেস ফুলটনই বলে কথাটা।

বিজয় বলে—ওখানে সরকারের সহযোগিতা পাওয়া যাবে। আমাদের একটা ফ্যাক্টরীও করতে চাই সেখানে। লেবার সেখানে চীপ্,—সস্তা। প্রডাকশন কস্টও কম পড়বে। ভারতের বাজারও আমরা পাবো সহজেই। ওর লাভের কিছু অংশ দিয়ে জনের স্মৃতিতে একটা হাসপাতালও করতে চাই ওখানে।

মিঃ ফুলটন খুশী হন। জীবনে অনেক পয়সাই পেয়েছেন তিনি। এবার ওই প্রস্তাব শুনে বলেন।

কারেকট। কিন্তু এসব তো অনেক ঝামেলার কাজ, এর ভার নেবে কে? অন্তত প্রথমে কিছুদিন থেকে কারখানা তৈরী করে, চালু করতে হবে।

মিসেস ফুলটন বলেন।

—আমাদের দু নম্বর প্ল্যান্ট তো বিজয়ই করেছে; ও পারবে।

মাস ছয়েকের মধ্যে কাজ শেষ করতেই হবে। তারপর বিজয় চলে আসবে ওখানের প্ল্যান্ট চালু করে।

মিঃ ফুলটনও ভাবছেন কথাটা।

বলেন তিনি ওকে—তাহলে বিজয় তুমি লিখে দাও ওখানে যাতে জমি, অন্য ব্যবস্থা তারা করতে পারেন। আমরা গিয়ে লোকাল সার্ভে করে এগোতে পারবো।

ফুলটন দম্পতি এভাবে সাড়া দেবেন তা ভাবতে পারেনি বিজয়।

আজ তার স্বপ্ন সফল হতে চলেছে। বিজয় এতদিন পর আজ বৌদিকে বিস্তারিতভাবে লিখেছে তার পরিকল্পনার কথা। কবে নাগাদ যাচ্ছে ওরা তাও জানিয়েছে।

জেনিফারও ওদের এয়ারপোর্টে তুলে দিতে এসেছে। নিউইয়র্ক সহরের এক প্রান্তে আটলান্টিক-এর ধার ঘেঁসে হল কেনেডি এয়ার পোর্ট। এদিকে ওদিকে সমুদ্রের খাঁড়ি, কিছু পাইন বন। এই এয়ারপোর্ট তৈরী হবার আগে সহরের কাছে ছিল ল্য গারডিয়া এয়ারপোর্ট এখন গারডিয়া এয়ারপোর্ট থেকে আমেরিকার বিভিন্ন প্রান্তে প্লেন যায়। এটা ডোমেষ্টিক এয়ারপোর্ট।

আর আন্তর্জাতিক এয়ারপোর্ট হয়েছে কেনেডি এয়ারপোর্ট। ব্যস্ত এয়ার-পোর্ট। সামনে বিস্তীর্ণ পার্কিং অঞ্চল। ওদিকে গাছের প্রহরা। এখানের আকাশ বাতাস গাড়ি প্লেনের শব্দে মুখর।

বিজয় দেশে ফিরছে আজ।

দীর্ঘ কতদিন পর আজ ঘরছাড়া একটি মানুষ দীর্ঘ সংগ্রাম করে জীবনে

প্রতিষ্ঠিত হয়ে ফিরছে। সেখানে কিছু করতে পারবে।

মিঃ, মিসেস ফুলটনও চলেছেন সঙ্গে।

বিজয় জেনিফারের দিকে চাইল।

জেনিফারের নীল চোখে বেদনার আভাষ।

আজ যেন মনে হয় তার আপনজনই চলে যাচ্ছে। জেনিফার বলে।

—আবার ফিরে আসবে তো বিজয়!

বিজয় দেখছে ওকে। বলে সে।

—হ্যাঁ জেনিফার ওখানের কাজ শেষ হলেই ফিরবো।

জেনিফার বলে—তোমার পথ চেয়ে থাকবো বিজয়। কোন দাবী আমার নেই। তবু মনে হয় তোমাকে পাশে না পেলে আমার অনেক কিছুই হারিয়ে যাবে।

বিজয়ের হাতখানা ওর হাতে। চমকে ওঠে বিজয়।

হঠাৎ ওই ডাগর নীল চোখের দু'বিন্দু উষ্ণ চোখের জল ঝরে পড়ে ওর হাতে।

এরাও চোখের জল ফেলে।

জেনিফার-এর চোখের জল আজ বিজয়কেও চকিতের জন্য আনমনা করে তোলে। বিজয় ওকে কাছে টেনে নিয়েছে আজ। বলে—তোমার জন্য ফিরবো আবার জেনিফার। চলি।

জেনিফার আজ দেখছে ওকে। বিজয় চলে গেল ভিতরে, তখনও জেনিফার দাঁড়িয়ে আছে। দুচোখে ওর কি নীরব ব্যাকুলতা। কিছু পরেই এয়ার ইণ্ডিয়ার বিরাট জাম্বো জেটটা সগর্জনে নীল আকাশে উঠে এ্যাটলাণ্টিকের উপর দিয়ে উড়ে চলেছে দূর আকাশে। আর দেখা যায় না সেই চলিষ্ণু বিন্দুটাকে। বিজয়ও দূরে আকাশে কোথায় হারিয়ে গেল।

ছায়াসবুজ চা বাগানের মধ্য দিয়ে ট্রেনটা চলেছে শিলিগুড়ি ছাড়িয়ে। একদিকে সবুজ বনঢাকা হিমালয়ের ঘনবনের বুক চিরে কোন নদীর ব্রিজ পার হয়ে চলেছে ট্রেনটা হাসিমারার দিকে।

তোর্ষা পার হয়ে চলেছে।

মিঃ ফুলটন দেখছেন এই সবুজ পাহাড় সীমা ঘেরা সুন্দর দেশকে। বলেন তিনি—ভেবেছিলাম আমাদের দেশই সুন্দর। কিন্তু দেখছি বিজয়, প্রকৃতি এখানেও কৃপণ নয়। সুন্দর দেশ, তাই এ দেশের মানুষও সুন্দর সহজ ও সরল।

এখানের মানুষকেও দেখেছেন। সব কিছুই শান্ত। সহজেই তৃপ্ত এরা। বাইরে থেকে মনে হয় আমেরিকার তুলনায় এ অত্যন্ত গরীবের দেশ। অভাব,

এদের নিত্যসঙ্গী।

এদেশে এসে কিন্তু ক্রমশঃ মনে হয়েছে মিঃ ফুলটনের অভাববোধটা অনেকটা কল্পনা প্রসূতই। এখানের মানুষ সেই চাহিদাটাকে একটা সীমার মধ্যে রাখতে পেরেছে। প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতাটা অনেক কম। সহজ সরল জীবনযাত্রাকে আজও এরা শ্রদ্ধার চোখে দেখে।

ট্রেনটা এসে থেমেছে হাসিমারায়।

বিজয় ওখানে কোন চা কোম্পানীর সাহায্যেই ওখানের টি-প্ল্যান্ট'স ক্লাবে থাকার ব্যবস্থা করেছে। গাড়িও পেয়েছে।

ষ্টেশনে নেমে মালপত্র তুলতে যাবেন মিঃ ফুলটন, বিজয় বলে এখানে তার দরকার হবে না।

কুলিও পাওয়া যায়। সেই-ই মালপত্র নিয়ে গাড়িতে তুলে দেয় সামান্য কিছু পয়সার বিনিময়ে।

বিজয় বলে।

ক্লাবে গিয়ে একটু রেষ্ট নিয়ে বের হবো।

দ্বিতীয় যুদ্ধের সময় থেকেই এখানে বিস্তীর্ণ অঞ্চল নিয়ে ব্যারাক—ক্যান্টনমেন্ট গড়ে উঠেছে। এখন ভারত সরকারও সেই এলাকাকে আরও উন্নত করেছে। গড়ে উঠেছে বিরাট ক্যান্টনমেন্ট। ছাউনি। আর্মি ষ্টোর ওদিকে। পাহাড়ের কোল ঘেঁসে বিরাট রাণওয়ে।

চারিদিকে কর্মব্যস্ততা চলেছে এই মিলিটারী ছাউনিকে ঘিরে।

এদিকে গড়ে উঠেছে বসতি এলাকা। সুন্দর পার্ক।

ছোট ছোট বাড়ি বাগান। বিজয় এসব আগে দেখেনি।

দীর্ঘ পচিশ বছর আগে যে দেশকে ছেড়ে গেছল সে, এই পঁচিশ বছরে সেই দেশটাও বসে নেই। সেও নিজেকে নোতুন করে গড়ার চেষ্টা করেছে।

শিলিগুড়ি থেকে গড়ে উঠেছে বিরাট কংক্রিকেটর ল্যাটারাল রোড। বরাবর আসামের প্রান্ত অবধি চলে গেছে। বড় বড় নদী তখন ছিল উদ্দাম উত্তাল।

এখন ব্রিজের বাঁধনে বাধা পড়েছে।

যে পদ্মা বাংলাকে দু'ভাগ করে রেখেছিল, সেই পদ্মার উপর বিরাট ব্যারেজ করে জলাধারাকে নিয়ন্ত্রিত করা হচ্ছে, ব্রিজ হয়েছে। এখন আর উত্তরবঙ্গ থেকে যাতায়াতের কোন দুর্গমতা নেই। মালদহ কলকাতার কাছে এসে গেছে।

দূর পল্লী অঞ্চলে গেছে বিজলির লাইন।

ছোট খাটো কারখানাও গড়ে উঠেছে অনেক। শিলিগুড়ি আজ বিরাট সহর। ব্যবসা কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। সেই সভ্যতার আলো এসে পড়েছে এই দূর অঞ্চলেও।

বিজয় যে দেশকে ছেড়ে গেছল সেদিন, আজ সেই দেশের অবস্থাও বদলে

গেছে, আরও বদলাবে।

মিঃ ফুলটন বলেন, এই ডেভেলাপিং দেশেই ব্যবসা ভালো চলবে বিজয়। আর ভারতের পররাষ্ট্র নীতিও প্রতিষ্ঠিত, তার ঐতিহ্য, সংস্কৃতির উপর তার নীতি সহাবস্থানের। তাই বিশ্বের বহু দেশের উপর তার নৈতিক প্রভাব পড়তে বাধ্য, সুতরাং তোমার দেশ এগিয়ে যাবেই তাই হয়তো অনেক দেশ নানাভাবে বাধা দেয়। কিন্তু সে বাধা তুচ্ছ করে এ দেশ এগোবে বিজয়।

অনেকের ঐশ্বর্য আছে, কিন্তু প্রাণ নেই। মানবিকতাবোধ নেই, আত্মিক শান্তি নেই। তোমাদের তা আছে। তাই শান্তির সন্ধান একদিন সকলকে ভারতবর্ষই দেবে।

বৈকাল নামছে।

ক্যাম্পের একজন কমান্ডিং অফিসার ওদের পরিচয় পেয়ে জিপে করে ওদের নিয়ে চলেছে পাহাড়ী বনের দিকে। ওখানেই মহাযুদ্ধের সময়ে মৃত্যু হয়েছে কিছু সৈন্যের। কবরও আছে ওখানে।

শান্ত ছায়া ঘন পরিবেশ। কবরের জায়গাগুলোকে আজও এরা সাফ সুতরো করে বাগান করেছে। শীতের শেষ—তবু হিমহাওয়া বয় এখানে চারিদিকে। গোলাপ—ডালিয়া—চন্দ্রমল্লিকা আরো কত সযত্নে গড়ে তোলা ফুলের বাহার।

ওদিকে একটা ছোট ঝর্ণা বয়ে চলেছে কুলু কুলু শব্দে, পাখীদের কলরব ওঠে শান্ত নির্জন বনে। সামনে উঠে গেছে হিমালয়ের একটা বনঢাকা পাহাড়। শাল বনে এসেছে নোতুন পাতার সমারোহ।

কবরের উপর ঝরে পড়ে গুলঞ্চ ফুলের রাশি। দূর কোন দেশ থেকে তারা এখানে এসেছিল ঘর বাড়ি আপনজনদের ছেড়ে, আর দেশে ফেরে নি।

পরম শান্তিতে প্রকৃতির বুকে আজ তারা চিরনিদ্রায় শায়িত আছে। এদেশের মানুষ তাদের বিশ্রামের কোন ব্যাঘাত ঘটায় নি।

খুঁজছে ওদের ছেলের সমাধি।

একটা ফলকে লেখা আছে—

ক্যাপ্টেন জন টমসন—ফ্লাইট অফিসার।

বর্ণ ইন বোস্টন—ইউ. এস-এ

বাকী লেখাগুলো পড়া যায় না।

কবরের উপর ঝরে পড়ে আছে গুলঞ্চ ফুলের রাশি, মিসেস ফুলটন আজ দীর্ঘ পথ পার হয়ে এসেছে তার ছেলের কাছে, যে এদেশের মাটিতেই চিরনিদ্রায় মগ্ন।

হাতের ফুলগুলো রেখে দেয় সমাধির উপর।

টুপি খুলে বসেছেন মিঃ ফুলটন। বিজয়ও দাঁড়িয়ে আছে। ক্যাম্প-

কমান্ডারও মৃতের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার জন্য টুপি খুলেছে।

বৈকালের আলো মুছে আসছে। ঘরে ফেরা পাখীদের কলরব ওঠে। পাহাড়ের আড়ালে সূর্য ডুবে গেছে। আবছা আঁধার নামছে শান্ত এই ঘুমের দেশে।

মিসেস ফুলটনকে বলেন মিঃ ফুলটন।

চলো সানি। সন্ধ্যা নামছে। লেট জন্ রেস্ট ইন পিস।

ওরা ফিরছে। মিঃ ফুলটন বলেন।

কবর স্থানটাকে সুন্দর কি করে রেখেছে!

কমান্ডিং অফিসার বলে—মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো আমাদের কর্তব্য স্যার।

মিসেস ফুলটন বলে।

শুধু মৃতের প্রতিই নয়, মানুষের প্রতি তোমাদের এই শ্রদ্ধাও দেখেছি অফিসার। এদেশে না এলে অনেক কিছুই অদেখা, অজানা থেকে যেতো। বিজয়—উই আর গ্রেট ফুল টু ইউ। এদেশটাকে আরও দেখতে চাই। জনের প্রতি তোমাদের দেশের মানুষও শ্রদ্ধা করেছে, আমরা খুশী হয়েছি বিজয়।

মিঃ ফুলটন বলেন—তাই ওর স্মৃতিতে হাসপাতাল, কারখানা গড়তে চাই। গড়া দরকার।

বিজয় বলে—কলকাতায় গিয়ে এবার ওসব কাজ সুরু করবো। কলকাতা, শান্তিনিকেতন, রামকৃষ্ণ মিশন এসবও দেখাবো তোমাদের। দেখলে ভালো লাগবে তোমাদের।

পথে আমার শহর পড়বে, ওই দিকেই একবার দেখে যাবো।

শিলিগুড়ি থেকে গাড়িতে ফিরছে তারা কলকাতার দিকে। গাড়িতে না ঘুরলে দেশকে চেনা যায় না।

মালদহ সহরে এসে ওদের সার্কিট হাউসে রেখে বিজয় এসেছে তাদের বাড়িতে।

ক'বছরে সহরের রূপও বদলেছে। পুরোনো সহর বাড়ছে, ওদিকে কলেজ—কয়েকটা স্কুল, হাসপাতালও গড়ে উঠেছে। তাদের সহরের এই দিকটায় বিশেষ পরিবর্তন হয় নি।

তাদের বাড়ির সামনের জায়গায় নোতুন একটা বাড়ি তুলেছে মেজদা, বাড়িটা বড় দেখাচ্ছে অনেক।

মা বিজয়কে বুকে জড়িয়ে ধরে—ফিরে এলি বিজয়!

আজ বিজয় ঘরে ফিরেছে দীর্ঘ সময় পরে।

একদিন পঁচিশ বছর আগে এক সন্ধ্যার অন্ধকারে নীরবে সে বিদায় নিয়েছিল, আজ বিজয় বিজয়ীর মত ফিরেছে।

মা বলে—আবার চলে যাবি না তো রে ?

বিজয় বলে, না মা কয়েকমাস ধরে, কিংবা বছর খানেক থাকতে হবে এখানে, কলকাতায়। মাঝে মাঝে বাড়ি আসবো।

মেজদা, সেজদাদের সঙ্গেও দেখা হয়।

তারা এখন সংসারী মানুষ। ছেলে মেয়ে হয়েছে। নোতুন সেই অতিথিদের দল বিজয়কে দেখেনি।

তার নামই শুনেছে। আজ দূর কোন নক্ষত্রলোকের মানুষ দেখার কৌতুহলী চাহনি মেলে তারা দেখছে বিজয়কে।

বিজয়ও যেন আজ তাদের কাছ থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। দাদারা বলে।

দেশে এখন অনেক ঝামেলারে! ভাবছিলাম ডুতন পাশ করলে তোর ওখানেই পাঠাবো। বাড়ি টাড়ি ভালোই করেছিস শুনলাম, গাড়িও করেছিস।

বিজয় দেখছে ওদের।

ওদের কাছে আমেরিকা দেশটা স্বপ্নের দেশ। ওখানে গেলেই যেন আকাশ থেকে ডলার ঝরে পড়ে। দুধ অমৃত সহজেই মেলে। ওরা সেখানের জীবনের হাড়ভাঙ্গা কঠিন পরিশ্রম, আর নিঃস্ব নিঃসঙ্গ জীবনের যন্ত্রণাকে জানে না।

অনেকেই সেই মোহে ওদেশে গিয়ে আর ফেরার পথ খুঁজে পায় নি, শুধু মাত্র বেঁচে থাকার পাথেয় সংগ্রহ করতে সর্বস্ব বিসর্জন দিয়ে কলুর চোখ বাঁধা বলদের মত ঘানি টেনে চলেছে।

অবশ্য যোগ্য—কৃতি ছেলের প্রতিভার দাম সেখানে আছে, কিন্তু সেটাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হয় অতি কঠিন শ্রমের মাধ্যমে। নিজের দীর্ঘ জীবনের সংগ্রাম মুখর দুঃসহ জীবনের কথা ভোলেনি বিজয়।

ওসব কথা ভোলাও মুস্কিল।

এরা এখনও যুক্তিবাদী নয়, ভাবপ্রবণই রয়ে গেছে। তাই ওসব প্রসঙ্গ না তুলে বিজয় বলে।

এখানেই দেখি যদি ওদের জন্য কিছু করা যায়। কলকাতাতে থাকছি, পরে জানাবো।

ওরা খুব খুশী হন না এদেশে থেকে কিছু করার কথা শুনে। ওদেশে না গেলে নাকি পারিবারিক ইজ্জৎও বাড়ে না।

দুপুরটা বাড়িতে কাটিয়ে বের হয়ে এল বিজয়।

সার্কিট হাউস থেকে মিঃ ফুলটনদের গৌড়-এর ধ্বংসাবশেষ দেখাতে যাবে বৈকালে। কাল ভোরে রওনা দেবে কলকাতার দিকে।

কয়েকশো বছরের গড়ে ওঠা সভ্যতা এই আমেরিকায়। এদের অতীত

ইতিহাস বলতে তেমন কিছু নেই। তাই গৌড়ের সেই দূর অতীত ইতিহাসের জগতে ফিরে গিয়ে এরা বিস্মিত হন।

বড় সোনা মসজিদ, গৌড়ের সেই স্থাপত্যকলার ভগ্নাবশেষ, বিচিত্র রং টালির মিনার, কাজ করা মিনার, প্রাচীর ঘেরা সেই অতীত জগৎকে দেখে বলেন মিঃ ফুলটন।

তোমাদের দেশ অনেক ইতিহাস সমৃদ্ধ বিজয়। এ যেন এক হারানো জগৎ।

বিজয় বলে।

কাল আপনাকে ইতিহাস-এর ঠাঁই মুর্শিদাবাদ নিয়ে যাবো ফেরার পথে।

মিসেস ফুলটন বলেন।

খুব খুশী হবো। তোমার দেশ—এখানের মানুষকে যত দেখছি ততই বিচিত্র বোধ হচ্ছে। সার্কিট হাউসের বুড়ো চৌকিদারকে দেখলাম স্নান করে কাজের অবসরে গড়কে পূজো করছিল। তোমরা বোধ হয় সব সময়েই সব কাজে ঈশ্বরকে ডাকো, না?

বিজয় বলে—তাই। সেই কারণে অন্যায় কাজ করতে এদের বিবেকে বাধে।

কমলা বিজয়ের ফেরার চিঠি পেয়ে খুবই খুশী হয়েছে।

এর মধ্যে সে কাজ কিছুটা এগিয়ে রেখেছে। এখানের সরকারও চান এদেশে কল কারখানা আরও গড়ে উঠুক। তার জন্য সব রকম সাহায্য তারা করবেন।

কিন্তু বিজয় এখনও আসেনি।

ওর আসার কথা দু-একদিনের মধ্যে। কমলার মনে হয়, বোধহয় বিজয় কোন কারণে আসতে পারে নি। এদিকে সেও মন্ত্রীদের বলে রেখেছে। বিজয় যদি না আসে অপ্রস্তুতে পড়বে সে।

তার চেয়ে আরও বেশী করে দুঃখটা বাজবে তার মনে। অনেক বড় আশা নিয়ে সে বিজয়ের পথ চেয়ে আছে।

বিজয়ের জয়ীর মত দেশে ফেরাটা কমলার কাছে সবচেয়ে বেশী কামনার, স্বপ্নেরও। সেই স্বপ্ন নিয়েই সে এতদিন পথ চেয়ে ছিল নিজের সবকিছু বাসনা কামনাকে বিসর্জন দিয়ে। আজ বিজয় যদি না আসে তার সব স্বপ্ন ও সাধ ব্যর্থ হয়ে যাবে। তার ফেরার দিন পার হয়ে গেছে।

ভাবনায় পড়েছে কমলা। কাজেও মন বসে না।

বেলটা বাজছে।

এর আগেও কমলা নিজে এসে দরজা খুলেছিল। যদি বিজয়ের কোন খবর আসে। কিন্তু আসেনি সে।

এসেছিল অন্য কোন উমেদার। কমলা তাদের হটিয়েছে।

বেলটা বাজছে। কাজের লোকটি দরজা খুলে বসিয়ে ভিতরে খবর দেয়।

—এক ভদ্রলোক এসেছেন।

কমলার দেখা করার বাসনাও নেই। বলে সে।

—বলগে, দেখা এখন হবে না। কাল সকালে আসতে বলগে।

বিজয় কলকাতায় ক'দিন আগে প্লেন থেকে নেমেছিল, তারপরদিনই জনের জন্মদিন। ওরা সেই তিথিতে ওর কবরে যেতে চান, তাই আর কলকাতা ঢোকা হয়নি, এয়ারপোর্ট থেকেই বাগডোগরার প্লেন ধরে ওরা সেইদিনই শিলিগুড়ি চলে যায় বৈকালে।

হাসিমারা হয়ে মালদহ ঘুরে আজ সকালেই পৌঁচেছে। মিঃ ফুলটনদের চৌরঙ্গী এলাকায় হোটেলে তুলে একটু রেস্ট নিয়েই বের হয়ে এসেছে বিজয় বৌদির ঠিকানায়।

ভেবেছিল বৌদি এতদিন পর তাকে দেখে অবাক হবে। প্রতীক্ষা করছে সে। কিন্তু লোকটাকে বের হয়ে আসতে দেখে চাইল।

একাই এসেছে সে। বৌদি আসে নি। লোকটি বলে।

দিদিমণি আজ ব্যস্ত, বললেন কাল সকাল আটটায় আসতে। আজ দেখা হবে না।

—সেকি! বিজয় চমকে ওঠে। শুধোয় সে- আমার নাম বলেছিলে? বলো—নিউইয়র্ক থেকে বিজয়বাবু এসেছেন।

লোকটার কাছে এসব পরিচয়ের যেন কোন দামই নেই। সে বলে।

দিদিমণি কাল আসতে বল্লেন।

কমলা চুপ করে বসেছিল। মনটা ভালো নেই তাই কারোও সঙ্গে দেখা করতে চায় নি। হঠাৎ ওপাশের ঘর থেকে বিজয়ের নাম শুনেই চমকে ওঠে কমলা। ওই কণ্ঠস্বর তার চেনা।

আজ দীর্ঘ পচিশ বছর পর বিজয় ফিরে এসেছে।

কমলা কোন রকমে শাড়িটা গায়ে জড়িয়ে চটিটা পায়ে গলিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে।

—বিজয়—বিজু! তুমি!

বিজয় হতাশ হয়েই ফিরছে। নামছে কে সিঁড়ি দিয়ে! হঠাৎ পিছনে ওই ডাক শুনে চাইল।

কমলাও দেখেছে তাকে। বিজয়কে দেখে আজ উচ্ছ্বসিত হয়ে নামছে কমলা। বিজয়ও ছুটে যায় উপরের দিকে।

প্রণাম করার অবকাশও পায় না। কমলা ওকে কাছে টেনে নিয়েছে পরম স্নেহে কি আবেগে উত্তেজনায় কাঁপছে তার সারা দেহ।

—তুমি এসেছো বিজু ! জানতাম তুমি আসবে একদিন। আমার আশা ব্যর্থ হবে না।

বৌদির দু'চোখে আনন্দের অশ্রু নামে।

বিজয়ের গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে—ওকে দেখেও যেন আশা মেটেনা। বিজয়ও ভাবতে পারেনি দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে একজন এমনি করে তার জন্য পথ চেয়ে আছে।

মায়ের কথা মনে পড়ে। মা আর বৌদি এই দুইজনকে যেন আজ এক গোত্রের বলেই মনে হয়।

বিজয় বলে—আজ তোমার কথামতই ফিরে এসেছি বৌদি। এবার এখানেই আমাদের কোম্পানীর একটা কারখানা করতে চাই। দিল্লীর ক্লিয়ারেন্সও পেয়েছি। বলো এখানের সরকার কি কি করতে পারেন আমাদের জন্য।

কমলা বলে—ওসব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। এখন সুস্থ হয়ে বসে চা-টা খাও। দুপুরে খেয়ে বের হবো রাইটার্স বিলডিং-এ। মন্ত্রীর সঙ্গে এ্যাপয়েণ্টমেণ্টটা করে নিচ্ছি।

বিজয় বলে—আমাদের চেয়ারম্যানও এসেছেন সস্ত্রীক। হোটেলে আছেন।

কমলা বলে—বেশতো, তাদেরও নিয়ে নোব। এখন বলো—বিদেশে কেমন ছিলে ? একাই আছো না আর কেউ জুটে গেছে।

বিজয় দেখছে বৌদিকে।

সেই সলজ্জ প্রথম দেখা মেয়েটি আজ সংগ্রাম করে নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে। চোখে মুখে বয়সের ছাপ, কালো চুলে রুপালী রেখা নামছে। ওর রুপকে যেন আরও মহিমাময়ী করে তুলেছে। বিজয় বলে।

ওসব হলে আর কেউ না জানুক তুমি জানতে বৌদি। আর ওসব ব্যাপারে জড়াবার সময়ও পাইনি। পঁচিশ বছর ধরে বাঁচার লড়াই করতে করতে নিজের কথাও ভুলে গেছি।

আজ আর সময় কই বলো ? আর ওসব ঝামেলায় নাইবা জড়ালাম, এই বেশ আছি।

বিজয়ের দিকে চাইল কমলা।

ওর কথার আড়ালের বেদনার সুরটাকে দেখেছে সে। জানে কমলা বিজয়ের মনের শূন্যতার কথা। কমলাও তার জন্যই আজ সারা জীবন শূন্যতা মেনে নিয়েই চলেছে। এ কথাটা বোধ হয় বিজয় জানে না।

জানাতেও চায়না কমলা।

কমলা ভেবেছিল বিজয়ই সাথীর কথা তুলবে। কিন্তু বিজয়কে ওসব কথা না তুলতে দেখে সেও চুপ করে যায়।

কমলা বলে—ওসব সংগ্রামের কথা পরে শুনবো। নাও, আগে কিছু খেয়ে

নাও। স্নান সেরে তাড়াতাড়ি করেই বের হবো। তুমি হোটেলে ওদের তৈরী থাকতে বলো! ওদের সঙ্গেও পরিচয় হবে।

বিজয় বলে—ওরাও খুশী হবেন। দেখবে তোমারও ভালো লাগবে ওদের। বুড়োবুড়ি আমাকেও খুব ভালোবাসেন।

কমলা বিজয়ের কাছে শুনেছে মিঃ ফুলটন দম্পতীর কাহিনীটা। ওদের একমাত্র সন্তান এদেশের মাটিতে রয়ে গেছে, আর দেশে ফেরেনি। ওরা এসেছে তার কবরে শ্রদ্ধা জানাতে। এদেশের মাটির সঙ্গে কোথায় যেন তাদেরও একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।

কমলাকে দেখে ওরাও খুশী হন।

মিসেস ফুলটনকে বলে বিজয়—আমার বৌদি, মায়ের মতই স্নেহ করেন আমাকে।

মিসেস ফুলটনও শোনেন কমলার জীবনের কথা।

সেই কোন অতীতে স্বামী মারা যাবার পর আর বিয়ে-থা-সংসার করেনি। সেই স্মৃতি নিয়েই রয়েছে, আর মায়ের মত স্নেহ শাসন দিয়ে মানুষ করেছে বিজয়কে।

নিঃস্বার্থ এই ত্যাগকে ওরা ওদেশে দেখেন নি।

দেখেন মিঃ ফুলটন ওকে।

মিসেস ফুলটন বলেন—তোমাদের জীবন যাত্রাকে শ্রদ্ধা করি বিজয়। আজ মনে হয় তোমার এইসব গুণগুলো কেন এসেছে তোমার মনে; ইউ আর লাকি। যে এমনি একটি মহিলাকে প্রথম জীবনে দেখেছিলে।

কমলা বলে।

বিজয়ও লাকি যে ওই দেশে তোমাদের মত মানুষের বিশ্বাস ভালোবাসা পেয়েছিল মিসেস ফুলটন, নাহলে ওর কি হতো কে জানে!

মিসেস ফুলটন খুশী হয়। তবু বলে সে হাসতে হাসতে।

কিন্তু বিজয় বড় একরোখা। এইবার ওকে বেশ ভালো একটা মেয়ে দেখে বিয়ে দিয়ে দাও, না হয় বলো আমিই ওকে বিয়ের জোয়ালে জুড়ে দিই।

হাসছে বিজয়। বুড়ি ফুলটন বলে।

নো জোক! চলো তাহলে জেনিফারের সঙ্গেই কথা পাকা করে দিই। সি ইজ এ গুড গার্ল।

চুপ করে কমলা শুনছে কথাগুলো।

বিজয় এই প্রসঙ্গে এড়াবার জন্য বলে।

রাইটার্স-এ যেতে হবে, চলো বৌদি। কলকাতায় শুনেছি যখন তখন রাস্তাঘাট জ্যাম হয়ে যায়। সময়মত পৌঁছতে পারবো না। কমলাও বেশ বুঝেছে বিজয় এই প্রসঙ্গটা এড়াতে চায়। ওরা বের হলো।

কমলা আগেই কাজ এগিয়ে রেখেছিল। তাই বিভাগীয় মন্ত্রীর সঙ্গে কথাবার্তা এগিয়ে যায়। সেক্রেটারীও রয়েছে।

বিজয় ওদের প্ল্যান প্রোগ্রাম দেখিয়ে বলে।

আমাদের ক্যাপিটাল, আমরাই কারখানা তৈরী করে নেবো। সরকার তার অংশীদার থাকবেন। তারা জায়গা, ইলেকট্রিক কানেকশন, ওয়াটার কনেকশন করিয়ে দেবেন।

সরকারের তার থেকে কোন অমতও নেই। জায়গার ব্যবস্থাও ওরা করেছেন, কল্যানী না হয় দুর্গাপুরে জায়গা দেবেন তারা। দুর্গাপুর একটু দূরে হয়ে যায়, তাই বিজয় বলে।

আমরা কল্যাণীকে পছন্দ করছি। তাহলে কালই জায়গাটা দেখে এসে প্ল্যান করে নামতে হবে। যাতে ছ'মাসের মধ্যেই ফ্যাক্টরী চালু করতে পারি সেই ব্যবস্থাই করতে হবে।

মিঃ ফুলটনও বলেন, সিওর। আমি ফিরে গিয়েই যন্ত্রপাতি শিপমেন্ট করে দেব। উই মাস্ট দি ওয়ার্ক. ছ'মাসের বেশী টানলে খর্চা অনেক বেড়ে যাবে।

কমলাও অবাক হয় ওদের এই কম সময়ে ফ্যাক্টরী তৈরী করে প্রডাকশন চালু করার কথা ভাবতে দেখে। এখানে এসব করতে বছর বছর পার হয়ে যায়। সরকারী অফিসে ফাইল চালাচালি করে, ব্যাংক লোন পেতে গোটা বছর ঘুরে যায়। তারপর আছে কাজের ব্যবস্থা করা। এসব করে ফ্যাক্টরী তৈরী করতেই দু' বছর পুরো কেটে যায়। মন্ত্রীও অবাক হয়ে যান।

—ছ'মাসের মধ্যে পারবেন।

বিজয় বলে—আপনারা লাইসেন্স ইস্যু করে দিন, বাকী সব কিছু আমরা করে নোব ওই সময়ের মধ্যে।

মিঃ ফুলটন বলেন—উই আমেরিকানস্ ওয়ার্ক ফার্স্ট। বিজয়, কালই চল সাইটটা দেখে এসে ফাইন্যাল প্ল্যান করে আমাকে দেশে ফিরে এসব ব্যবস্থা করতে হবে। টাইম ইজ সর্ট।

নোতুন কল্যানী বাইপাশ দিয়ে ওদের গাড়িটা চলেছে। বিজয় এসব রাস্তা তখন দেখেনি। ভি, আই. পি, রোডও দেখেনি সে। মনে হয় দীর্ঘ এই ক'-বছরে এদেশের রূপও বদলাচ্ছে।

আশপাশে অনেক ছোটবড় কারখানা গড়ে উঠেছে।

কল্যানীকে আজ নোতুন করে গড়ার চেষ্টা চলেছে। ওদিকে রেলষ্টেশন, দূরে সবুজ গাছপালা ঢাকা সহর, এদিকে বিরাট প্রান্তর জুড়ে সুরু হয়েছে বেশ কিছু কলকারখানা।

লাইন-এর ধারে তাদের জন্য জায়গার ব্যবস্থাও হয়ে গেছে। বেশ খানিকটা

জায়গা। মিঃ ফ্লটন দেখে খুশী হন।

—নাইস প্লট অব ল্যাণ্ড। ইউ ক্যান মেক এ নাইস প্ল্যাণ্ট বিজয়। এদিকে কারখানা, ওপাশে এ্যাডমিনিসট্রেটিভ অফিস, ওদিকে ষ্টোর। আর দূরে কোয়ার্টার। একটা রেষ্ট হাউসও হবে।

ম্যানেজারস্ বাংলো থাকবে অন্যদিকে।

কমলা দেখছে ওদের কর্মপন্থা, ওখানে দাঁড়িয়েই বিজয়ও এরিয়ার একটা রাফ স্কেচ করে প্ল্যানটা ছকে নেয়।

মিঃ ফ্লটন আর একটু এদিক ওদিক করে বলেন।

—এর একটা কপি আমাকে দিয়ো সন্ধ্যায় আজ ওটা নিয়ে গিয়ে ফাইন্যাল করে নোব ওয়ার্কস ইন্‌জিনিয়ারের সঙ্গে। ফাইন্যাল প্ল্যান নিয়ে রবার্টস আসবে, টু ষ্টার্ট দি ওয়ার্ক। ও কে ?

সব যেন ওরা যন্ত্রের গতিতে করে চলেছে।

ফিরছে ওরা কলকাতার দিকে। কালই মিঃ ফ্লটনরা ফিরে যাবেন দেশে।

মিসেস ফ্লটন বলে কমলাকে।

—তোমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুব খুশী হয়েছি। বিজয় রইল দেখো। কমলা বুঝেছে বুড়ির বিজয়ের প্রতি স্নেহের কথা। তাই ওর জন্য ওর ভাবনা দেখে বলে কমলা।

—আপনি নিশ্চিন্তে যান। বিজয়ের জন্য ভাবতে হবে না।

বুড়ি বলে—তা জানি। আর একটা কথা—

কমলা চাইল ওর দিকে। বুড়ি বলে।

—ওকে বুঝিয়ে বলো, বিয়ে থা করতে। আমি বলেও পারিনি। মানুষকে একদিন, থিতু হতে হয়। আমি পারিনি—তুমি বল্লে বুঝবে।

কমলা কি ভাবছে।

বিজয়ের জীবনের সেই ব্যর্থ ইতিহাসটাকে সে জানে।

আজ মনে হয় পৃথিবীটা অনেক নিষ্ঠুর। সাথীও আজ বিজয়কে ভুলে গেছে নিশ্চয়ই।

তাদের খবরও পায় নি কমলা।

তার ছেলে নৃপেনও অনেক দিন আসেনি। জামালপুরে চিঠি দিয়েছিল কমলা, সে চিঠিও ফিরে এসেছিল। ওরা নাকি জামালপুরেও আর নেই।

সাথীও সংসার নিয়ে শান্তিতেই আছে কোথাও।

আজ বিজয় শুধু তার শূন্য জীবনের বোঝা বয়ে চলেছে নীরবে, কমলাই বিজয়ের জীবনে এই পূর্ণতা, সার্থকতা আনতে গিয়ে এক দিক থেকে তাকে নিঃস্ব করেছে।

কমলা মিসেস ফ্লটনকে বলে।

—আমি চেষ্টা করবো।

—গুড! মিসেস ফুলটন যেন আশ্বস্ত হয়।

সন্ধ্যায় প্রেস কনফারেন্স ডেকেছে বিজয়। হোটেলে ব্যাঙ্কুয়েট হলে প্রেসের অনেকেই, রাইটার্স এর দু'চারজন, কয়েকজন মন্ত্রী, চেম্বার অব কমার্সেরও দু'-চারজন মাতব্বর এসেছেন।

বিজয় সেখানে তাদের পরিকল্পনার কথা জানায়। এদেশেও তারা কারখানা করে কমদামে ভালো ওষুধ কিছু দিতে চায়, হেভি কেমিক্যালস্‌ও বানাবে এখানে তাদের কোম্পানী।

অনেকেই স্বাগত জানায় ওদের এই পরিকল্পনাকে।

প্রেসও তাঁদের সহযোগিতায় আশ্বাস দেয়। টি. ভি. ক্যামেরাতেও ছবি ওঠে। বিজয়ের ইনটারভিউ নেয় তারা।

দীর্ঘ পচিশবছর আগে একটি তরুণ অজ্ঞাতবাসে যাত্রা করেছিল। সেদিন কেউ তাকে চেনেনি। আজ সে ফিরেছে বিজয়ীর মত। এখানের জন্য কিছু করতে চায়। এদেশের কিছু মানুষের সংস্থানের জন্যই সে আবার ফিরে এসেছে।

কমলার স্বপ্ন যেন সার্থক হতে চলেছে।

পরদিন খবরের কাগজে বিজয়ের ছবি ছাপা হয়; কয়েক কলম জুড়ে তার জীবন সংগ্রামের কাহিনীও বের হয়। বের হয়েছে তাদের নিউ জার্সীর বিরাট কারখানার ছবি।

এখানে তারা কারখানা করছে, বিজয়-এর কথাই বলেছে তারা।

আশা করে আরও বিদেশে যারা খ্যাতি লাভ করেছেন তারা এদেশে এসে এখানের মানুষের জন্য কিছু করবেন।

কমলাও এই স্বপ্ন দেখেছিল। তা আজ পূর্ণ হতে চলেছে। তবু কমলার মনে কোথায় বিজয়ের জীবনের সেই শূন্যতার কথাই মনে পড়ে বার বার।

মিঃ ফুলটনরা দেশে ফিরে গেছেন।

এদিকে বিজয়ও ব্যস্ত হয়ে পড়েছে কাজে। কল্যানীতে ফ্যাকটরী তৈরীর কাজ সুরু হয়েছে। কাগজে কাগজে তার অনেক খবর বের হচ্ছে। বিজয় পার্ক স্ট্রীট এলাকাতে এর মধ্যে একটা অপিসও করেছে। এইটা এখন সিটি অপিস হয়ে আছে। কাজকর্ম চলছে এখানে থেকেই। ওদেশ থেকে চিফ ইন্‌জিনিয়ার এসে কারখানার কাজ এগোবার সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রপাতি বসানোর কাজও সুরু করেছে।

বিজয় কিছু লোকজন ইন্‌জিনিয়ার কর্মী সংগ্রহের কথাও ভাবছে। এ ব্যাপারে সে নিজে দেখে শুনে লোক নিতে চায়।

দরখাস্তের স্তূপই হয়ে গেছে।

এদেশে বেকার যে অনেক এটাও বুঝেছে বিজয়। এদেশের ডাক্তার—ইনজিনিয়ারদের দেখেছে আমেরিকাতেও। বিশাল দেশ ভারতবর্ষ, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে পরিমাণে প্রতিবছর ডাক্তার ইন্‌জিনিয়ার বের হয় তা কম নয়।

দেশে এত কর্মসংস্থান হয়তো নেই।

কারণ যে পরিমাণে শিল্প বাণিজ্য বাড়ার কথা তা হয় নি। পশ্চিমবঙ্গেও তাই বেকার ডাক্তার, ইন্‌জিনিয়ারও কম নেই। তারাই দেশ ছেড়ে অন্য দেশে চলে যায় ভাগ্যের সন্ধানে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তাই দেখা যায় তাদের।

বিজয় ওই দরখাস্তের স্তূপ থেকে কিছু বাছাই করে নিয়েছে। আর সাধারণ কর্মী নেবে সে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ থেকে।

জামালপুর থেকে বদলি হয়ে প্রশান্ত এসেছে বর্ধমানে। বড় জংশন ষ্টেশন। চাকরীও বেশিদিন আর নেই।

সাথীর চাপে পড়েই বোলপুরে বাড়িটা তৈরী করেছে। সাথী সেখানেই রয়েছে কিছুদিন। প্রশান্ত ওখান থেকে ডেলি প্যাসেঞ্জারি করে চাকরী করে।

নৃপেনও ইন্‌জিনিয়ারিং পাশ করে এসেছে বোলপুরের বাড়িতেই। দু একজায়গায় চাকরীর সন্ধান করছে। কিন্তু তেমন সুবিধা মত কিছু হয় নি। দু'একটা চিঠি এসেছে বোম্বাই'এর দিক থেকে। কিন্তু সাথীই আপত্তি করে।

এতদূরে, নাইবা গেলি, কলকাতার কাছাকাছি কোথাও বেশী করে দ্যাখ।

ছেলেকে সে দূরে পাঠাতে নারাজ। নৃপেন বলে।

—এখানে যদি না পাই তবে যাবো না বাইরে?

প্রশান্তও সাথীর কথাটা মানতে রাজী নয়? কিন্তু মুখে সে কিছু বলতে পারেনি।

নৃপেন তাই এদিকেই বিভিন্ন জায়গায় দরখাস্ত দিয়ে চলেছে। সময়ও কাটেনা তার। হঠাৎ সেদিন তাই চিঠিখানা পেয়ে খুশী হয়। কলকাতায় নোতুন একটা প্রতিষ্ঠান থেকে তার ইনটারভিউ-এর ডাক এসেছে।

সাথী বলে।

—এ বরং ভালো। দেখ যদি এখানে হয় চাকরিটা, তবু বাড়ির কাছে থাকবি। শনিবার শনিবার আসতে পারবি।

নৃপেন বলে—তাই দেখছি। বাইরে যেতে দিতে কেন এত বাধা তোমার জানিনা।

সাথী হাসে। ছেলেকেও জানাতে পারেনি তার মনের অতলের সেই আতঙ্কের কথা। একজন কে সে দূর প্রবাসে হারিয়েছে, তাই নিজের ছেলেকে সে বাইরে কোথাও পাঠাতে চায় না।

আজ বিজয় যেন কোথায় হারিয়ে গেছে। আমেরিকায় তাকে চিঠি দিয়েছিল

আগের হোটেলের ঠিকানায় কিন্তু সে চিঠির কোন জবাব আসেনি।

পিছনের সেই স্মৃতিটুকু আজ জেগে আছে মাত্র মনের অতলে, শুধু স্মৃতিই। আর কোন সার্থকতা তার নেই। তাই আজ নৃপেনকে নিয়েই নোতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখে সাথী অন্য মায়েদের মতই।

নৃপেন কলকাতায় এসেছে ইনটারভিউ দিতে।

জানেনা এ চাকরী তার হবে কিনা, তবে অপিসটাকে ভালো লাগে। ঝকঝকে করে সাজানো ওদিকে রিসেপসনিষ্ট চিঠিখানা নিয়ে ইনটারকামে কথা বলে নৃপেনকে বলে।

—ভিতরে যান। সামনে ডিরেক্টারের ঘর।

নৃপেন এগিয়ে যায়।

বিজয় ওকে ঘরে ঢুকতে দেখে চাইল।

চমকে ওঠে বিজয়। যেন অতীতের দিনে ফিরে গেছে সে। সেই মুখ, ডাগর চোখ, ওই চাহনি—যেন তার খুব চেনা।

কুচবিহারের সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়ে।

বৈষ্ণবদিঘীর ধারে ছায়াঘন পরিবেশে প্রথম দেখেছিল সে একটি কিশোরীকে, আজও দীর্ঘ এতগুলো বছর পার হয়ে আজও তাকে ভোলেনি।

সাথীর সেই চাহনিই যেন ফুটে উঠেছে ওর চাহনিতে।

বিজয় যেন স্বপ্ন দেখছিল।

সে সব আজ স্বপ্নই। নৃপেনও দেখছে বিজয়কে। ওর দিকে চেয়ে থাকে। দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ বিদেশে থাকার ফলে বিজয়ের মুখে এসেছে একটা ফর্সা ভাব।

বিজয় বলে—বসো!

ওর কাগজপত্র পরীক্ষার ফল দেখতে থাকে। নামটাও।

কলকাতার একটা ঠিকানা আছে দরখাস্তে।

বিজয়-এর মনে হয় ভুলই দেখেছিল সে।

বিজয় বলে—পরীক্ষায় এত ভালো রেজাল্ট করে এখনও চাকরী পাওনি কেন?

নৃপেন জানায়—বাইরে বোম্বাই, হায়দ্রাবাদে চাকরী পেয়েছিলাম কিন্তু বাড়ি থেকে দূরে যেতে দিতে চায় না, তাই।

হাসে বিজয়-স্ট্রেঞ্জ!

আপনাদের ফরেন ফার্ম-এর নো হাউ জানতে পারলে শেখা যাবে অনেক কিছু। তাই এটাকেই প্রেফার করবো।

বিজয় দেখছে ওকে। কি ভেবে বলে। ও কে। আজ একটু থেকে যাও। তিনটের সময় তুমি এসে দেখা করো।

বিজয়ের অক্লান্ত পরিশ্রমে কাজ এগিয়ে চলেছে।

কলকাতা—কখনও দিল্লী দৌড়াতে হয় তাকে। যে ভাবে হোক্ তাদের কারখানার কাজ ছ' মাসের মধ্যেই চালু করতে হবে।

এটা এখন যেন অন্য সকলের সামনে তার মান সম্মানের প্রশ্ন হয়ে উঠেছে। সকলেই যেন দেখছে তাদের।

সেদিনও চেম্বার অব কমার্সের সেক্রেটারী মিঃ ঝুনঝুনওয়ালা বলে—বিজয় সাব্ এ মুলুককা হাল আপলোক নেহি জানতে হে'। ই লোক কাম নেহি করকে পয়সা লেনেকা ধান্দা করতা। ছ' মাহিনা ক্যা—দো বরষ চলা যায়ে গা তব্ প্রডাশন চালু হোগা।

মিঃ দুধানীও এখানের বড় ব্যাবসাদার।

দিনরাত পয়সার ধান্দায় থেকে রাতে হোটেলে আসে নীট দু-চার পেগ গলায় ঢেলে মুরগীর ঠ্যাং-এ কামড় দিয়ে বলে।

—ই লোক আইডিয়া কো নেহি আইডেলনেস্ কো স্পনসর করতা হ্যায়। ইউ আর কামিং ফ্রম আমেরিকা। বাংলা মুলুককা নয়া হাল অপ নেহি সমঝেগে! ইউ উইল নাউ সি।

বিজয় শোনে ওদের কথা।

বেশ জানে বিজয় মিঃ ঝুনঝুনওয়ালাদের মহারাষ্ট্রে কেমিক্যাল ফ্যাক্টরী আছে। ফুলটন কোম্পানীকে এদেশে আসতে দেখে তারা খুশী হয় নি। প্রকাশ্যে অবশ্য এটা বলা যায় না। কিন্তু ওদের মনের কথা সে জানে। ওরা চায় না তারা এখানে কৃতকার্য হোক।

কিন্তু বিজয় জীবনে হার মানেনি, যে কোন অবস্থার মধ্যে থেকে জয়ী হয়ে এসেছে। এখানেও হবে।

তার সহকারী ইন্জিনিয়ারদের মধ্যে বিজয় দেখেছে ওই নৃপেনকে। এর মধ্যে তরুণ ইন্জিনিয়ারটি ওদের আমেরিকান ইন্জিনিয়ারদের সঙ্গেও দিন রাত কাজ করে যন্ত্রপাতি বসানোর কাজে সহযোগিতা করছে।

ওদের যন্ত্রপাতির ব্লুপ্রিন্ট মেকানিজমগুলো শিখছে দারুণ আগ্রহ নিয়ে। বিজয়ও কারখানায় গিয়ে ওদের সঙ্গে ঘুরে ফিরে দেখে, প্রতিদিনের কাজের হিসাব নেয়। বলে বিজয়।

এখানে আমাদের মান সম্মানের প্রশ্ন নৃপেন, তোমাদের সকলের কাছে আমার অনুরোধ, এ কাজ বিফোর সিডিউল শেষ করতেই হবে। এ আমাদের কাছে একটা চ্যালেঞ্জ।

মিঃ ঝুনঝুনওয়ালা, দুধানী সকলের সামনেই বলে।

—বাংলাদেশে নাকি কাজ হয় না, এখানের সবাই শুধু পেতে চায় বেশী, কাজ কম করে। আমি দীর্ঘদিন বাইরে থেকে আজ ফিরে এসে নিজেদের

সম্বন্ধে একথা বিশ্বাস করতে চাইনা। এ বদনাম যে মিথ্যা এইটাই দেখাতে হবে।

তরুণ ইন্‌জিনিয়াররাও বলে।

—আমরাও চেষ্টা করছি বিজয়দা।

দু'একজন বয়স্ক প্রবীন ইন্‌জিনিয়ারদেরও নিয়েছে বিজয়। মিঃ দত্ত এতদিন অন্য কারখানায় ঢিলে ঢালা মেজাজে কাজ করেছে, এখানে এসে এই ঝড়ের গতিতে কাজ করতে দেখে আড়ালে বলে।

আমেরিকানরা বেনের জাত বাবা, উঃ পয়সা দেয় বটে তবে নিংড়ে নেয়। এত খাটুনি—

নৃপেন বলে—দত্তদা, ওরা কাজ করে।

ফটিক চ্যাট্যার্জিও নোতুন এসেছে। তাকেও কাজ করতে হয় প্রচুর। এড়াবার উপায় নেই। রাতে একটু মাল টাল খাবে, তারও উপায় নেই।

তার কণ্টিকপ্ল্যাণ্ট-এর প্রডাকশন সুরু হবে সামনের সপ্তাহে, সুতরাং দম নেবাব সময় নেই। ফটিক চ্যাটার্জি বলে।

—গাধার খাটুনি সহ্য হয়? মাল খাবার সময়ও নাই।

নৃপেন জানে ওদের অসন্তোষের কারণ।

বেশী কাজ করতে তারা নারাজ। কিন্তু নৃপেন দেখেছে বিজয়বাবুকে।

দীর্ঘদিন ধরে তিনি জার্মানী, ইংল্যাণ্ড হয়ে আমেরিকায় গেছেন। সেখানে সামান্য অবস্থা থেকে নিজের পরিশ্রম আর বুদ্ধিমত্তা দিয়ে আজ এখানে উঠেছেন।

নৃপেনের ভালো লাগে ওই লোকটিকে। কথা কম বলেন, কাজ করেন ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে। আর সকলের কাজও আদায় করতে পারেন। কড়া কথাও বলেন না, প্রতিটি কাজ রুটিন মত করে চলেন।

কারখানাতেও দেখেছে নৃপেন ওকে। সব শেষে সেকশনে, ঘোরেন, জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে গেলে কিছু গুণের দরকার। সেই গুলোই মানুষকে বড় করে। বিজয়বাবুর তা আছে।

এত কাজের মধ্যেও মুখের হাসি তার মিলোয় না। সব কর্মচারীই তার যেন চেনা। নৃপেনকে নিয়েও কারখানার বিভিন্ন সেকশনে যান, বলে, সব কাজ জানা ভালো নৃপেন। শিখতে গেলে, কিছু করতে গেলে পরিশ্রম করতে হয়। জেনে নাও শিখে নাও। জীবনে কাজে লাগবে।

নৃপেনেরও ভালো লাগে ওই লোকটিকে। বলে নৃপেন, চেষ্টা করছি স্যার।

নৃপেনের তরুণ মনে ওই লোকটি একটি রেখাপাত করেছে। বিজয় বলে —কোন অসুবিধা হচ্ছে না তো? এনি প্রবলেম—সোজা আমাকে বলবে। নো ফর্ম্যালিটি।

ওইখানেই মিঃ চাটার্জি, মিঃ দত্তের মত দশ-বার জন ইন্‌জিনিয়ার, সেকশান-

ইন-চার্জের আপত্তি ওঠে। তারা দেখেছে এতে যেন তাদের প্রাধান্য ক্ষুণ্ণ হচ্ছে।

সাধারণ কর্মচারীরা যেন তাদের মানবে না। ওরা ওদের কিছু বক্তব্য থাকলে সোজা এম-ডি ম্যানেজিং ডিরেকটারের কাছেই বলতে চায়।

মিঃ চ্যাটার্জি আড়ালে বলে।

—এতে এ্যাডমিনিস্ট্রেশন চলে না হে।

নৃপেন দেখছে ব্যাপারটা। কোথায় ওরা যেন নিজেদের তুচ্ছ মান সম্মানের প্রশ্ন নিয়েই ব্যস্ত।

মিঃ রায় সাদাসিধে মানুষ। তিনি বলেন—এতো ভালোই হে, আমাদের দায়িত্ব কমে যায়, এম. ডি. যখন নিজেই দেখছেন।

মিঃ দত্ত বলে, ওর নিজের সর্দারী হে। আমেরিকায় নাকি এমনি ধারায় কাজ চলে, এনি প্রবলেম—তখুনিই সল্‌ভ করো। কাজ চালাও, আরে বাবা এদেশে ওসব চলে? ম্যানেজার, ওয়ার্ক ম্যানেজার দেখবে তারপর যা হবার হবে।

নৃপেন-এর ভালো লাগে না এইভাবে কাজের ব্যাপারটা। সে বলে তাতে তো সময় নষ্ট, কাজ নষ্ট হয়। তক্ষুনিই প্রবলেম সলভ্‌ করা দরকার, সময় বাঁচে।

মিঃ দত্ত চাইল নৃপেনের দিকে।

এর মধ্যে ওরাও দেখেছে নৃপেন এম্‌-ডি বিজয়বাবুর বিশেষ প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছে। মিঃ দত্ত বলে।

তুমি ইয়ংম্যান, দেখি গাধার মত খাটছো। আর ওই তোমাদের এম-ডি সাতঘাটের জল খাওয়া মাল। মুখেই প্যার করে, ওকে চেনোনি।

মিঃ চ্যাটার্জি অবশ্য আড়ালে বলে মিঃ দত্তদের।

—ওই ছেলেটির সম্বন্ধে একটু সাবধান থেকো দত্ত, এম ডি-র চর ও। ও বোধহয় আমাদের নামে চুকলি খায় সিওর।

মিঃ দত্ত বলে।

ওর উপর নজর রেখেছি ভায়া। তেমন কিছু বুঝলে শশী নায়েকতো আছেই। ব্যবস্থা হয়ে যাবে, চলো কাজে যেতে হবে। কফি ব্রেক তো পনেরো মিনিট, আবার কাজে না গেলে এম-ডি এসে হাজির হবে।

বিজয় কাজ নিয়েই ব্যস্ত।

ঠিক পাঁচমাসের মাথায় সে প্রডাকশন চালু করেছে। প্রথমদিন প্রেসের লোকজন, সরকারী পক্ষের দু'একজন মন্ত্রীদেরও আসার ব্যবস্থা করেছিল। কারখানাকে সাজিয়েছে নৃপেন এবং আরও কিছু তরুন ইঞ্জিনিয়ার কর্মীর দল।

সামনের ময়দানে প্যান্ডেল করা হয়েছে।

বিজয়ের সময় নেই।

কমলাবৌদিও বেশ কিছুদিন পর বিজয়কে আসতে দেখে চাইল, বলে সে—

—কি ব্যাপার ? দেখাই নেই। এদেশে আছো না আমেরিকায় ফিরে গেলে তাই ভাবছিলাম।

বিজয় বলে—সময় পাইনি, ক'মাস ধরে ঝড় বয়ে যাচ্ছে বৌদি। এতবড় একটা কাজকে শেষ করতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছি। তবে এবার মনে হয় কূল দেখেছি।

কার্ডখানা বের করে বলে।

—প্রডাকশন চালু করছি সামনের সপ্তাহে, একটা অনুষ্ঠানও করছি। প্রেসের লোকজন, সরকারের তরফের কিছু কর্তারা, চেম্বার অব কমার্সের লোকদেরও বলেছি। ওই দিন তোমাকেও যেতে হবে।

কমলা দেখছে বিজয়কে।

সেই ছোট্ট কিশোর আজ একটি নোতুন মানুষে পরিণত হয়েছে। দেহে বয়সের ছাপ পড়েছে, কিন্তু তার ব্যক্তিত্ব তাতে প্রকট হয়েই উঠেছে।

কমলাও খুশী হয় শুনে। বলে সে,—বেশতো, যাবো।

বিজয় বলে—আরও একটি কাজ করতে হবে। কমলা চাইল। বিজয় বলে,

—ওই দিন কারখানার কাজ চালু করতে হবে তোমাকে আনুষ্ঠানিক ভাবে সুইচ অন্ করে।

চমকে ওঠে কমলা। বলে সে।

—না-না। ওসব বৃহৎ ব্যাপারে আমাকে কেন? তারজন্য মন্ত্রী-টন্ত্রীদের কাউকে ধরো বিজয়। ওসব আমি পারবো না।

বিজয় বলে—না বৌদি। আমাকে তুমিই সেদিন থেকে বারবার শুনিয়েছিলে বড় হতে হবে। দেশবিদেশ ঘুরে তুমি কিছু অর্জন করে ফিরে এসে দেশের মানুষের জন্য কিছু করবে।

আজ সেই কঠিন পরিশ্রমে কিছু গড়ে তুলেছি, তোমাকেই তার সূত্রপাত করতে হবে বৌদি, এ আমার অনুরোধ। তোমার কথা আমি রেখেছি। এবার আমার কথাও তোমাকে রাখতে হবে।

কমলা ভাবছে। আজ বিজয় অনেক আশা নিয়েই এসেছে।

বিজয় বলে—আজ বলতে দ্বিধা নেই বৌদি, তুমি আর একজনই আমাকে এগিয়ে দিয়েছিলে জীবনের কঠিন পথে। একজন কোথায় হারিয়ে গেছে, আছো তুমিই। সেতো নেই।

তাই তোমাকে একাজ করতেই হবে।

কমলা শুনছে ওর কথাগুলো। বুঝেছে কমলা—সাথীকে আজও ভোলেনি বিজয়। আজ তার জীবনের কৃতিত্বের দিনে সাথীকেও ভোলেনি বিজয়, কিন্তু সে আজ বোধ হয় বিজয়কে ভুলে গেছে।

কমলা বলে—ঠিক আছে, যাবো।

নিজের চোখে দেখে আজ খুশী হয়েছে কমলা।

বিজয় ছ'মাসের কঠিন পরিশ্রমে বিরাট কারখানার পত্তন করেছে অনেকখানি এলাকা জুড়ে। বড় বড় শেডে কাঁচের ফাঁক দিয়ে আলো আসছে, ভিতরেও আলোর ব্যবস্থা রয়েছে, বড় বড় রকমারি যন্ত্রপাতি বসেছে, কনভেয়ার বেল্টে সারবন্দী ওষুধপত্র, যাতায়াত করবে প্যাক হয়ে।

ওদিকে দু-তিনটে বড় বড় চিমনি উঠেছে আকাশে। ঝকঝকে কারখানা। ওদিকে কিছু কোয়ার্টার, ছোট ছোট বাড়িও তৈরী হয়েছে, আরও তৈরী হচ্ছে।

এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং তৈরীর কাজ শেষ, তখনও কিছু অংশে ফার্নিচার ফিটিংস্-এর কাজ চলেছে। সামনে সুন্দর করে সাজানো প্যাণ্ডেলে সমবেত হয়েছে আমন্ত্রিত অতিথিরা। মিঃ ঝুনঝুনওয়ালা ও দুধানীর দলও এসেছে।

তারা ভাবতে পারেনি ছ'মাসের মধ্যেই ফুলটন এণ্ড কোম্পানী সত্যিসত্যিই এ দেশে এতবড় কাজ শেষ করে তাদের কথামত প্রডাকশনও চালু করবে।

মিঃ ঝুনঝুনওয়ালা সব দেখে শুনে বলে।

—কনগ্র্যাচুলেসনস্ মিঃ বিজয়। ইউ হ্যাড ডান্ সামথিং গ্রেট। মিঃ দুধানী ক্ষুণ্ণই হয়েছে। তার কথা এখানে মিথ্যা হয়ে গেছে। আড়ালে মিঃ ঝুনঝুন-ওয়ালাকে বলে।

—এরা কি কাষ্টিক, এ্যামোনিয়া বানাবে। বাজারে মালের দর কমিয়ে দেবে। তোমাদের মাল তো কাটবে না। এরা কম খরচে মাল বানাবে, ঝুনঝুনওয়ালা আরও সাবধানী লোক। মনের কথা প্রকাশ করতে চায় না সে। ওই প্রশ্নটা সে আগেও ভেবেছে। এখন তার কর্মপন্থাও স্থির করেছে। তবু দুধানীর কথায় বলে।

সো হোয়াট মিঃ দুধানী। নোতুন নো হাউ আসুক দেশে। এতো ভালোই হয়েছে।

শশী নায়েক এই অঞ্চলের সুপরিচিত শ্রমিক নেতা। কারখানার অনেক মালিক তাকে চেনে, খাতিরও করে। শশীবাবুর নাকি অনেক ক্ষমতা।

বিজয় সেদিন অফিসে ওকে আসতে দেখে চাইল, এর আগেও ও দুচারজন মালিকদের পার্টিতেও দেখেছে, বেঁটেখাটো গোলগাল কালো চেহারা, মাথায় একটা চকচকে টাক। হাতের আঙ্গুলে সর্বসাকুল্যে গোটা আণ্টেক-নয়েক আংটিও আছে। লোকে বলে, শশী নায়েক নবগ্রহকে হাতের মুঠোর মধ্যে রেখেছে এইভাবে।

এ হেন শশী নায়েক বলে বিজয়কে।

কারখানা চালু করছেন শুনে এলাম। কোন ভয় নাই—এখানের বিভিন্ন কারখানায় শান্তিতে কাজ হয় এই শর্মার জন্যে। আমার লেবার ইউনিয়ন মশাই শুধু শ্রমিকদেরই দেখে না, মালিকদেরও দেখে ; হাস মেরে ডিম খাওয়ার পলি-

সিতে আমি নেই। আজকালকার ওই এক বুলি হয়েছে আমাদের দাবী মানতে হবে। আরে বাবা কারখানা বাঁচলে তো তোরা বাঁচিব। তখন দাবী তুলিস। নাহলে ওসব কি বাবা? কথাগুলো শেষ করে শশী নায়েক দম নেয়।

—কফি টফি আনাই? বিজয় বলে।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। এসময় কফির কথা শুনে শশী নায়েক ইতি উতি করে, যেন নিরাশই হয়েছে। গলা বাজিয়ে বলে।

—এ সময় কফি? মানে বিদেশী টিদেশী ইয়ে টিয়ে।

বিজয় অবাক হয়, ওর কথায়। লোকটা যেন একটা বাস্তু ঘুঘু। বিজয় তার মনোভাব চেপে রেখে বলে।

—ওসব তো আমার চলে না।

হো হো করে শশী নায়েক এইবার বালক সুলভ নির্মল হাসিতে ভেঙ্গে পড়ে। হাসির দম সামলে বলে।

—সেকি স্যার? তাহলে এতদিন ইউরোপ আমেরিকা চষে এটুকুও রপ্ত করতে পারেন নি? যাকগে—কফিই হোক তাহলে।

কফিতে চুমুক দিতে দিতে বলে শশী।

—আপনাকে দেখবো স্যার, আরও বিভূতির দলকে পাত্তা দেবেন না। ওরাও এখানে ইউনিয়ন করতে চাইছে। অলরেডি নাকি চাঁদা কালেকসন শুরু করেছে। আমিও এলার্ট আছি স্যার। আপনার কাজ ঠিক চলবে। তবে আমার ইয়েটা মানে আমাদের দলের মান্থলি ডোনেশেনটা ধরুন হাজার আড়াই করেই দেবেন। বেশী চাইছি না এখন।

বিজয় অবাক হয় ওর কথায়।

এখানে এসে এরকম ব্যাপারের কথা শুনেছিল সে, কিন্তু তার কাছে এমনি প্রস্তাব নিয়ে কেউ এসে প্রকাশ্যে টাকা চাইবে মাসে মাসে তা ভাবেনি। বিজয় বলে, কথাটা ভেবে দেখবো। তবে জানেন তো বিদেশে এভাবে কোন কাজই হয় না। সরকার মালিক কর্মচারী, এদের মধ্যে বাইরের কোন দলের মাতব্বরি নেই। থাকলে কাজের বাধা হয়। এভাবে চলতেও আমরা অভ্যস্ত নই।

কর্মচারীদের স্বার্থ—পয়সা দেখবে কোম্পানী, তারা দেখবে কোম্পানীর কাজ। এর মধ্যে তৃতীয় পক্ষ কেন আসবে বলুন?

শশী নায়েক একটু ক্ষুণ্ণই হয়েছে।

প্রথম থেকেই ওই বিজয়কে তার ভালো লাগেনি। বেশ মনে হয়েছে একটু কড়া ধাতের লোক। আর প্রখর বুদ্ধিও রাখে। মদও খায় না, খাওয়াতেও জানে না। প্রথম থেকেই শশী নায়েক হেন নেতাকেও এড়াতে চায়।

শশী নায়েক মনের ভাবটা চেপে রেখে বলে।

—ওসব দেশের সঙ্গে তুলনা করবেন না স্যার।

বিজয় বলে—কেন করবেন না ? বড় হবার—এগিয়ে যাবার মূলমন্ত্র সব দেশেই এক। কাজ করতে হবে, এখানে সেইটাই যদি না হয় পৃথিবীর অন্য দেশের তুলনায় আমরা কোথায় দাঁড়াবো তাহলে ?

শশী নায়েক বাইরের পৃথিবীর খবর জানেনা। তার জগৎ সীমিত। সে বলে—এদেশের মত চলতে হবে স্যার। ঠিক আছে আজ উঠি আপনিও ভেবে দেখবেন কথাটা। আচ্ছা, নমস্কার। ফোন নাম্বার রইল, ডাকবেন।

শশী নায়েক সেদিন ফিরে যাবার পর আশা করেছিল বিজয়বাবু ফোন করবে, কিন্তু ফোন করেনি, এরা নিজেদের কাজ চালু করেছে। শশী নায়ককে পাত্তাই দেয় নি। শুধু নিমন্ত্রণ কার্ড এসেছিল মাত্র।

শশী চটেই ছিল। এবার ঝুনঝুনওয়ালা ওকে স্মরণ করতে শশী নায়েক এসেছে এই উদ্বোধনী উৎসবে। ওখানেই ঝুনঝুনওয়ালাদের সঙ্গে দেখাও হয়।

কারখানার কর্মীরাও উৎসাহের সঙ্গে সব কাজে এসেছে, অনুষ্ঠানে উপস্থিত মন্ত্রীরাও খুশি হন এদের কাজ দেখে। প্রেসের লোকজনদের সামনে বিজয়ও বলে তাদের কর্মনীতির কথা। মাননীয় মন্ত্রীও সমর্থন করেন।

—নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করা দরকার। শ্রমিকদের স্বার্থের সঙ্গে কারখানার স্বার্থও জড়িত, সুতরাং প্রডাকসনই সবচেয়ে বড় কথা। এরা যে কর্মনিষ্ঠা দিয়ে ছ'মাসের মধ্যে এতবড় প্রতিষ্ঠান চালু করেছেন, এ দেখে বিশ্বাস হয় এরা এগিয়ে যাবেন।

শশী নায়েক দেখছে সবকিছু।

বিজয়বাবু খুবই ব্যস্ত, তবু একবার হাসি বিনিময়ও হয়। কলমার স্বপ্ন আজ সার্থক হয়েছে।

বিজয়ের প্রতিষ্ঠানে তবু বেশ কিছু লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে। আরও বাড়াবে তারা কারখানা। সুইচ অন করে কাজ চালু হল। প্রেস ক্যামেরার ফ্লাশ জ্বলছে, টি ভি ক্যামেরাতে ছবি উঠছে, করতালি মুখর পরিবেশে এদের যাত্রা সুরু হল।

বিজয়ও আজ খুশী।

আজ বৌদিকে কাছে পেয়েছে, এই আনন্দের দিনে কেন জানে না বারবার মনে পড়ে সাথীকে। আজ তাকেও সে এখানে পেতে চেয়েছিল। কিন্তু সাথী কোথায় তা জানে না বিজয়। সাথীও আজ তাকে ভুলে গেছে।

নৃপেনও খুব ব্যস্ত।

অতিথিদের আপ্যায়ণের ভার পড়েছে মিঃ দত্তের উপর। ওদিকে প্রডাকশন চালু করার ভার পড়েছে মিঃ চাটার্জি নৃপেনদের উপর। ওরা কাজে ব্যস্ত। মিঃ চ্যাটার্জি গজগজ করে।

—আজ অনুষ্ঠান, একটু রিলাক্স করবো, ইয়ে টিয়ে খাবো। তা নয়। এই কাজ আর কাজ।

নৃপেনরাও বের হতে পারেনি শেড থেকে। কাজ চলেছে। দূর থেকেই নৃপেন দেখেছিল কমলা দেবীকে। গরদের শাড়ি পরা ওই মহিলাকে এখানে ভেবেছিল—সরকারী মহল থেকেই এসেছেন তিনি। নৃপেন ওকে চেনে, কিন্তু তার অনেকদিন যাওয়া হয়নি কমলাদেবীর ওখানে।

আজও তার কাজ, আর এত ভিড়ের জন্যও নৃপেন গিয়ে ওর সঙ্গে কথাও বলতে পারেনি। ওরা তখন শেডে কাজ চালু করেছে। কাজ চলেছে পুরোদমে

অনুষ্ঠান শেষে কমলা ফিরছে,

অতিথিরাও বিদায় নিচ্ছেন একে একে। কমলা বলে বিজয়কে—একদিন এসো বিজয়।

বিজয় এবার কিছুটা অবকাশ পেয়েছে।

প্রথমে চালু করাটাই বড় কথা। ওটা হয়ে গেলে তখন চাকা আপনা হতেই চলতে থাকে। বিজয় বলে।

—যাবো একদিন বৌদি।

ঝুনঝুনওয়ালার গাড়িতেই ফিরছে শশী নায়েক।

মনে মনে বেশ চটে উঠেছে শশীবাবু। বিজয় সাহেব তাকে পাত্তাই দেয়নি। ঝুনঝুনওয়ালা নিজেই গাড়ি চালাচ্ছে। গাড়িতে সে আর শশী নায়েক। ফাঁকা রাস্তা, ওদের গাড়িটা আসছে।

ঝুনঝুনওয়ালা বলে—ওদের কারখানার ইউনিয়ন তাহলে কি বিভূতিই করছে বোধ হয়।

শশী নায়েকের এ যেন পরাজয়ই।

শশী নায়েক বলে—দেখছি আমিও। বিজয় সাব বলে বিদেশে এসব নাই। আরে বাবা, বিদেশের কথা ছাড়। এদেশে যা হয় তাই হবে।

ঝুনঝুনওয়ালা বলে—তোমাকে টপকে কাজ করবে শান্তিতে ভেবেছে ওই বিজয় সাব।

শশী নায়েক হাসে। বলে।

—তাই দেখছি।

ঝুনঝুনওয়ালাও বুঝেছে এবার তাদের স্বার্থেও ঘা আসবে। তার আগেই সে ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে চায়। বলে ঝুনঝুনওয়ালা।

- পরে দেখা করবে শশীবাবু, একদিন লাঞ্চেই এসো—কথাবার্তা হবে। আমরাও ফ্যাক্টরী বাড়াতে চাই। তোমার সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করা দরকার।

শশী নায়েক চতুর ব্যক্তি। ঝুনঝুনওয়ালার এই আলোচনার কারণটা

কিছুটা অনুমান করেছে। মনে মনে খুশিই হয় সে। বিজয় বাবুকেও সে তার এলেম দেখিয়ে দেবে। এদিকে ঝুনঝুনওয়ালাকেও খুশী করতে পারবে হয়তো, সেদিক থেকেও কিছু আমদানী পত্র হবে তার।

শশী নায়েক বলে—ঠিক আছে। যাবো একদিন। আমার দ্বারা যা করা সম্ভব ঠিকই করবো।

ঝুনঝুনওয়ালাও মনে মনে চায় বিজয়দের আঘাত দিতে। তাই দরকার ওই শশী নায়েককে। ও কারিতকর্মা লোক, আর বিজয়ও ওকে পাত্তা দেয়নি, ওকেই কাজে লাগাবে ঝুনঝুনওয়ালা, নিজে ধরা ছোঁয়ার বাইরে থেকে। বিজয়দের কারখানার কাজ শান্তিতে চললে ওদের প্রডাকশনই বাজার ছেয়ে ফেলবে, তাই ঝুনঝুনওয়ালা আগে থেকেই সাবধান হতে চায়।

আর শশী নায়েকও তার জন্য তৈরী হয়েই আছে। তাই ওদের দুজনের আঁতাতে হতে সময় লাগে না।

বিজয়ও এবার কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়েছে।

প্রচার ব্যবসায়ের একটা অঙ্গ। ওদের কোম্পানীর সুনামও আছে। আর বিভিন্ন সংবাদপত্রে, রেডিও টিভিতে তাদের কারখানার বিভিন্ন সংবাদ বের হয়েছে। নিজেরাও প্রচার করছে। আর তাদের তৈরী মালপত্রও অনেক ভালো, বিদেশের নীতিটাকে কাজে লাগিয়েছে বিজয়। তাদের মাল-এর মান অনেক উন্নত আর ভেজালের কোন ব্যাপারই নাই। ফলে কিছুদিনের মধ্যেই তাদের মাল এদেশের বাজারে সুপরিচিত হয়ে উঠেছে, চাহিদার সৃষ্টি করেছে। বাজারে ওরা যোগান দিয়ে শেষ করতে পারছে না।

আরও নোতুন নোতুন দু'একটা প্রডাক্টও তৈরী করছে।

তারও চাহিদা বাড়ছে।

নৃপেন এখানে কাজে ব্যস্ত।

প্রথম ক'মাস দু'একবার মাত্র বাড়ি যেতে পেরেছিল, তারপর সময় পায়নি।

কাজ সুরু হতে একটা শনিবার সে কয়েকমাস পর বাড়িতে গেছে মায়ের কাছে বোলপুরে।

সাথী ছেলেকে কাছে পেয়ে খুশী হয়। ক'মাসেই নৃপেন যেন বদলে গেছে। ওর চোখমুখে যেন নোতুন একটি ব্যক্তিত্বের কাঠিন্য ফুটে উঠেছে। ফর্সা রংও তামাটে হয়ে গেছে। বলে সাথী।

—খুব খাটতো হয় না রে?

নৃপেন বলে—তা হবে না! তবে আমাদের এম ডিকে দেখোনি মা, কি খাটেন ভদ্রলোক। বিয়ে থা করেন নি, সংসারের দায়ও নেই। তবু কাজের মধ্যেই ডুবে থাকেন। ক'মাসেই বিরাট কারখানা চালু করে এরমধ্যে মাল এর যা বাজার করেছেন, দারুন। একটা আদর্শবান লোক।

সাথীর মনে পড়ে আর একজনের কথা।

বিজয়কে এমনি কোন আদর্শের কথা বলতে শুনেছিল। আজ সেও কোথায় দূর অজানায় হারিয়ে গেছে। কাজ আদর্শ এসব কিছু সাথীর কাছে বিরক্তির সঞ্চারই করে।

সাথী বলে—রাখতো ওসব বড় বড় কথা। খাটিয়ে তোর সোনার বর্ণ কালি করে দিয়েছে।

নৃপেন বিজয়বাবুর কাছে আমেরিকার কথাও শুনেছে। শুনেছে সেখানের কঠোর কঠিন পরিশ্রমের কথা। ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত খাটতে হয়, আর চাকরীরও কোন স্থিরতা নেই। আজ আছে, খুশি না হলে কর্তৃপক্ষ পরদিনই বিদায় করে দেবে। আবার চাকরীর সন্ধানে ঘোরো নির্বান্ধব দেশে। অর্থ মিললেও হৃদয়ের স্পর্শ সেখানে নেই।

কিন্তু এখানে সেটা আছে অর্থের প্রাচুর্য না থাক।

নৃপেন বলে—এ দেশে তবু খাটুনির সীমা আছে, ওদেশে, বিদেশে তাও নেই মা। কঠিন সেই জীবন।

সাথী চুপ করে কি ভাবছে।

মনে হয় বিজয় সেই কঠিন জীবনের লড়াই-এর ভিড়ে কোথায় হারিয়ে গেছে। ভুলে গেছে এদেশের কথা:

সাথীও প্রসঙ্গ এড়াবার জন্য বলে।

কলকাতার কাছেই আছিস, একবার কমলা মাসীমার সঙ্গে দেখা করিস। কতদিন ওদের খবর পাইনি। শুনেছি নোতুন বাড়ি করেছে সল্টলেকে। ঠিকানাও জানিনা।

নৃপেনের মনে পড়ে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের কথা। কমলামাসীমা এখন অনেক বড় কর্মচারী। সেদিন তিনিই কারখানার উদ্বোধন করেছিলেন।

নৃপেন ওসব কথা মাকে জানালে মাই হয়তো তাকে দেখা না করার জন্য কিছু বলবে, তাই ওসব প্রসঙ্গ এড়িয়ে গিয়ে বলে।

—যাবো এইবার একদিন ঠিকানা বের করে। ক'মাস তো ঝড়ের মত দিনরাত কাজ করেছি।

সাথী বলে,এত খাটিস না বাছা! শরীরের দিকে নজর রাখবি।

নৃপেন বলে, এ তোমার অকারণ ভাবনা মা।

মায়ের মন। আজ নৃপেনই সাথীর একমাত্র অবলম্বন, তাই মায়ের মনে ব্যাকুলতা ফুটে ওঠে। সাথী বলে।

ওখানে নোতুন কোয়াটার পেয়েছিস। তাহলে এইবার নিয়ে চল বাবা।

নৃপেনের কথাটা ভাবতে ভালো লাগে।

দিনান্তে কাজের পর মায়ের কাছে ফিরবে। অফিসার্স মেসের সেই এক ঘেঁয়ে

খাওয়ার বিড়ম্বনার হাত থেকেও বাঁচবে সে।

খুশী হয় কথাটা ভাবতে। তবু বলে নৃপেন।

—এ বাড়ি?

সাথী বলে—কাজের লোক ওই বনমালী দা থাকবে এখানে। তোর বাবাও মাঝে মাঝে যাবে ওখানে। একা একা তোকে ফেলে থাকতে পারবো না বাবা।

নৃপেন বলে, ঠিক আছে। তুমি গোছ-গাছ করে রাখো, বাবাকেও বলো। সামনের শনিবার এসে তোমাকে নিয়ে যাবো।

সাথীও খুশি হয়। তবু নিজের ছেলের কাছে থাকতে পারবে সে। এ তার অনেক দিনের সাধ। ওকে নিয়েই সাথী তার শূন্য জীবনকে পূর্ণ করার স্বপ্ন দেখে।

বিজয় যেন এবার ক্লান্তি বোধ করে।

এতদিন ধরে সে ছুটেছিল উল্কার মত। জার্মানী, ওয়েলস—লিভারপুল-লণ্ডনে কত দিনরাত্রি কাটিয়েছে কঠিন পরিশ্রমের মধ্যে।

আমেরিকায় হোটেলে কাজ করেছে, চাকরী করেছে ম্যানহার্টন এলাকার অন্ধকার কোন অপিসে, ঘুরেছে পাতালপুরীর সাবওয়েতে চাকরী কিছু করার সন্ধানে।

কত দিন, কত রাত্রি, কত দীর্ঘপথে কেটেছে পরিশ্রমের কাঠিন্য নিয়ে। বুকে তার একটি স্বপ্ন। একদিন বিজয়ীর মত দেশে ফিরবে। কিছু করবে সেখানে।

আজ সেই স্বপ্ন সার্থক হয়েছে। কিন্তু ক্লান্ত বিজয় ভেবেছিল এবার শান্তি পাবে। কিন্তু সেটা তার জীবনে যেন নেই।

ক'দিনের জন্য বিজয় এবার ছুটি নিয়ে এসেছে দীঘার নির্জন সৈকতে। কমলাও এসেছে বেড়াতে। বিজয়ই টেনে এনেছে তাকে। বহু বছর পর আজ তারা দুজনে সব কাজ ছেড়ে কয়েকদিনের জন্য এই সবুজ ঝাউবনের রাজ্যে রুপালী বালিয়াড়ির দেশে—নীল সমুদ্রতীরে এসেছে।

বালিতে বসে আছে তারা।

ওদিকে সমুদ্রের ঢেউগুলো ভেসে পড়ে।

বাতাসে ঝাউবনের সুরে সুর মিলেছে, সমুদ্রের গর্জনের সুর। গাংচিল-গুলো ঢেউ এর মাথায় ছোঁ দিয়ে শিকারের আনন্দে কলরব করছে। দু-চারটে নৌকা-লঞ্চকে দেখা যায় ওই উথাল পাথাল ঢেউ-এর মাথায়।

বিজয় বলে—আরও কতদূর দৌড় বাকী তা জানিনা বৌদি। তবে মনে হয় একটা পেটের জন্য অনেক করেছি। আর কেন? এইবার থামতে চাই। আর কোন ভবিষ্যৎ-এর স্বপ্ন দেখিয়ো না।

কমলা শুনছে ওর কথাগুলো।

মনে হয় বিজয় যেন ক্লান্ত।

ক্লান্ত কমলাও।

জীবনের দীর্ঘপথ দুজনে পাড়ি দিয়েছে, আজ যেন থামতে চায়।

এতদিন মনে হয়েছিল শান্তি পাবে এই কাজ শেষ করতে পারলে, কিন্তু শান্তি যেন মায়া দিগন্ত রেখা।

দূর দিকচক্রবালে চাইলে মনে হয় আকাশ ওখানে মাটিতে-সমুদ্রে মিশে পৃথিবীর সীমা রেখা রচনা করেছে। ওখানে আছে বিশ্রাম, শান্তি। সেখানে ছুটে গিয়ে মানুষ দেখে পৃথিবীর থামার সীমারেখা আরও দূরে দিগন্তে। সেখানে গিয়েও সেই একই দৃশ্য।

ও কেবল দূরে দূরেই সরে যায় মানুষকে বৃথা শান্তির মোহ দেখিয়ে। ওর সঠিক সীমানা নেই।

তাদের জীবনেও যেন প্রকৃতির সেই সত্যটাই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

কোথায় এতদিনের শূন্যতাটা যেন এবার স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে।

কমলা বলে—আমিও ক্লান্ত বিজয়। সারাটা জীবন শুধু দৌড়েছি। আজ মনে হয় সাথী ভালোই করেছে। সে তবু তার সংসার-ছেলেকে-স্বামীকে নিয়ে সব ভুলে আছে। আমিও নিজেকে মাঝে মাঝে দোষী মনে করি বিজয়।

বিজয় চাইল ওর দিকে।

কমলা বলে, যা তুমিও পেতে পারতে তার থেকে আমিই তোমাকে বঞ্চিত করেছি। হয়তো সাথীকে ইচ্ছা করেই আঘাত দিতে চেয়েছিলাম, তোমাকেও।

এড়াবার চেষ্টা করে বিজয় বলে।

ছাড়োতো বৌদি ওসব কথা। তুমি একজনকে সুখী ভাবছো—দেখগে তার জীবনেও নিশ্চয়ই কোথাও একটা দুঃখ রয়ে গেছে। এ জগতে মানুষ সুখের সন্ধান করে শুধু ব্যর্থই হয়েছে। তাই ওসব ভুলে থাকাই ভালো।

ওরা যেন দুজনে সেইজন্যই সব ভুলে থাকার জন্য এখানে এই সুন্দর ছুটির দেশে এসেছে দীঘার ব্লু ভিউ হোটেলে।

হোটেলে ফিরে সবুজ লনে বসে আছে। সামনে ঝাউবনের ধারে সমুদ্র ভেঙ্গে পড়ছে, বাগানে রঙ্গীন ফুলের মেলা।

হঠাৎ কার ডাকে চাইল বিজয়।

বেয়ারা এসেছে। বলে সে—আপনার ট্রাংকল।

বিজয় ওঠে গিয়ে অপিসে ফোনটা ধরেছে। ওদিক থেকে খবরটা আসে, নৃপেন ফোন করছে।

—এখানের কারখানায় খুব গোলমাল সুরু হয়েছে স্যার। কিছুদিন ধরেই একটা গোলমাল-এর সূত্রপাত হয়েছিল গোপনে। কাল থেকে সেটা বেড়ে উঠেছে। কিছু শ্রমিক কর্মচারী বিভিন্ন সেকশনে নানা দাবীতে কাজ বন্ধ করেছে। দু'একটা সেকশনে গোলমালও হয়েছে। আজও নাকি

হতে পারে।

বিজয় খবরটা শুনে চমকে ওঠে।

—সেকি! কারা এসব করছে? কেন?

ওদিক থেকে নৃপেন বলে—ঠিক বোঝা যাচ্ছে না স্যার। তবে অনেকেই এর মধ্যে আছেন. ফোনে বলা যাবে না।

হঠাৎ ফোনটা কেটে যায়। কিন্তু গোলমালের শব্দও শোনা যাচ্ছিল। বিজয় ডেকেও সাড়া পায় না। বোধ হয় লাইন কেটে গেছে।

ফোনটা রেখে ভাবছে সে।

এমনি একটা বিরাট গোলমালে পড়তে হবে তা ভাবেনি বিজয়। কারখানা ঠিক মতই চলছিল. ছ'মাসেই তারা লাভের মুখ দেখেছে, কারখানা আরও বাড়াচ্ছিল, বাজারে তাদের সুনামও হয়েছে, অনেক কোম্পানীর মাল-এর কাটতি কমে গিয়ে তাদের মালই বেশি চলছিল। কিন্তু এমনি সময় এই কাণ্ড ঘটে যাবে তা ভাবতেই পারে নি বিজয়। চিন্তায় পড়েছে সে।

কমলা ওকে ফিরে আসতে দেখে চাইল।

—কি হলো বিজয়?

বিজয় এর মধ্যেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বলে সে।

—এখুনিই কলকাতায় ফিরতে হবে বৌদি। কারখানায় খুব গোলমাল সুরু হয়েছে।

—সে কি! কমলাও বিস্মিত হয়।

বিজয় বলে—এমনি হবে ভাবিনি। কর্মচারীদের আমরা মাইনে ভালোই দিই অন্য অনেক কোম্পানীর তুলনায়।

অন্য সুযোগ সুবিধাও দিয়ে থাকি, হঠাৎ এসব কেন সুরু হল বুঝতে পারছি না।

কমলা এখানের শ্রমিক আন্দোলনের ব্যাপারে, মাতব্বরদের ব্যাপারেও কিছু জানে যে বিজয় তাদের পাত্তা দেয় নি। হয়তো সেই কারণেই কিছু ঘটতে চলেছে।

কমলা বলে—এখানের হাওয়া তুমি জানো না বিজয়। হয়তো কারো উস্কানিতেই এই আন্দোলন গড়ে উঠেছে।

বিজয় অবাক হয়।

ওরা নিজেরা নিজেদের ভালো মন্দ বোঝে না? তাই যদি হয় তাহলে আমিও ব্যবস্থা নোব বউদি। পৃথিবীর অনেক বড় বড় দেশে এই ধরণের ব্যাপার চলে না, তারা তাই দেশকে শিল্পসমৃদ্ধ করে তুলেছে। আর ওই কিছু মাতব্বরের উস্কানিতে যদি তারা এ কারখানায় গোলমাল করে—দরকার হলে কারখানা তাদেরই চালাতে দেব। চালিয়ে কি পায় দেখুক তারা? কত

হিম্মৎ লাগে। কত লাভ আসে ?

কমলা বলে—তাতে ওরা রাজী হবে না।

বিজয় বলে—তাহলে ? কাজ করবো না—ঝুঁকি নোব না, শুধু দিতে হবে তাদের ? এ করে কোন প্রতিষ্ঠান কেন সারা দেশই ডুবে যাবে একদিন। এই সর্বনাশকে কেউ ঠেকাতে পারবে না ; এ কথাটা নেতাদের বোঝার দিন এসেছে।

কমলা চুপ করে থাকে।

গাড়িটা ফিরছে কলকাতার দিকে। বিজয়ের চোখে মুখে উত্তেজনার ছাপ।

কমলাও তা দেখেছে।

বলে সে, উত্তেজিত হয়ে কোন সিদ্ধান্ত নিয়ো না বিজয়। ওদের সঙ্গে আলোচনা করে ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করবে। আমিও দেখছি। লেবার কমিশনারকে গিয়ে বলবো যাতে কেসটা তাঁরাও টেক আপ্ করেন। একটা পথ নিশ্চয় হবে -এত ভেবো না বিজয়।

বিজয় কি ভাবছে। তার মনে হয় দীর্ঘ ক'বছরে তার দেশের মানসিকতাতেও একটা পরিবর্তন এসেছে। যেটার কথা ভাবে-নি সে।

সাথীর প্রথমে এসে জায়গাটাকে ভালোই লাগে।

ওদিকে কল্যানীর সহর গড়ে উঠেছে। সুন্দর সাজানো সহর—গাছগাছালির অভাব নেই।

এক একটা রাস্তার ধারে এক এক ধরণের গাছ।

কোথাও নিম, কোথাও বকুল, কোথাও চাঁপা, কোথাও কৃষ্ণচূড়া, কোথাও ছাতিম ফলে সারা সহর সবুজ স্নিগ্ধ, ফুল গন্ধময়। ওদিকে বিরাট আমবাগানের মধ্যে সতীমায়ের মন্দির।

ওপাশে গড়ে উঠেছে কারখানাগুলো। তাদের কারখানাতেও কোয়ার্টার তৈরী হচ্ছে, তখন ওদিকে চলে যাবে। এর মধ্যে কোম্পানী তাদের সহরের এই দিকে কিছু বাড়ি দিয়েছে।

নৃপেন সকালেই কারখানায় চলে যায়। বাইরে, ব্রেকফাস্ট সেরে নেয় কাজের চাপ থাকলে, ফেরে সেই বৈকালে। দরকার পড়লে সন্ধ্যার দিকেও একবার চলে যায় স্কুটার হাঁকিয়ে।

সাথী এবার স্বপ্ন দেখছে নৃপেনের বিয়ে থা দেবে,

একা একা তার ভালো লাগে না। আশপাশের বাড়ির দু-চারজন বৌ মেয়ে, গিন্নীদের সাথেও আলাপ হয়েছে।

সময়টা কেটে যায় কোন মতে।

তবু নিঃসঙ্গ দিনগুলোয় তার মনে বিস্তার জট পাকায়। ছুটির দিন প্রশান্ত আসে, নৃপেনও থাকে। সেদিন ভালোই লাগে। কিন্তু অন্য দিনগুলোয়

সাথীর ভালো লাগে না।

সাথী নৃপেনকে বলে, এত কিসের কাজ? দিনরাত কারখানাতে থাকতে হবে নাকি? আচ্ছা মালিক তো!

নৃপেন বলে, ডিরেক্টারকে দেখো নি—কি খাটতে পারেন। বলেন—লাভ দি ওয়ার্ক অর লিভ ইট। কাজকে ভালোবাসো—না হয় কাজকে ছেড়ে দাও। তবে মাইনেতো ভালোই দেয় মা।

সাথীর ওই অদেখা মালিকের উপরই রাগ হয়।

বলে সে, তোদের মালিকের ঘর সংসার নেই না?

নৃপেন বলে—না। বিয়ে থা করেন নি। সারা জীবন পৃথিবীর কত দেশে ঘুরেছেন, বলেন পৃথিবীতে যারাই বড় হয়েছে—সেই দেশের ভালোটাই শিখতে হয়। কাজই নাকি তাদের কাছে সব চেয়ে বড়।

সাথী বলে—ছাই। মালিকরা এমন বড় বড় কথা বলে নিজেদের স্বার্থে। আর ওরা—

নৃপেন বলে, ইনি ঠিক তেমন নন মা। মদও খায় না—সিগ্রেটও খান না। ওকে দেখলে তোমারও ভালো লাগবে।

সাথীর দেখার বাসনাও নেই। বলে সে।

—আর দেখে কাজ নাই বাবা।

নৃপেনও দেখেছে কারখানার বেশ কিছু কর্মীর মধ্যে হঠাৎ যেন অভিযোগ গুলো পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে। কোম্পানী লাভ করছে প্রচুর, সুতরাং তাদের মজুরী বাড়াতে হবে, টিফিন-এর ব্যবস্থা করতে হবে ফ্রিতে, আরও নানা দাবীও জুড়ে তারা আন্দোলন সুরু করেছে।

আর বিজয়বাবু ক'দিনের জন্য বাইরে যেতেই হঠাৎ সেই ধূমায়িত বহ্নির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

কারখানার দেওয়াল জুড়ে—সহরের সর্বত্র ষ্টেশনে পোষ্টার পড়েছে হাজার হাজার, শ্রমিক সংগঠনও এবার আসরে অবতীর্ণ হয়েছে—তাদের শোষণ করে কোম্পানী লাখ লাখ টাকা মুনাফা লুটছে, তাদের দাবী মানতেই হবে।

অবশ্য অন্তরালে কালো হাতগুলোর খবর নৃপেন সঠিক জানে না।

শশী নায়েককে সেদিন কারখানার ময়দানে ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতাও দিতে দেখেছে। শশী নায়েক ঘোষণা করে।

—ভাই সব, এই লাভের মোটা অংশ শ্রমিকদের প্রাপ্য।

তুমুল হাততালির শব্দ ওঠে।

দেখা যায় দূরে দাঁড়িয়ে আছে কারখানার আরও কিছু পদস্থ কর্মচারীও।

ওয়ার্কস্ ইন্‌জিনিয়ার ফটিক চ্যাটার্জি, মিঃ দত্তকেও দেখা যায়।

একটু অবাক হয়েছে নৃপেন।

ওদের ব্যাপারও দেখেছে। হঠাৎ যেন মিঃ চ্যাটার্জি, মিঃ দত্তরা কেমন বেশী শ্রমিক দরদী হয়ে উঠেছে।

মিঃ ঝুনঝুনওয়ালাও সব খবরই পায়। মায় এই কোম্পানীর ছ'মাসের লাভ-এর হিসাব, কোথায় কোন ডিপোতে কি মালপত্র যায়, তাদের মার্কেট সার্ভে রিপোর্টও পেয়ে গেছে। অবশ্য দু'একজন পদস্থ কর্মচারীকে কিছু দিতে হয়েছে।

তারপরই ওরা কাজে লাগিয়েছে শশী নায়েককে।

শ্রমিকদরদী শশী নায়েকের রাগটা ছিলই, সেই-ই এবার বিজয়বাবুকে জানিয়ে দিতে চায় শশী নায়েককে চটিয়ে এখানে ব্যবসা করা যাবে না।

শ্রমিক সংগঠনও গড়ে ফেলেছে শশী নায়েক এখানে।

পোস্টার ইত্যাদির জন্য টাকাও আসছে ওই ঝুনঝুনওয়ালাদের কাছ থেকে গোপনে। গাড়িও পেয়েছে শশী নায়েক।

তাই উদাত্ত স্বরে শ্রমিকদের প্রতি তার অকৃত্রিম দরদ ঘোষণা করে—ভাইসব, তোমাদের নায্য দাবী মানতেই হবে কোম্পানীকে। নাহলে কারখানায় ধর্মঘট করবো আমরা। শ্রমিকদের মেরে মুনাফা করা চলবে না।

বহু শ্রমিকও হঠাৎ আরও কিছু পাবার লোভে, নেশায় মেতে উঠেছে। কাজ ফেলে তারা মিটিং করছে। আলোচনা করছে।

নৃপেন এবং আরও কিছু তরুণ ইঞ্জিনিয়াররাও দেখেছে এইসব ব্যাপার। তারাও বলে ওয়ার্কস্ ম্যানেজার মিঃ চ্যাটার্জিকে।

—স্যার, মেসিন চালু রেখে, কাজ ফেলে ওরা এইসব করবে?

মিঃ চ্যাটার্জি আজ অন্য কারখানায় ম্যানেজার হবার প্রস্তাব পেয়েছে। বলে সে—ওদের বলে লাভ নেই। যা করছে করুক, কোম্পানী বুঝবে।

অবাক হয় নৃপেন—আপনি কিছু বলবেন না?

মিঃ দত্ত বলে—তুমি যা করছো করগে ছোকরা। ওদের ব্যাপারে কথা বলে বিপদ হবে তা জানো?

সরে এল নৃপেন—প্রভাস আরও ক'জন।

ওরা বুঝেছে কোম্পানীকে যেন ওরা ইচ্ছা করেই বিপদে ফেলতে চায়। বিজয় বাবুও ক'দিন কাজে বাইরে গেছেন। আর ওরা এই অবকাশে এমনি ভাবে আন্দোলন গড়ে কোম্পানীকে ডোবাতে চাইছে।

প্রডাকসন প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে।

আন্দোলনই চলছে। ফ্যাক্টরীর ময়দানে জমায়েত শ্রমিকদের মধ্যে এবার নোতুন চীৎকার ওঠে।

—দালালদের হালাল করো। কোম্পানীর দালালদের চিনে রেখো ভাইসব তাদের আমরা ক্ষমা করবো না।

প্যাকিং সেকশনের নটবর—আরও দু'চারজন হঠাৎ নেতার ভূমিকা নিয়ে এবার গর্জন করে।

প্রভাস বলে—নৃপেন, ব্যাপার ভালো বুঝছি না। ওরা আমাদের উপরই খেপে উঠেছে।

নৃপেন বলে—ওদের খেপিয়ে তোলা হয়েছে। এমনি করে প্ল্যান করে ওরা কোম্পানীর সর্বনাশ করতে চায়। এ হতে দেব না। আমি ফোন করছি এম-ডি কে।

নৃপেন ফোন করার সময়ই ওই নটবরের দল খবর পেয়ে যায় কি ভাবে। ওরা চায় না বিজয়বাবু এত তাড়াতাড়ি ফিরে আসুক। ওই লোকটিকে চিনেছে তারা। নটবররাও জানে কারখানায় বেশ কিছু সংখ্যক শ্রমিক-কর্মচারী আছে যারা এইসব আন্দোলন চায় না।

বিজয়বাবু ফিরে এলে তাদের আন্দোলন হয়তো ব্যাহত হবে, তাই ওরা চায়নি যে কেউ খবর দিক। কিন্তু নৃপেনকে ফোন করতে দেখে ওরা এসে হামলা করেছে।

একজন ফোনটা কেড়ে নিয়ে শাসায়।

—চুকলিবাজী করলে জান চলে যাবে।

চুপ করে যায় নৃপেন। ওরা এবার প্রকাশ্য সভায় ঘোষণা করে। শ্রমিক বিরোধী এইসব কর্মীদের কথা।

নৃপেন কোনরকমে ফিরে এসেছে বাসায়।

কারখানায় গোলমালটা তখন তুঙ্গে উঠেছে। সব সেকশনের কাজই প্রায় জোর করে কিছু লোক বন্ধ করে দিয়েছে।

সাথী নৃপেনকে অসময়ে ফিরতে দেখে চাইল। শুধোয় সে।

—কি হয়েছে রে নৃপেন? শরীর খারাপ নাকি?

নৃপেন চাইল মায়ের দিকে। বলে সে।

—না মা। কারখানায় অকারণে গোলমাল সুরু হয়েছে। লেবাররা কাজ বন্ধ করেছে, বাধা দেবার চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু ওরা শোনেনি।

সাথী ভয় পায় ওসব শুনে।

বলে সে—কি দরকার বাবা ওসব গোলমালে থেকে। যদি কোন বিপদ হয়ে যায়! মালিকরাই বুঝুক বাবা, কাজ নেই তোর, ওসব গোলমালে থেকে।

নৃপেন বলে—এম-ডি.-কে ওরা ফোনও করতে দিল না। এভাবে ওরা ডুবিয়ে দেবে এমন প্রতিষ্ঠানকে?

সাথী ছেলেকে কাছে টেনে নিয়ে বলে।

—তুই এসব ব্যাপারে থাকিস না বাবা। শেষকালে যদি কোন বিপদ হয়। না—বাবা। দরকার হয়, এ চাকরি ছেড়ে দিবি।

নৃপেন বলে—তাই বলে এতবড় অন্যায়কে মুখ বুজে সইতে হবে মা ?

ছেলের দিকে চেয়ে থাকে সাথী।

নৃপেন বলে—কিছু লোকের স্বার্থে বহু মানুষের সর্বনাশ হতে দেবনা, আমরাও এই প্রতিষ্ঠান গড়েছি একে ধ্বংস হতে দেব না। দরকার হয় এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবো এম. ডি-র পাশে।

সাথী চমকে ওঠে।

—কি বলছিস তুই ?

নৃপেন বলে – হ্যাঁ মা, ডিরেক্টার সাহেব আসছেন—আমরাও বসে থাকবো না।

সাথী বলে—ডিরেক্টার যা ভালো বোঝে করুক। তুই যাবি না।

ফোনটা বাজছে।

বিজয় ফিরে এসেছে কারখানাতে দীঘা থেকে। এসেই খবরও পেয়েছে। তাই ফোন করছে নৃপেনকে।

নৃপেন ফোনটা তুলে বলে।

—এসেছেন স্যার! আমি আসছি। হ্যাঁ প্রভাস—জীবনদেরও নিয়ে যাচ্ছি। এখুনিই। না না, ওসব ভয় আমার নেই স্যার। আসছি।

ফোন রেখে নৃপেন বের হতে যাবে।

সাথীর মনে আতংক জমেছে। মায়ের মন তার একমাত্র ছেলের জন্য অজানা ভয়ে কেঁপে উঠে। বলে সে।

—যাস্ নে নৃপেন। ওদের গোলমালে তুই যাসনে।

নৃপেন বলে—কোন ভয় নেই মা। তুমি বাধা দিও না। এম-ডি.-কে আমি শ্রদ্ধা করি। আজ তাঁর এ বিপদে আমাকে যেতেই হবে মা।

নৃপেন বের হয়ে গেল সাথীর কথায় সাড়া না দিয়ে।

সাথী পিছনে পিছনে আসে। নৃপেন স্কুটার নিয়ে চলে গেছে। দূরে কারখানার শেডগুলো দেখা যায় মাঠের ওদিকে। ওখানে যেন বেশ লোকজনও জমেছে। মাইকে কি সব চীৎকার শোনা যায়। সাথীর মন কি অজানা ভয়ে কেঁপে ওঠে।

বিজয় ফিরে এসেছে।

কারখানার সামনে তখন শশী নায়েক শ্রমিক সভায় উদাত্ত কণ্ঠে ভাষণ দিচ্ছে, —ভাইসব, কোম্পানীকে তোমাদের দাবী মেনে নিতেই হবে। বিজয়কে দেখে বেশ কিছু শ্রমিক কর্মচারী এগিয়ে আসে, ওরা যেন একটু ঘাবড়ে গেছে।

কিন্তু শশী নায়েক তাদের মনের জোর ফিরিয়ে আনার জন্য তখন শ্লোগান দিয়ে চলেছে। বিজয় ওদিকে একবার চেয়ে গাড়ি নিয়ে ভিতরে ঢুকে গেল।

ওয়ার্কস ইন্‌জিনিয়ার মিঃ চ্যাটার্জি, মিঃ দত্তদেরও ডাকিয়ে এনেছে। তার

অপিসে।

বিজয় এই কারখানার পরিবর্তনটা দেখে বিস্মিত ক্রুদ্ধই হয়েছে। শুধোয় সে—এসব চলছে আমাকে খবরও দেননি কেন?

মিঃ চ্যাটার্জি বলে—ওরা বাধা দিয়েছিল স্যার। তাছাড়া ভেবেছিলাম যে, ওসব মিটে যাবে।

বিজয় দেখছে ওকে।

ওদেরকে প্রথম থেকেই তার ভালো লাগেনি। ওদের তুলনায় তরুণ ছেলেদের কাজ তার ভালো লেগেছে। আর এই বিপদের খবর ওরা জানায়নি, জানিয়েছিল তাকে নৃপেনই।

বিজয় ওদেরই ডেকে পাঠিয়েছে।

বিজয় বলে মিঃ চ্যাটার্জিকে—আপনাদের উপর যা দায়িত্ব ছিল তা পালন করেননি। হয় ইচ্ছা করেই এটা করেছেন, নাহয় কাজে অবহেলাই করেছেন। নিজেদের অযোগ্যতার প্রমাণই দিয়েছেন। যান।

মিঃ চ্যাটার্জি—মি দত্তরা রাগ-অপমান চেপে বের হয়ে এসে এবার রাগে ফেটে পড়ে। বিশেষ করে নৃপেন—আরও কিছু তরুণ ছেলেদের আসতে দেখে। মিঃ দত্ত বলে।

—বলিনি ওরাই চুকলি খেয়েছে। ওই নৃপেন, প্রভাসের দল।

চাটার্জি বলে—ওদেরও ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

শশী নায়েক জানতো বিজয়বাবু তাদের ডাকবেন আলোচনার জন্য। শশী নায়েক তাই বিজয়বাবুকে আলোচনায় বসার জন্য ডাকতে দেখে বলে।

ভাইসব, মালিক পক্ষ এবার আলোচনায় বসতে চান। নটবর এবং আরও চার পাঁচজন শ্রমিক কর্মচারীকে নিয়ে শশী নায়েক চলেছে এবার ম্যানেজিং ডিরেক্টারের ঘরের দিকে। যেন যুদ্ধ জয় করতেই চলেছে সে। শ্রমিকরা চীৎকার করে ওঠে।

আমাদের দাবী মানতে হবে। দালাল বাজী চলবে না। দালালদের হালাল করো।

ওই চীৎকার যেন এদের মনের পুঞ্জীভূত-লোভের ক্লেদ নিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে।

বিজয় এর মধ্যে তার ইতিকর্তব্য স্থির করে ফেলেছে।

ওদের জন্য অনেক কিছুই করেছে সে। মাইনেও ভালো দেয়।

বাসা—মেডিক্যাল এলাউন্স সবই দেয়। আরও বড় করছিল কারাখানা যাতে আরও কিছু শ্রমিক কর্মচারীর কাজের সংস্থান হয়।

কিন্তু এই ব্যাপার দেখে চমকে উঠেছে সে।

অকারণে কাজ বন্ধ করে এইভাবে মালিকের কিছু বিশ্বস্ত কর্মচারীদের

দোষীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে অপমান করবে এমনি অকারণে তা ভাবেনি।

বিজয় ওদের চকিতে দেখে চাইল।

শশী নায়েক বলে—বলুন কি সর্তে আলোচনা হবে।

বিজয় ওকে দেখে বলে প্রথম সর্ত আপনি এ আলোচনায় যোগ দেবেন না। শ্রমিক মালিকদের মধ্যে আলোচনায় আপনি কেন আসবেন।

চমকে ওঠে শশী নায়েক।

নটবর—হরিপদ—নকুল আরও শ্রমিক কর্মচারীরা বলে,

উনি আমাদের নেতা স্যার!

বিজয় বলে—প্রশ্নটা উঠেছে মালিক—শ্রমিকদের দাবী নিয়ে। আমি কারখানার কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে প্রস্তাব রাখছি, তোমরা এখানের সব শ্রমিক কর্মচারীরই এই কোম্পানীর মালিকানায় শেয়ার থাকবে। তোমরাই এই কারখানার দায়িত্ব নিয়ে চালাও, আমরা সরে যাচ্ছি। লাভ হয় তোমরাই অংশমত ভাগ পাবে।

নটবর—হরিপদের দল চুপ করে যায়।

কারখানা চালাবার মত এলেম তাদের নেই। অনেক সমস্যা আছে এতে। ওরা ভাবেনি কোম্পানী এমনি একটা কথা বলবে।

হরিপদ বলে—এসব বাজে কথা বলছেন স্যার?

বিজয় বলে—না। তাহলে শ্রমিকদের সঙ্গে আলোচনা করে এসো—আমরা সেইমত কাগজপত্রে সই করে কোম্পানীর দায় দায়িত্ব, লাভ লোকসানের সব ভার তোমাদের হাতে তুলে দেব। প্রতিষ্ঠানকে বাঁচাবার দায়িত্বও তোমাদের। তোমরাই হবে এর মালিক।

যত বেশী কাজ করবে, প্রডাকশনও বেশী হবে। লাভ হবে তত বেশী। আর কাজ না করে আন্দোলন করে শুধু দাবী পেশ করলে কি অবস্থা হবে সেটাও তোমরা জানতে পারবে।

আমি চাই কাজ হোক আগে, তারপর লাভ করো, প্রাপ্য বুঝে নাও। তার আগে নয়। রাজী থাকলে আমি সেই ব্যবস্থাই করে দেব।

নটবর এসব কথার জন্য তৈরী ছিল না। এতে দায়িত্ব অনেক বাড়বে, কাজও বেশী করতে হবে। আর সকলকে কাজ করার কথাও বলতে হবে। এতে সুখ নেই।

তাই নটবর বলে।

—এসব চাই না স্যার। কোম্পানী লাভ করেছে তারজন্য আরও মাইনে বাড়াতে হবে

বিজয় বলে—আর লোকসান করলে তার দায়িত্ব কে নেবে? অন্য দেশে কিন্তু লোকসান হলে মালিক শ্রমিকদের ছাঁটাই করে সহজেই।

হরিপদ বলে—আমরা পার্মানেন্ট স্টাফ, শ্রমিকদের ছাঁটাই করা চলবেনা।

বিজয় বলে—তাই তো বলছি, এ কোম্পানী তোমরা নিয়ে চালাও। আমাদের কোন স্বার্থ নেই। তবে লোকসান দিতেও পারবে না।

তোমাদের হাতেই তুলে দিচ্ছি—একে চালাও।

কিন্তু তাতেও রাজী হতে পারে না এরা।

হরিপদ বলে—এ একটা বাজে চাল। এসব মানি না।

শশী নায়েক বলে।

আপনারা এদের ঠকাতে চান। বঞ্চিত করতে চান।

আমরাও দেখে নোব।

ওরা বের হয়ে আসে, বিজয় চুপ করে কি ভাবছে।

বাইরে অপেক্ষমান জনতাও জেনেছে যে আলোচনা ব্যর্থ হয়েছে। কর্তৃপক্ষ তাদের কিছু দেবে না। আজেবাজে লোভ দেখিয়েছে মাত্র। নগদ কিছু প্রাপ্তিযোগ না ঘটায় এবার তারাও মরীয়া হয়ে উঠেছে।

জনতার মধ্যে অনেকেই গর্জন করে।

—ধর্মঘট চলছে, চলবে।

শশী নায়েক অবশ্য খুশীই হয়েছে আলোচনা ভেঙ্গে যাওয়ায়।

বিজয়ের ওই প্রস্তাবে সে চমকে উঠেছিল। ভেবেছিল শ্রমিকরাও এমন লোভনীয় প্রস্তাবে রাজী হয়ে যাবে।

কিন্তু তা হতে দেয়নি শশী নায়েক।

জনতা গর্জন করছে—আমাদের দাবী মানতে হবে।

সারা কারখানার আকাশে বাতাসে যন্ত্রের গর্জন আর কাজের পরিবেশ নেই। ওসব মুছে গিয়ে শুধুমাত্র ওই মানুষদের কলরব ওঠে। তবু বেশ কিছু কর্মচারী এটাকে পছন্দ করে নি। তারা চেয়েছিল কাজ চালু রাখতে, অনেকেই বলেছিল, কাজ বন্ধ না করে দাবী পরে জানাবে, প্রডাকশন চালু থাকুক।

কিন্তু কিছু বাইরের লোককেও এনেছে শশীনায়েক টাকা দিয়ে।

তারা গর্জন করে—কাজে হাত দিলে জান চলে যাবে। কাজ বন্ধ। নাহলে মেসিনপত্রও গুঁড়ো করে দেব।

সুতরাং শান্তি রক্ষার জন্য প্রাণের ভয়েই ওরা ইচ্ছা থাকলেও কাজ করতে পারে নি। তারা নীরবে ওই জনতার দিকে চেয়ে থাকে।

তাদের মুখের অন্ন কেড়ে নেবার জন্য মালিকপক্ষ নয়—ওই কিছু শ্রমিক সাজা ভিন্ন ধরণের মানুষই বিশেষ কারো স্বার্থে এগিয়ে এসেছে।

বিজয় সবই শুনেছে নৃপেন—প্রভাস—জীবনদের কাছে। নিজেও শ্রমিকদের সঙ্গে আলোচনা করেছে। বেশ বুঝেছে ওদের থামানো যাবে না; আর এই দাবী একবার মেনে নিলেও ওদের সমস্যার সমাধান হবে না।

বিজয় বলে—এই নীতিকেই মানতে রাজী নই মিঃ চ্যাটার্জি।

ওদের হাতে সব তুলে দিতে চেয়েছিলাম ওরা তাতেও রাজী নয়।

ওরা কাজ না করে তাদের সবকিছু পেতে চায়, এটা সম্ভব নয়।

এ কারখানা আমরা বন্ধই করে দেব। দরকার হলে ক্লোজার ডিক্লেয়ারই করবো। ফুলটন কোম্পানীকে এদেশে এনেছিলাম তাদের কর্মনীতি দিয়ে, এখানের পরিবেশে কিছু গড়ে তুলতে, এর থেকে লাভ তারা নেয় নি, নেবেনা। প্রতিষ্ঠানকে বড় করতে চেয়েছিলাম যাতে আরও কর্মসংস্থান হয়। কিন্তু তাই যদি না হয় একে বন্ধই করে দেব। যা লোকসান হয়েছে কোম্পানী তা সইতে পারবে।

দেশে আমি এসেছিলাম অনেক আশা নিয়ে আবার ব্যর্থ হয়েই ফিরে যাবো।

নৃপেনরা শুনছে ওর কথাগুলো।

বিজয় আজ মনস্থির করে ফেলেছে। শুনেছে নৃপেনদের উপর ছোট খাটো হামলাও করেছে শ্রমিকরা। বিজয় বলে।

—আমি কারখানা বন্ধই করে দিচ্ছি। ওরা যদি পরে ঠান্ডা মাথায় বিবেচনা করে কাজ করতে চায় ভেবে দেখবো। নাহলে ওই-ই আমার মত!

এ খবরটা ছড়িয়ে পড়েছে।

শ্রমিকরাও বুঝেছে বিপদের গুরুত্ব। তাই তারাও এবার যেন রুখে উঠেছে।

বিজয় বের হয়ে যাচ্ছে কারখানা থেকে। খবরটা হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ে।

শশী নায়েকের আনা বাহিনীও এবার তৈরী হয়েছে।

দরকার হলে তারা চরম আঘাতই হানবে।

নৃপেন—প্রভাসরা বাধা দেয় বিজয়কে।

—আপনি এ অবস্থায় বের হবেন না স্যার? ওরা হয় তো গোলমাল করবে।

বিজয় বলে—যা খুশী করুক ওরা।

ও গাড়িতে উঠছে। নৃপেন, প্রভাসও উঠেছে।

গাড়িটা বের হয়ে যাবার মুখেই কলরব করে ঝাঁপিয়ে পড়ে শশীনায়েকের বাহিনী, হরিপদের দল। ওরা বিজয় বাবুকে চলে যেতে দেবে না।

বাধা পেতে বিজয় নেমেছে, নৃপেন—প্রভাসরাও রয়েছে।

গোলমাল চীৎকার ওঠে। শশী নায়কের বাহিনী এমনি একটা সুযোগই খুঁজছিল। ওরাও এবার একটা বোম ছুঁড়েছে।

প্রচণ্ড বিস্ফোরণে বোমাটা ফেটেছে। চারিদিকে চীৎকার—কোলাহল জাগে। নৃপেনও বিপদের গুরুত্ব বুঝে বিজয়বাবুকে ধরে নিয়ে সামনের বিলডিং-এর দিকে যেতে চায়। চারিদিকে ধোঁয়া—বিশ্রী গন্ধ!

এই সময়ই দ্বিতীয় বোমাটা পড়েছে বিজয়কে লক্ষ্য করেই। নৃপেন দেখেছে সেটা, তাই বিজয়বাবুকে ঠেলে দিয়ে নৃপেন বোমার হাত থেকে বাঁচাতে চায়। বিজয়কে বাঁচিয়েছে নৃপেন কিন্তু বোমাটা তার সামনেই প্রচণ্ড শব্দে ফেটে যায়।

ছিটকে পড়ে আহত হয় নৃপেন।

জনতা সরে গেছে। পালিয়েছে কাজ সেরে শশীনায়েকের বাহিনীও। ভীত চকিত জনতা দেখেছে নৃপেনের আহত দেহটাকে।

বিজয়ও ছুটে আসে।

তাকে লক্ষ্য করেই ওই বোমাটা ছোঁড়া হয়েছিল, কিন্তু নৃপেন নিজের জীবন বিপন্ন করে তাকে বাঁচিয়েছে।

ওকে গাড়িতে তুলে নিয়ে হাসপাতালে চলে গেল বিজয়। ততক্ষণ পুলিশও এসে পড়েছে। কারখানায় তখন শুধু নির্বাক ভীত মানুষের ভিড় জমেছে।

সাথী ছেলের পথ চেয়ে আছে। এখনও ফেরেনি নৃপেন।

বেলা হয়ে গেছে। হঠাৎ প্রমথকে গাড়ি নিয়ে আসতে দেখে চাইল।

প্রমথকে চেনে সাথী। এ বাড়িতে এর আগেও নৃপেনের সঙ্গে এসেছে সে।

প্রমথ গাড়ি থেকে নেমে ওকে দেখে এগিয়ে আসে।

নৃপেনের খবরটা দিতেও কেমন বাধে তার। কিন্তু না দিয়েও উপায় নেই।

বলে প্রমথ—আপনি একটু আমার সঙ্গে চলুন মাসীমা।

সাথী অবাক হয়েছে। শুধোয় সে।

—কেন? কি ব্যাপার বলোতো? এখনও নৃপেন ফিরলো না, তুমি এসেছো কেন?

প্রমথ বলে—নৃপেন একটা এ্যাক্সিডেণ্টে আহত হয়ে হাসপাতালে গেছে—

সাথী চমকে ওঠে—কি বলছো প্রমথ?

ওর আর্তকণ্ঠস্বরের কথাগুলো শুনে প্রমথ সান্ত্বনা দেবার সুরে বলে।

—তেমন সাংঘাতিক কিছু নয়, সব ব্যবস্থাই করেছেন ওর চিকিৎসার আমাদের এম.-ডি নিজে। ও ভালোই আছে।

সাথীর জীবনে এই ধরণের অনুভূতি এই প্রথম, কেমন হতবাক হয়ে গেছে সে। পায়ের নীচে থেকে যেন মাটিও সরে যাচ্ছে। তার একমাত্র সন্তান আজ কাজ করতে গিয়ে আহত হয়েছে। সাথী বলে।

—কি হবে প্রমথ? নৃপেনকে তখনই বলেছিলাম এমন কাজে দরকার নেই! তোমাদের ওই এম-ডি. সাহেব একটা যেন শয়তানই। তার জনাই আজ আমার একমাত্র ছেলে এইভাবে হাসপাতালে পড়ে আছে। কেন? কি অপরাধ করেছে সে।

প্রমথ বলে—এ সময় উতলা হবেন না মাসীমা। তেমন কিছুই হয় নি। চলুন, নিজে গিয়ে দেখে আসবেন তাকে।

বিজয় ভাবতে পারে নি যে এই ভাবে ওই শ্রমিকরা আক্রমণ করবে তাকে।

শ্রমিকরাও ভাবতে পারেনি যে তাদের মধ্যে থেকে এমনি ভাবে একদল লোক হঠাৎ চড়াও হবে বোমা নিয়ে। তারাও অবাক হয়। ক্রমশঃ বুঝতে পারে তারা ওই কাণ্ড বেধে যাবার পর যে এ ব্যাপারটা ছিল পূর্বকল্পিতই, আর যারা করেছে এই কাণ্ড ভিড়ের মধ্য থেকে তাদেরও দেখা যায় না।

হরিপদ বাবুও অবাক হয়।

এর মধ্যে কারখানার শ্রমিকরাও প্রতিবাদ করে।

—আমরা এসব করতে চাই নি। কারা করেছে এ কাজ খুঁজে বের করো। আমরা ধর্মঘট করেছি কিন্তু রক্তপাত করতে চাইনি।

খবরটা শশীবাবুর কানেও পোঁচেছে। বাইরের থেকে তারই বাছাই করা কিছু লোককে এই ভিড়ের মধ্যে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল কৌশলে, তারাই শ্রমিক সেজে এসেছিল ভিড়ের মধ্যে, সেরকম বুঝলে তারা বিজয়বাবুর উপর চরম আঘাত হানবে এই ছিল তাদের উপর গোপন নির্দেশ।

তারা সেই সুযোগই নিয়েছিল।

কিন্তু তারা ভাবতে পারে নি যে এই নোতুন ইন্‌জিনিয়ার ছোকরা ঠিক সেই সময়ই বিজয়বাবুকে বাঁচাবার জন্য নিজে এগিয়ে আসবে।

শশী নায়েক খবরটা শুনে ব্যর্থ রাগে জ্বলে ওঠে। বলে সে।

—এই কম্মো করে এলি তোরা? অকর্ম্মার দল! বিজয় বাবু এবার ছাড়বে? জখম করলি একটা বাজে মালকে?

তার অনুচররা বলে।

—ছেলেটা এসে পড়লো যে।

শশী নায়েক ভাবছে কথাটা। শুধোয় সে।

—ধরতে পারেনি তো ওরা? সবাই ঠিক ঠিক সরে পড়েছিলি তো?

বলে একজন—শালা গোবরা ধরা পড়ে গেছে বোমার থলি সমেত। লেবাররা ক'জন ওকে বেশ ধোলাই দিচ্ছে দেখে আমরা কেটে পড়েছি।

এবার শশী নায়েকের মাথায় যেন বাজ পড়েছে।

শশী বুঝেছে গোবরাই প্রহারের চোটে হয়তো কিছু বলে দেবে, নাহয় ওরাও বুঝে নেবে শশীরও হাত আছে এই ব্যাপারে। তখন শশীও বিপদে পড়তে পারে। অন্য কিছু না হলেও ওই কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে তার প্রতিষ্ঠা আর থাকবে না। সেই লোকসানের কথা ভেবে শশী বলে।

খুব কম্মো করেছিস? এখন কি হবে তা জানিস? যদি নাম বলে দেয়, তোদের জেলে যেতে হবে খুনের দায়ে।

ওরাও ঘাবড়ে গেছে।

শশী বলে—কোমলুম কেটে পড় এখান থেকে! উঃ এমনি কাঁচা কাজ করে আসবি তা ভাবিনি!

হরিপদ আরও দু'চারজন শ্রমিক এবার ব্যাপারটা কিছু বুঝেছে। তাদে এই মালিক-শ্রমিকের সমস্যাটাকে নিয়ে মাঝখানে কেউ এসেছিল নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করতে, তাই এই খুনখারাপীর চেষ্টাও করেছিল সেই অন্তরালের প্রভুরা।

আর তাদের উপরই এসে পড়েছে সেই অপবাদ।

পুলিশ এসে বেশীকিছু শ্রমিককেই ধরে নিয়ে গেছে।

হরিপদ বলে, এবার কি করবি? তখন বলেছিলাম যা করার শান্তিপূর্ণ ভাবেই করতে হবে।

অন্যরাও বুঝেছে বিপদের গুরুত্ব।

আজ ওই কটা বোমা মেরে কারা তাদেরও বিপদ করে গেছে।

কারখানা খোলার কাজ সুরু হবার মত পরিবেশও আর নেই। কোনো শান্তিপূর্ণ আলোচনার কোন অবকাশই আর নেই। মাইনে বাড়াবার জন্য আন্দোলন করে আজ কোন অদৃশ্য কালো হাতের খেলায় ওই শ্রমিকদল নিজেদেরই চরম বিপদ ডেকে এনেছে।

রমেশ ল্যাবারেটারীর সহকারী কেমিষ্ট। সে প্রথম থেকেই এই ধর্মঘটের বিরোধী ছিল। সে বলতো—মাইনে এরা ভালোই দেন। আর কোম্পানী যদি বেশী লাভ করে তখন আমরাও তার অংশ চাইবো। কিন্তু তার আগে আমাদেরও ষোল আনা কাজ করতে হবে।

তাকে অনেকেই তাই সহ্য করতে পারেনি।

হরিপদ বলে—এত খাটবার কি দরকার?

রমেশ বলে—কাজ করতেই হবে। কাজ না করে ওই পাইয়ে দেবার রাজনীতিতে আমি নেই। কারখানা বন্ধ হয়ে গেলে শশীবাবুর কিছু যায় আসে না। মরবো আমরা। তাই কারখানাকে বাঁচাতেই হবে, কাজ করতে হবে।

সেদিন তার কথায় কেউ কান দেয় নি।

আজ রমেশ বলে—এখন কি হবে? সাতদিন মাইনে নেই, কারখানা কবে খুলবে তারও ঠিক নাই।

সমস্যাটা সকলেরই।

এবার সকলেই বিপদে পড়েছে। আজকের ওই বোমাটা শুধু নৃপেনকেই আহত করে নি। এতগুলো কর্মীর স্বার্থকেও বিপন্ন করে তুলেছে। এরাও সমাধানের কোন পথ পায় নি।

বন্ধ কারখানার বাইরে এখান ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে কিছু কর্মী, অনেকেই পুলিশের ভয়েও সরে গেছে। এবার বন্ধ কারখানার দায়িত্ব নিয়েছে

পুলিশ।

কর্মীদের ওখানে ঢোকারও কোন অধিকার নেই। রমেশ কি ভাবছে।

বিজয় ভাবতে পারে নি যে এমনি ভাবে আক্রান্ত হবে তারা।

আজ ওই বিস্ফোরণ বিজয়ের মানসিকতায় একটা প্রচণ্ড আঘাত এনেছে। অনেক আশা নিয়েই সে ফিরে এসেছিল এই দেশে, এতবড় প্রতিষ্ঠান গড়েছিল দেশের, দশের স্বার্থে। বেশ কিছু লোকের অন্নসংস্থান হয়েছিল। আরও কিছু লোক কাজ পেতো।

কিন্তু কি এক উন্মাদ—সর্বনাশা নেশায় আজ এরা সেই প্রতিষ্ঠানকে বন্ধ করেছে।

শুধু বন্ধ করেই খুশী হয়নি, তাকেও প্রচণ্ড আঘাত হানার চেষ্টা করেছে।

কিন্তু আজ তাকে বাঁচিয়েছে নৃপেন। ওই সহকারী তরুণটি নিজের প্রাণ বিপন্ন করে তাকে বাঁচিয়েছে। বিজয় ওর কাছে কৃতজ্ঞ। কিন্তু দুঃখটা বড় বেশী বেজেছে বিজয়কে। হতাশই হয়েছে সে।

হাসপাতালে নৃপেনকে এনে তার চিকিৎসার সবরকম ব্যবস্থাই নিজে করেছে বিজয়। ব্লাড দেওয়া হচ্ছে, আঘাতটা তেমন মারাত্মক হয়ে ওঠেনি। সামান্য অপারেশনও করেছে। এখন কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠেছে নৃপেন।

বৈকালের খবরটা শুনে চমকে ওঠে কমলা।

ফুলটন কোম্পানীর কারখানায় ধর্মঘটী শ্রমিকরা নাকি সকালে ম্যানেজিং ডিরেক্টারের উপর বোমা ফেলেছে। দু'তিনজন আহত হয়ে হাসপাতালে গেছে।

কমলা খবরটা শুনে বিজয়ের বাংলোয় ফোন করে। কোন উত্তর আসে না, কারখানার অপিসও বন্ধ। কোথাও কোন সাড়া নেই। কমলাও ভাবনায় পড়েছে।

কি ভেবে কমলা নিজেই এসেছে গাড়ি নিয়ে। বিজয়ের বাংলোতে এসে খবর পায়।

—সাহেব হাসপাতালেই রয়েছেন বোধহয়।

কমলা ব্যাকুলকণ্ঠে শুধোয়—কেমন আছেন তিনি?

দারোয়ান বলে—সাহেবকে চোট তেমন লাগেনি, একজন নয়া ইনজিনিয়ার সাহেবকেই চোট লেগেছে।

কমলা বের হয়ে পড়ে হাসপাতালের উদ্দেশে।

বিজয়কে নিয়েই তার ভাবনা। আজ বিজয়কে কমলাই জোর করে এ দেশে এনেছিল, এতবড় প্রতিষ্ঠান গড়িয়েছে। আর তার জন্যই বিজয় আজ বিপদে পড়েছে। কমলা এই ব্যাপারে সে নিজেকেও কিছুটা দায়ী মনে করে।

বিকালের স্তব্ধতা নেমেছে।

ওদিকে দেখা যায় কারখানাটা। এতদিন ওখানে ছিল কর্মব্যস্ততা। আজ সেখানে প্রাণের কোন স্পন্দন নেই। বড় বড় শেডগুলো কি স্তব্ধতা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চিমনি থেকে ধোঁয়াও বের হয়না।

যেন প্রাণহীন পুরী।

আর কিছু শ্রমিক অসহায় নির্বাক চাহনি মেলে দেখছে তাকে। কমলার মনে হয় ধর্মঘট-এর মধ্যে যে তেজ—যে প্রতিবাদ, যে দাবীর যৌক্তিকতা থাকে নায্য কারণ হলে তাকে সে সমর্থন করবেই। কিন্তু যে দাবীর মূলে থাকে অন্ধ লোভ আর স্বার্থ সেখানে আজ প্রতিবাদের প্রয়োজন আছে।

বাঁচার দাবী নিয়ে হিংসা, অনর্থক অশান্তি করে সমাজজীবনে যে অশান্তি আসে তা সমাজ বিরোধিতারই নামান্তর মাত্র। কমলা আজ তাই একে সমর্থন করেনা!

শশী বাবুর পিছনে কারা আছে তা অনুমান করেছে কমলা, তারাই নিজেদের স্বার্থে এখানের শ্রমিকদের কাজে লাগিয়েছে।

ওই ধরাপড়া লোকটা এ কারখানার কেউ নয়, কেন সে এ কাজ করেছিল এবার তাই খোঁজার চেষ্টা করছে পুলিশও।

কমলার মনে হয়। এর কোন প্রকৃত তথ্য বের হবে না, কারণ সেই অন্ধ-কারের মানুষগুলো চাইবে এ তদন্ত ব্যর্থ করতে।

হাসপাতালের কাছে গাড়িটা আসতে নেমে পড়ে কমলা। বিজয়-এর সঙ্গে তার দেখা হওয়া দরকার। কিছু জরুরী আলোচনাও আছে তার সঙ্গে, এসময় বিজয়ের পাশেও থাকতে চায় কমলা।

সাথী খবরটা পেয়েই ছুটে এসেছে হাসপাতালে।

নৃপেনকে দেখে চমকে ওঠে।

তার একমাত্র সন্তান আজ এভাবে হাসপাতালে পড়ে থাকবে কাজ করতে এসে ভাবেনি সাথী।

কপালে-হাতে-মাথায় ব্যান্ডেজ।

স্যালাইন—ব্লাড দেওয়া হচ্ছে। চোখদুটো বোজা। শ্বাস প্রশ্বাস চলেছে ধীরে ধীরে।

সাথী নির্বাক চাহনি মেলে দেখছে তার সন্তানকে।

ডাক্তার বলে—ভয়ের কিছু নেই। শক্ পেয়েছিলেন, এবার সেরে উঠবেন উনি।

সাথীর চোখ ফেটে অশ্রু নামে।

সারা মনে আজ নীরব ঝড় বয়ে চলেছে।

কোন অদেখা অচেনা ম্যানেজিং ডিরেক্টারের জন্য আজ তার ছেলের এই বিপদ। প্রমথ বলে—ভয়ের কিছু নেই মাসীমা। তাড়াতাড়ি সেরে উঠবে।

সাথী আজ মনস্থির করে ফেলেছে। বলে সে।

—সেরে উঠুক নৃপেন। এখানে আর রাখবো না ওকে। সেই তোমাদের এম. ডি. সাহেব কোথায়? আজ তাকেই কথাটা বলে যাবো এসব। আমার ছেলের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার কোন অধিকারই তার নেই। কোথায় তিনি? নিয়ে চলো আমায়।

সাথী আজ যেন রুখে উঠেছে।

হঠাৎ করিডরে কাকে দেখে চাইল সাথী, আলোগুলো জ্বলছে। ওই আলোয় দেখা যায় একটি মানুষকে। দীর্ঘ দেহ—উজ্জ্বল বর্ণ, মাথার চুলগুলো উস্কো-খুস্কো, বিজয় আসছে।

সেও শুনেছে ওই কথাগুলো। আজ ওই মায়ের অভিযোগ সত্যই। ওর ছেলেই আজ বিজয়ের প্রতি ওদের নিষ্ঠুর আঘাতকে নিজের উপর টেনে নিয়েছে।

বিজয়ও দেখছে সাথীকে।

প্রমথও ভেবেছে একটা অপ্রিয় ঘটনাই ঘটবে। তার সাক্ষী থাকতে চায় না সে। তাই সরে গেছে।

সাথী স্তব্ধ নির্বাক বিস্মিত চাহনি মেলে দেখছে বিজয়কে।

সেই সবুজ ছায়াস্নিগ্ধ কৈশোর প্রথম যৌবনের স্বপ্নরাঙ্গানো কত দিন মুহূর্ত গুলো যেন আবার সাথীর মনে ফিরে আসে।

বিজয়ও যেন সেই অনুভূতি স্বপ্নগুলোকে হঠাৎ খুঁজে পেয়েছে।

—তুমি! সাথী!

সাথীর স্তব্ধতা ভেঙ্গে যায়। আজকের চরম বিপদটাকে সে ভোলেনি।

হঠাৎ আর্তকান্নায় ভেঙ্গে পড়ে সাথী।

—আজ আমার চরম বিপদ বিজয়! আমার একমাত্র সন্তান কোন লোভী :—র্ত এক মালিকের জন্যই মরতে বসেছে—আজ—

চমকে ওঠে বিজয়!

—সে কি! নৃপেন! নৃপেন তোমার ছেলে?

সাথী অশ্রুসজল চোখে চাইল ওর দিকে। বিজয়ও আজ নৃপেনের প্রতি যেন কি এক নোতুন আকর্ষণ বোধ করে। সাথীর ছেলেই আজ তার প্রাণ বাঁচিয়েছে কর্তব্যনিষ্ঠ, কৃতি একটি সন্তান।

বিজয় বলে—আমি কোনদিনই ভাবি নি সাথী, আজ তোমার ছেলেই নিজের প্রাণ বিপন্ন করে আমারই প্রাণ বাঁচিয়েছে সাথী!

সাথীর চোখে বিস্ময়। বলে সে।

—তুমি। তুমিই সেই এম—ডি!

বিজয় বলে—হ্যাঁ!

সাথী দেখছে ওকে। ওর মনের পুঞ্জীভূত বিক্ষোভটা যেন অশ্রু হয়ে ঝরছে। তার অতীতের স্বপ্ন দেখা বিজয় ফিরেছে। আজ বিরাট হয়েছে সে। কিন্তু সাথী তবু জানতেও পারে নি।

কেন জানে না। ওর মনে হয় নৃপেন হয়তো জেনেছে কিছু তাই আজ সে এগিয়ে এসেছিল বিজয়কে বাঁচাতে, হয়তো সাথীর জন্যই।

বিজয় বলে, কেঁদোনা সাথী। কলকাতা থেকে স্পেশালিষ্ট আনিয়েছি। নৃপেনের বিপদও কেটে গেছে। ক'দিনেই ও সেরে উঠবে। চলো—দেখবে ওকে। জ্ঞান ফিরেছে ওর। তোমাকে দেখলে খুশী হবে। চোখ মোছো—

হঠাৎ কাকে দেখে চাইল।

কমলা এসে পড়েছে। ও সাথীকে এখানে দেখে অবাক হয়।

সাথীও। বলে সে।

—বৌদি!

কমলা এগিয়ে আসে। সে বলে।

—নৃপেন যে এখানেই কাজ করে তাতো কোনদিন বলোনি বিজয়? কেমন আছে সে?

বিজয় বলে, ভালোই! আমিও জানতাম না বৌদি যে নৃপেন সাথীর ছেলে। আজ আমি সাথীর কাছেও কৃতজ্ঞ বৌদি। নৃপেনের কাছেও।

আজ বহুদিন, বহু বছর পর এমনি এক বিপর্যয়ের মুহূর্তেও ক'টি মানুষ তাদের হারানো সত্বাকে যেন নোতুন করে আবিষ্কার করেছে, নীরব তৃপ্তির আবেশ জাগে ওদের মনে।

আজ বিজয়ের মনের অতলে একটা কর্তব্যবোধ জাগে।

মনে হয় এদেশের সবাই তাকে আঘাত দেয় নি। একজন অপরিচিতও এগিয়ে এসে তার প্রাণ বাঁচিয়েছে। সাথীও কোন অনুযোগ করেনি।

দেখেছে কমলা বৌদিকে।

ওই শ্রমিকদের। নৃপেন সেরে উঠছে ক্রমশঃ।

বিজয় এই ঘটনার পর আর শ্রমিকদের সঙ্গে কোন আলোচনায় বসতে চায় নি। শশী নায়েক ফোন করেছিল। বিজয় ওই স্বার্থপর লোকটাকে ঘৃণা করে। বলে সে।

—লোভের আশায় এখানে কারখানা গড়িনি। কারখানা বন্ধই করে দেব। আর আপনার সঙ্গে কোন আলোচনার প্রয়োজনও আমি বোধ করি না।

হরিপদ—রমেশরাও এবার বিপদের গুরুত্ব বুঝেছে।

শ্রমিকদের সেই উৎসাহও আর নেই। এর মধ্যে অনেকের দিন চালানোও কঠিন হয়ে পড়েছে।

শশীবাবুও বেপাত্তা। কারণ এদের কারখানা বন্ধ হয়ে থাকাটাই সে চেয়ে

ছিল। অন্তত তার পিছনের মদতদার ওই ঝন্ঝন্‌ওয়ালার দল যা চেয়েছিল সেটা হয়ে গেছে। তাই শশীবাবুও আর নেই এখানে।

আজ রমেশ বলে—বিজয়বাবু শুনছি কারখানা বন্ধ করে দেবেন?

—সে কি!

চমকে ওঠে শ্রমিকরা। অনেকেই বলে।

—আমাদের এভাবে পথে বসাতে এসেছিল ওই শশী নায়েক। এবার কি হবে?

চাকরীর বাজারও খুবই মন্দা।

কোথাও কোন পথই তাদের নেই। রমেশ বলে।

—বিজয়বাবুকেই ধরো গে। এবার মাথা নীচু করে গিয়ে বলো গে. অন্যায় দাবী করার সময় এসব মনে ছিল না কারোও?

হরিপদও আজ নির্বাক হয়ে গেছে।

বিজয় মনস্থির করেই ফেলেছে। কমলাও ভাবছে কথাটা। বিজয় বলে।

—আমি তো নিজের লোভের জন্য এ কারখানা করিনি! এদের জন্যই করেছিলাম। কিন্তু এরা যদি কাজ না করে কেবল দাবীই করে যায় কেউ দিতে পারবে না। আমি বিদেশের বহু জায়গাতে দেখেছি বৌদি, দেশকে এগোতে হলে কাজ করতে হবে, প্রডাকশন বাড়াতে হবে। কিন্তু এখানে সেই কথা বলাও যেন অপরাধ, ক্যাপিটালিস্টিকহীন মনোভাবের পরিচয়। এই শিক্ষাই দেওয়া হচ্ছে যেখানে শ্রমিকদের সেখানে কোন প্রতিষ্ঠানকে টিকোনো যাবে না বৌদি, তাই ঠিক করছি এ কারখানা বন্ধ করে দেব, যদি এদের মনোভাব না বদলায়!

এদের লোভ হিংসা মারমুখী হয়ে উঠেছে, এতো নিজেই দেখলে।

কমলা বলে—সবটা সত্যি নয় বিজয়।

এদের সকলের সমর্থন এই ধর্মঘটে ছিল না, এই হিংসার কাজও ঘটায় নি এরা।

বিজয় অভিমান ভরে বলে।

—কিন্তু বাধাও দেয় নি!

কমলা বলে—হয়তো অসহায় শ্রমিকদের সাধ্য ছিল না। এদের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে এদের বিভ্রান্ত করা হয়েছিল। এরা তার শিকারই হয়েছে। আজ ওই অসহায় মানুষদের কথাও ভাবতে হবে বিজয়।

বিজয় চুপ করে থাকে।

কথাটা নৃপেনও বলেছে অবশ্য। নৃপেন সেরে উঠেছে—সাথীও আসে হাসপাতালে। দেখা যায় স্তব্ধ কারখানাকে। আজ ওটা যেন এদের সকলের

কাছেই একটা বেদনাময় দৃশ্য।

নৃপেন বলে, কারখানা লক আউট করে দেবেন স্যার ?

বিজয় বলে, এছাড়া অন্য পথ দেখি না নৃপেন। কোম্পানী তোমার কথা ভুলবে না, তুমি আমার সঙ্গে আমেরিকাতেই যাবে। ওখানেই কাজ করবে—

নৃপেন কি ভাবছে। বলে সে।

—নিজের জন্য ভাবছি না স্যার। এতগুলো লোকের কথা ভাবছি।

বিজয় বলে, তারা তোমার কথা ভেবেছিল ?

নৃপেন চুপ করে থাকে।

বাধা দেয় সাথীই। সেদিন বাংলোতে এসেছে সাথী নৃপেনের কাছে কথাটা শুনে। বিজয় ওকে এখানে দেখে অবাক হয়।

সাথী দেখছে ওর বাংলোটা! সুন্দর করে সাজানো একটি আশ্রয়।

এমনি একটি আশ্রয়, একটি মানুষকে নিয়েই স্বপ্ন দেখেছিল সাথী। আজ তা স্বপ্নই।

আজ সাথী এসেছে তার প্রতিবাদের কথাটা জানাতে।

সাথী বলে—নৃপেন হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলে ওকে নিয়ে চলে যাবো বোলপুরের বাড়িতে!

অবাক হয় বিজয়। নৃপেনকে ঘিরে আজ তার নিঃসঙ্গ জীবনে অনেক স্বপ্ন জাগে। সে ঠিক করেছে ওকে আমেরিকায় নিয়ে যাবে. সেখানে নৃপেন আরও বড় চান্স পাবে। কিন্তু সাথীর মুখে কথাটা শুনে বলে বিজয়।

—সেকি! ওর সামনে এতবড় ভবিষ্যৎ!

সাথী বলে—সে ভবিষ্যতের দরকার ওর নেই বিজয়. আমার ওইটুকু মাত্র সম্বল, দূর বিদেশের উজ্জ্বল স্বপ্নমোহের জগতে ওকে হারিয়ে যেতে দেব না। ও আমার কাছে ফিরে যাবে, এখানে আর থাকবে না।

বিজয় অবাক হয়।

—কি বলছো সাথী ?

সাথী বলে—একবার স্বপ্ন দেখে ঠকেছি। অনেক কিছু আমার হারিয়ে গেছে, তবু সয়েছি। আর ওকে হারাতে পারবো না বিজয়। ওকে তুমি নিয়ে যেওনা। না!

সাথীর চোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে।

বলে সে—মা হয়ে আর কিছু হারাতে আমি পারবো না।

সাথী চলে গেছে।

বিজয় চুপ করে বসে আছে। আজ সাথীও তার কাছ থেকে নৃপেনকে সরিয়ে নিয়ে আবার নিঃস্ব করে সেই দূর পথেই ফেলে দিতে চায়। বিজয় কোনদিনই কিছু পাবে না, নিঃস্ব হয়েই থাকতে হবে তাকে। এতদিনের স্বপ্নও তার

শুধু শূন্যতার বোঝাতেই পরিণত হবে।

—স্যার।

হঠাৎ কার ডাকে চাইল বিজয়।

বাংলোর বারান্দাতে বসেছিল বিজয়। আজ রমেশ, হরিপদ আরও দু'তিন-জনকে আসতে দেখে চাইল।

গেটের বাইরে অনেকেই রয়েছে। নীরব- স্তব্ধ—মূক—ম্রিয়মান জনতা। সেই উত্তাপ আর নেই। বিজয় চাইল ওদের দিকে।

—কি ব্যাপার ?

রমেশ বলে, আমরা এসেছিলাম স্যার। আমাদের ভুল স্বীকার করতে, আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে।

বিজয় চাইল ওদের দিকে। বলে সে।

—তার আর কোন প্রয়োজন নেই। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি—কারখানা বন্ধই করে দিচ্ছি।

বিবর্ণ মুখগুলোয় ফুটে ওঠে বেদনার ছবি।

রমেশ বলে, আমরা কোথায় যাবো স্যার ?

হরিপদও বলে—ভুল করেছিলাম স্যার। আমরাও এসব করতে চাইনি। আজ বুঝেছি এই কারখানাকে আমাদের বাঁচাতে হবে, নিজেদের বাঁচার জন্যই। সমস্ত কর্মীদের এই কথা স্যার।

বিজয় কি ভাবছে।

বলে সে— ঠিক আছে। আমাকেও ভেবে দেখতে দাও। আমি পরে জানাবো। আর আলোচনা করতে হয় শ্রমিকরাই থাকবে, বাইরের কেউ থাকবে না।

হরিপদ বলে – শশীবাবুর মতলব টের পেয়েছিলাম, কিন্তু তখন যা হবার হয়ে গেছে। আমরাও দুঃখিত। তাহলে কাল যদি বলেন।

বিজয় বলে, দেখছি কি করা যায়।

বিজয়ও ভেবেছে কথাটা।

নৃপেন, প্রমথরাও রয়েছে। বিজয় আজ এই কারখানার ভার ওদের হাতেই তুলে দেবে।

শ্রমিকরাও আজ ভুল বুঝেছে।

মনে হয় এই পরিবর্তনের মাঝে এদের মনোভাবও বদলাচ্ছে, বাঁচার প্রয়োজন, কিছু গড়ার জন্যই এই নোতুন তরুণ দল আজ এগিয়ে আসবে। নৃপেন তবু বলে।

—আমরা কি ঠিক পারবো ?

বিজয় বলে,

—পারতেই হবে নৃপেন, আজ ওরাও এগিয়ে আসছে। কথা দিয়েছে ওরা।

উৎসাহী কর্মী আর সং ম্যানেজমেণ্ট থাকলে কেন পারবে না। ভুল হতে পারে, কিন্তু শুধরে নিয়ে আবার ঠিক পথেই চলবে। তাছাড়া আমিও আসবো মাঝে মাঝে!

বিজয় এদের হাতেই কারখানার ভার দিয়ে আবার দূর দেশেই ফিরে যেতে চায়।

সাথীও শুনেছে কথাটা।

আজ তার ছেলেকেই বিজয় সব ভার দিয়ে চলে যাচ্ছে এদেশ থেকে।

সাথীর মনে হয় বিজয়কে সেদিন সে কড়া কথাই শুনিয়েছিল! আজ এসেছে সে।

বিজয় ফিরে যাবে আমেরিকায়।

গোছগাছ করছে। হঠাৎ পড়ন্ত বেলায় সাথীকে আসতে দেখে চাইল।

—তুমি!

সাথী দেখছে বিজয়কে। চোখমুখে দীর্ঘ পথ পার হবার ক্লান্তি ফুটে উঠেছে। বলে সাথী, চলে যাচ্ছো আবার?

সাথীর কথায় বিজয় বলে।

-হ্যাঁ।

সাথীর মনের কোণে নীরব হাহাকার জাগে, বলে সে:

—এখানে কি থাকতে পারো না বিজয়? কেন? কেন এমনি করে হারিয়ে যেতে চাও?

বিজয় বলে।

—যেদিন প্রথম পথে বের হয়েছিলাম কি লগ্ন ছিল জানি না, পথই আমাকে টেনে নিল সাথী। সব হারিয়ে তাই পথেই ফিরে যেতে চাই। হয়তো স্বপ্ন আমিও দেখেছিলাম—একজনকে ভালোবেসেছিলাম। কিন্তু এর বেশী কিছু পাবার দুরাশা আমার নেই।

—তাই ভয়ে সরে যেতে চাও? আজও মনের সেই লোভটাকে ভোলোনি? নিজের উপর কোন বিশ্বাসই নেই তোমার?

বিজয় চাইল ওর দিকে।

বলে সে—তবু দূরে থাকাই ভালো সাথী। প্রত্যহের স্পর্শে সেই ভালো-বাসার স্মৃতিকে হারাতে চাই না। আমাকে তাই যেতে হবে সাথী।

সাথীও এতদিন ধরে ভেবেছে কথাটা।

বলে সে—আমিও তোমার কাছে অপরাধী বিজয়। আজ আমি সব পেয়েছি, ঘর-স্বামী-যোগ্য সন্তান, অর্থ সব তবু এত কিছু থেকেও এক জায়গায় আমার অনেক দুঃখ রয়ে গেছে। তবু কাছে থাকলে চোখের দেখাও দেখতাম দূর থেকে, ভাবতাম তুমি আছো—হারাওনি।

বিজয় বলে—সে সৌভাগ্য আমার কাছে বড় হয়ে থাকতো সাথী, কিন্তু লাভ কি ?

কমলা ঢুকছিল, সেও থমকে দাঁড়িয়েছে। শুনেছে ওদের কথাগুলো। আজ পরিণত মনের এই নীরব হাহাকার তার জীবনের শূন্যতাকেও স্পর্শ করেছে।

কিন্তু লাভ কি ? যা সত্যি তাকে মেনে নিয়েই বহু বেদনায় পথ চলতে হয়। তাই বিজয়ও হারিয়ে যাবে সাথীর জীবন থেকে। এর সূত্রপাত তো বহু আগেই হয়ে গেছে।

দমদম রাণওয়ে থেকে জাম্বো জেট বিমানটা আকাশে উঠছে। রাত্রির তারাকিনী আকাশে ওটাও একটা দূর নক্ষত্রের দীপ্তি নিয়ে আকাশে হারিয়ে গেল।

হারিয়ে গেল বিজয়ও।

সাথীর চোখে জল নামে। কমলা দেখছে ওকে।

নৃপেন বলে—চলো মা।

সাথী নিজেকে সংযত করে বলে—হ্যাঁ, চলো।

———